অখণ্ড অমিয় শ্রী গৌরাঙ্গ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ

প্রেম-ভক্তির রসঘনবিগ্রহ, সর্বযুগসমস্যায় দীপস্তম্ভ

অখণ্ড অমিয় শ্রী গৌরাঙ্গ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

গ্রন্থম্, কলিকাতা-৬

প্রথম সংস্করণ
শুভ জন্মাষ্টমী, ১৫ই ভাদ্র ১৩৬৮

প্রকাশক
শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সাহা
গ্রন্থম্
২২।১, কর্নওআলিস স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

শিল্পনির্দেশক
পূর্ণেন্দু পত্রী

ব্লক নির্মাতা ও মুদ্রক
রিপ্রোডাক্‌সন সিণ্ডিকেট

চিত্র-মুদ্রক : প্রবাসী প্রেস

গ্রন্থক
দি সিটি বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

মুদ্রক
শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস
৩০, কর্নওআলিস স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

'জননীর নিকট হইতে শ্রীচৈতন্যের বিদায়'-
চিত্র গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অঙ্কিত

মূল্য : আট টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিহ্লাদিনীশক্তিরস্মা
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপং ॥

চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ।
আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনম্ ॥

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা ।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে ।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥

যুগায়িতং নিমিষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্ ।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দবিরহেণ মে ॥

—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ভূমিকা

সাধন-ভজন নেই, শাস্ত্রজ্ঞান নেই, নেই বা ইষ্টনিষ্ঠা, তবু যে মহাপ্রভুর পুণ্য-জীবনী লিখতে প্রবৃত্ত হলাম এ শুধু তাঁরই কৃপায়। যে মূর্খ সে 'বিষ্ণায়' বলে আর যে ধীর সে বলে 'বিষ্ণবে', কিন্তু কৃষ্ণ, শুদ্ধ আর ভুল, দুই বাক্যই গ্রহণ করেন। আর ভাগবতে যে 'নন্দসুত' সেই কৃষ্ণই তো শ্রীগৌরাঙ্গ। আর, গৌরকৃপার বৈশিষ্ট্যই এই যে তা অনুসন্ধান করতে হয় না, অনুসন্ধান ছাড়াও তা ফলান্বিত করে। 'এই দেখ চৈতন্যের কৃপা মহাবল। তাঁর অনুসন্ধান বিনা করয়ে সফল।' সুতরাং সেই করুণার ধারাস্নানেই আমার যাত্রা। রসিক-শেখর কৃষ্ণ পরমকরুণ। 'মহাকৃপাপাত্র প্রভুর জগাই-মাধাই। পতিতপাবন-গুণের সাক্ষী দুই ভাই॥' তবে আর ভয় কী, কুণ্ঠা কিসের!

অচিন্ত্যকুমার

১
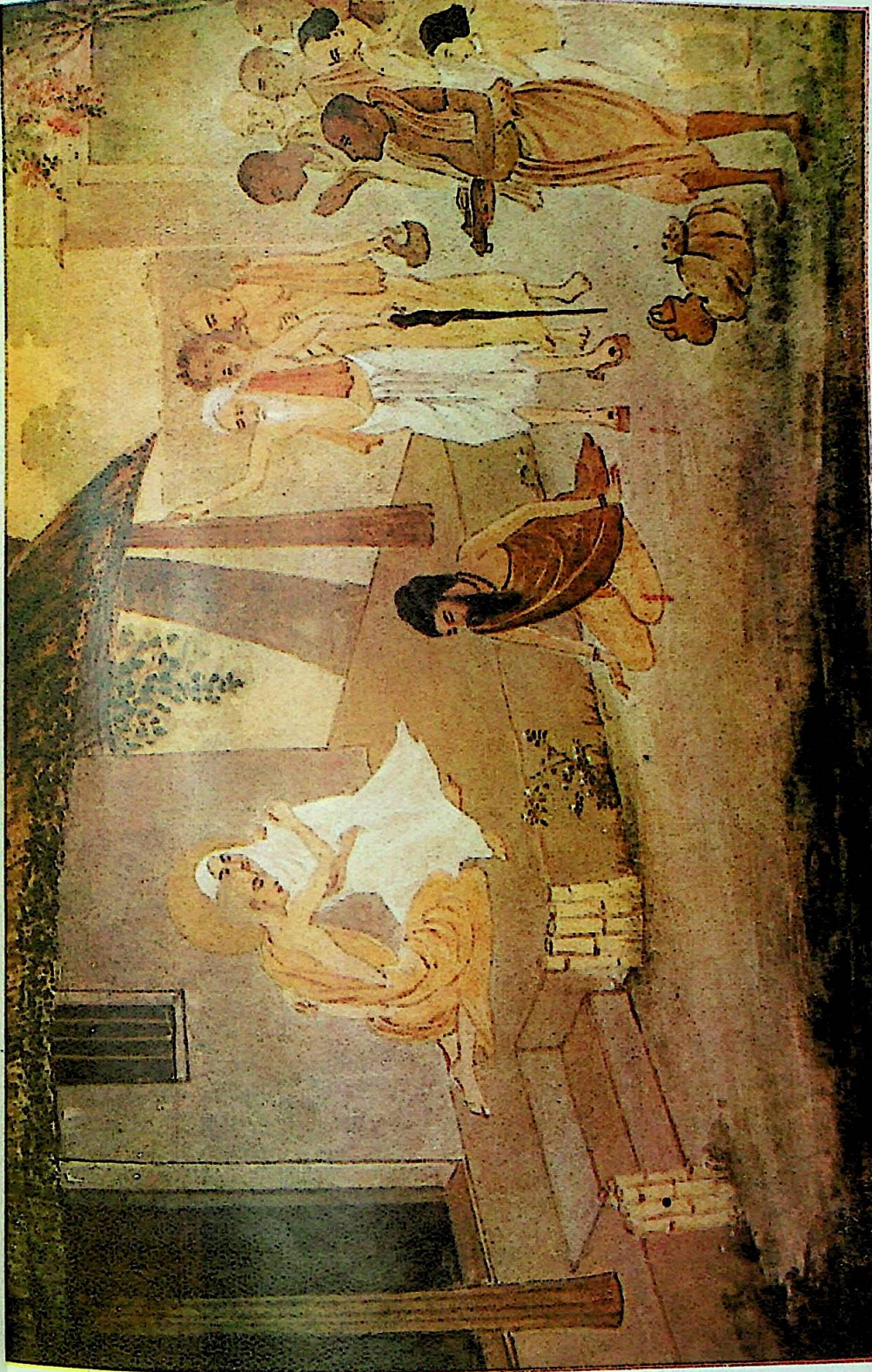
'এর জন্যে তুমি কাঁদছ?' নিমাই তাকাল রঘুনাথের দিকে।

রঘুনাথ মুখ তুলল না।

'এর জন্যে কাঁদবার কি হয়েছে! এ তো অতি তুচ্ছ কথা। তুমি কিছু ভেবো না। আমি এখুনি তা গঙ্গায় ফেলে দিচ্ছি।'

চমকে মুখ তুলে তাকাল রঘুনাথ। তার অশ্রুপ্লুত মুখে আতঙ্কের ছায়া পড়ল।

কিন্তু নিমাইয়ের যে কথা সেই কাজ। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল গঙ্গায়।

'এ কি, জলে ফেলে দিলে?' রঘুনাথ আর্তনাদ করে উঠল।

'তা ছাড়া আবার কি? ঐ অফল শাস্ত্র দিয়ে কী হবে? কিছু হবে না। ওতে আর আমার দরকার নেই।' রঘুনাথের কাঁধের উপর হাত রাখল নিমাই: 'তোমার বইয়েরই জয়জয়কার হোক।'

এক চৌপাঠিতে পড়ে দুজন, নিমাই আর রঘুনাথ। রঘুনাথ বুদ্ধিতে তীক্ষ্ণ হলেও নিমাইয়ের সঙ্গে পেরে ওঠে না। নিমাই সারা দিন খেলা করে বেড়ায়, কখন যে পড়া তৈরি করে কে বলবে, অথচ হেন প্রশ্ন নেই যার উত্তর তার না-জানা। রঘুনাথ থই পায় না।

'কখন পড়িস রে নিমাই?' জিগগেস করে রঘুনাথ।

'আর কখন! রাত্তিরে।' নিমাই গম্ভীর হবার ভাব করলে।

'বলিস কি! কার কাছে পড়িস?'

'কার কাছে আবার! সরস্বতীর কাছে।'

নিমাই ঠাট্টা করছে, হেসে উঠল রঘুনাথ। কিন্তু এত বিদ্যার সমীচীন ব্যাখ্যাই বা কি!

গুরুমশাই একটা প্রশ্ন দিয়েছেন রঘুনাথকে। কিছুতেই তার সমাধান হচ্ছে না। ভাবতে ভাবতে দিন চলে গেল, রান্না নেই, স্নান নেই—সারাদিন উপবাসী রঘুনাথ।

'কি হল ?' হেঁকে গেলেন গঙ্গাদাস।

প্রশ্নের ফল বের করতে সেই সন্ধ্যে। তাও কত কসরৎ করে, কত মাথামুড় খুঁড়ে। গুরুকে দেখিয়ে খুশি করে তবে ছুটি।

সন্ধ্যা-অন্তে রান্না করতে বসেছে রঘুনাথ। এমন সময় নিমাই এসে হাজির। এ কি, এত দেরি আজ রান্নার!

'আর বলিসনে! গুরুমশাই এমন এক প্রশ্ন দিয়েছেন যে ভাবতে-ভাবতেই দিন কাবার! সারাদিন খেতে পাইনি এক মুঠো।'

'খুব কঠিন প্রশ্ন ?' নিমাইয়ের দুচোখ কৌতূহলে উজ্জ্বল।

'খুব।'

'আমাকে শোনা না প্রশ্নটা। দেখিনা পারি কিনা।'

শোনাল রঘুনাথ। নিমেষে নিমাই বলে দিল উত্তর। প্রচ্ছন্ন প্রাঞ্জল হয়ে দাঁড়াল। নিগূঢ় নির্মলের চেহারা নিলে।

সহসা নিমাইয়ের দুহাত চেপে ধরে রঘুনাথ বললে, 'ভাই নিমাই, তুই কি মানুষ, না, তুই সত্যিই বিশ্বম্ভর ?'

সেই দুই সতীর্থ বড় হয়ে টোলে ঢুকেছে। বড় হয়ে মানে চৌদ্দ বছরে পা দিয়ে। গঙ্গাদাসের চৌপাঠিতে ব্যাকরণ সারা হয়েছে, এবার টোলে ন্যায় পড়বে দুজনে।

চৌপাঠিতে পড়তে ব্যাকরণের একখানি টিপ্পনী লিখেছিল নিমাই, এবার টোলে এসে লিখতে শুরু করল ন্যায়ের টিপ্পনী। নবদ্বীপে নতুন কোনো বই চালানো দুরূহ, কিন্তু কেন কে জানে, নিমাইয়ের ব্যাকরণের টিপ্পনী সমাজে চালু হয়ে গেল সহজে। এখন এই ন্যায়ের টিপ্পনীই কোন না অঢেল অভ্যর্থনা পাবে!

কথাটা কানে উঠল রঘুনাথের। সে তখন তার 'দীধিতি' লিখছে,

তার মুখ পাংশু হয়ে গেল। নিমাইয়ের হাতে তার বই নিশ্চয়ই মার খাবে। ভেবেছিল ন্যায়ের ব্যাখ্যায় বিশ্বজয়ী হবে, এখন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজয় অবশ্যম্ভাবী ভেবে দুচোখে অন্ধকার দেখল।

'ভাই, তুমি ন্যায়ের ভাষ্য লিখছ?' বিরলে পেয়ে নিমাইকে জিগগেস করল রঘুনাথ।

'হ্যাঁ, চেষ্টা করছি।'

'আমাকে একটু দেখাবে?' রঘুনাথের স্বরে ভয়ের কুয়াশা।

'নিশ্চয়ই দেখাব।' নিমাই আনন্দের লহর তুলে বললে, 'কাল যখন টোলে আসব তখন আনব পুঁথি।'

'আনবে?' রঘুনাথের স্বরে সংশয়। প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছেও কি মন্ত্রগুপ্তি নেই নিমাইয়ের?

'তারপর যখন গঙ্গা পার হব তখন নৌকোয় তোমাকে পড়িয়ে শোনাব।'

নৌকোয় ফিরছে দুজনে। নিমাই পড়ছে তার পুঁথি আর রঘুনাথ এককর্ণে শুনছে। কী সুন্দর লিখেছে নিমাই, গহনাতিগহন তত্ত্বকে কী অপূর্ব সারল্যে স্থাপন করেছে! এই না হলে প্রসাদ-কান্তি। যে কথা বোঝাতে রঘুনাথ নিয়েছে পুরো এক পৃষ্ঠা তা নিমাই মাত্র দুই ছত্রে সেরেছে। যে শব্দ শোনামাত্রই অর্থের প্রত্যয় হয় তাই সকল রস ও রচনার প্রাণ। নিমাইয়ের রচনায় জলের স্বচ্ছতার মত ভাষার বিমলতা। সর্বগ্রন্থির বিমোচন।

দু হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল রঘুনাথ।

'এ কি, কি হল তোমার?' পড়া বন্ধ করল নিমাই: 'কাঁদছ কেন?'

'ভাই, তোমার এ রচনা প্রকাশ হলে আমার প্রতিষ্ঠার আর আশা নেই। না, বিন্দুমাত্র না।' রঘুনাথ কান্নায় আরো ডুবে যেতে লাগল।

'প্রতিষ্ঠার আশা?' আহতের মত তাকাল নিমাই।

'তা ছাড়া আবার কি। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হব, আমার বই-ই সর্বমান্য হবে এই তো আমার একমাত্র স্বপ্ন।' মুখ কিছুতেই তুলবে না রঘুনাথ: 'আজ আমার সেই আশায় ছাই পড়ল। তোমার এ বই থাকতে আমার বই আর কে পড়বে? আমি পরাভূতের মত সংসারে ঘুরে বেড়াব।'

রঘুনাথের দুঃখে নিমাইয়ের চোখ ছলছল করে উঠল। তার একটা সামান্য পুঁথি রঘুনাথের সুখের কণ্টক হবে? তার যশের প্রতিবন্ধক? কিছুতেই নয়। পুঁথিটা টেনে গঙ্গায় ফেলে দিল অনায়াসে।

নামের জন্যে কান্না? প্রতিষ্ঠার জন্যে কান্না? হায়, কৃষ্ণের জন্যে কাঁদো।

এত দিনের এত পরিশ্রম এত গবেষণা সব এক মুহূর্তে নস্যাৎ করে দিলে? ভেঙে ফেললে উচ্চাশার সৌধচূড়া? এতটুকু মায়া হল না?

অফলা বিদ্যার জন্যে আবার মায়া কি?

ন্যায়শাস্ত্র কি বন্ধ্যা?

ন্যায়শাস্ত্র হচ্ছে তর্ক করে বুদ্ধি খাটিয়ে যুক্তির সাহায্যে ঈশ্বরকে প্রতিপন্ন করা। ঈশ্বর কে? ঈশ্বর কি ন্যায়শাস্ত্রে অস্বীকৃত নয়? মোটেই নয়। ন্যায়শাস্ত্রে যুক্তিবলে জগৎকর্তা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়ে আছে।

ন্যায়মতে প্রমেয় বা প্রমাণের বিষয় দ্বাদশ। আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ আর অপবর্গ। যেহেতু ঈশ্বরের উল্লেখ নেই, মনে হতে পারে, ন্যায় ঈশ্বরকে বুঝি প্রত্যাখ্যান করেছে। আসলে 'আত্মা' শব্দেই জীবাত্মা বা জীব ও পরমাত্মা বা ঈশ্বর লক্ষিত হচ্ছে। ঈশ্বর আত্মারই প্রকারভেদ।

ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ আর জ্ঞান এই ছ'টি আত্মার গুণ।

এ ছ'টি গুণ দেহেন্দ্রিয়ে নেই। এ ছ'টি গুণ থেকেই আত্মার অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। এদের মধ্যে ইচ্ছা, প্রযত্ন ও জ্ঞান এ তিনটি জীবাত্মা ও পরমাত্মা দুয়েরই লক্ষণ ; কিন্তু বাকি তিনটি, মানে, দ্বেষ, সুখ আর দুঃখ জীবাত্মায় থাকলেও পরমাত্মায় নেই। পরমাত্মায় কেবল নিত্য ইচ্ছা, নিত্য প্রযত্ন এবং নিত্য জ্ঞান। এই গুণত্রয়ের আশ্রয়ই হচ্ছে ঈশ্বর। ন্যায়মতে ঈশ্বর সগুণ পদার্থ, সাংখ্যের পুরুষ বা বেদান্তের ব্রহ্মের মত নির্গুণ নন।

কিন্তু প্রমাণ কী ?

ন্যায়মতে প্রমাণ চার রকম। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান আর শব্দ। শব্দ মানে শ্রুতি বা আগম বা আপ্তবাক্য। ঈশ্বর লৌকিক প্রত্যক্ষের অযোগ্য। উপমান বা সাদৃশ্যজ্ঞানের ফলও তাকে বলা যায় না। একমাত্র নির্ভর আগমে ও অনুমানে। অন্যে জ্ঞানসঞ্চার করবার জন্যে প্রকৃত জ্ঞানী যে বাক্য ব্যবহার করে তাই আপ্তবাক্য। যার ভ্রম নেই, প্রমাদ নেই, প্রতারণার প্রবৃত্তি নেই, ইন্দ্রিয়ের অপটুতা নেই, তার উপদেশই আপ্ত উপদেশ। বেদই সেই আপ্ত উপদেশ। তা না মানো অনুমানকে মানতে হবে। ধূম দেখলেই জানতে হবে আগুনকে। নদীর পূর্ণতা দেখলেই জানতে হবে বৃষ্টি হয়েছে দেশান্তরে। সুতরাং আগমে ও অনুমানেই ঈশ্বর সিদ্ধ।

পর্বত বা সাগর সাবয়ব। তার মানে তার অংশ আছে। যা সাবয়ব ও স্থূল, যার অংশ আছে, তা 'জন্য' পদার্থ। জন্যমাত্রেরই জনক বা কর্তা আছে। যেমন ঘট দেখে বোঝা যায় কুম্ভকার। আর কর্তা মানেই সচেতন কর্তা। অচেতন পদার্থে ইচ্ছা, প্রযত্ন ও জ্ঞান নেই। ইচ্ছা, প্রযত্ন ও জ্ঞান ছাড়া কর্তৃত্ব অসম্ভব। ঘটের উপাদান মাটি। কিন্তু সচেতন কুম্ভকারের প্রযত্ন ছাড়া ঘটের উৎপত্তি হয় কি করে ? তেমনি পর্বত আর সাগর শুধু কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি। কে না জানে পরমাণু জড়বস্তু। কোনো জ্ঞানী, ইচ্ছুক ও প্রযত্নবান পুরুষ এই পরমাণুসমষ্টি স্থাপিত করলেই তবে পর্বত বা সাগর বা

বিশ্বজগতের জন্ম। জীব পৃথিবীর জনক হতে পারে না। পৃথিবীর নিমিত্ত-কারণ পরমাত্মা। সেই ঈশ্বর নামে পরিভাষিত।

কী দরকার ছিল ঈশ্বরের এই সৃষ্টি করায়? মন্দমতি লোকও বিনা প্রয়োজনে কাজে প্রবৃত্ত হয় না। ঈশ্বরের তো কোনো অভাব নেই, রাগ-দ্বেষ-দুঃখ নেই, তবে কেন এই তাঁর বিশ্বরচনা? নৈয়ায়িকরা তারও উত্তর দিয়েছেন। বলছেন, ঈশ্বরের করুণাই তাঁকে সৃষ্টির কাজে প্ররোচিত করেছে। জীবের মুক্তিই তাঁর একমাত্র প্রয়োজন। অনাদিকালে সঞ্চিত জীবের শুভাশুভ কর্মের ফল একমাত্র ভোগের দ্বারাই ক্ষয় পেতে পারে। সুতরাং কর্মক্ষয়ের জন্যেই এই ভোগ্যজগৎ ও ভোগায়তন দেহের দরকার। কর্মক্ষয়ের জন্যেই জগৎসৃষ্টি।

'পুনরপি জননং পুনরপি মরণং', এই জন্ম-মরণ-প্রবাহের নাম প্রেত্যভাব। কবে এ আরম্ভ হয়েছে কেউ বলতে পারে না, কিন্তু তার সমাপ্তির কথা বলেছে ন্যায়। সমাপ্তি অপবর্গ। অপুনর্জন্মই অপবর্গ। সব সুখই দুঃখসংস্পৃষ্ট, সুতরাং সুখের সন্ধান মুমুক্ষুর লক্ষ্য নয়। দুঃখনিবৃত্তিই লক্ষ্য। জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহের সমুচ্ছেদ ও তাতে সর্বদুঃখের বিরামের নামই অপবর্গ বা মোক্ষ।

এ সবই ন্যায়ের কথা। তর্কবুদ্ধির কথা। তর্কবিদ্যা নিরর্থিকা।

'প্রভু কহে কোন বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার।
রায় কহে—কৃষ্ণভক্তি বিনা নাহি আর॥'

কৃষ্ণভক্তিই পরাবিদ্যা। লোকে বিদ্যার্জন করে কেন? শুধু ঈশ্বরে ভক্তিমান হবে বলে। 'পঢ়ে কেন লোক? কৃষ্ণভক্তি জানিবারে। সে যদি নহিল তবে বিদ্যায় কি করে?'

যাই বলো, কোনো লৌকিক যুক্তি দিয়েই ঈশ্বরতত্ত্ব স্থাপিত করা যায় না, ঈশ্বরতত্ত্ব একমাত্র অনুভবসিদ্ধ। সুতরাং ঈশ্বরকে অনুভবের মধ্যে নিয়ে এস। সেই অনুভবেই রসের উত্থান। সেই রসেই ভক্তি। আর সেই ভক্তিতেই বিজ্ঞানঘন আনন্দঘন ঈশ্বরের প্রকাশ।

এক কথায়, শ্রীকৃষ্ণভজনই ভক্তি। ইহলোক ও পরলোকের কামনা বর্জন করে ভগবানে চিত্ত-অর্পণ বা তন্ময়তাই ভক্তি। 'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে। সা তস্মিন পরমপ্রেমরূপা।' ভগবানে পরম প্রেমই ভক্তি। জগৎকে যে ভালোবাসা দিয়ে ঢেকে রেখেছি, তা ঈশ্বরকে দেওয়ার নামই ভক্তি। ষড়রিপুকে স্বতন্ত্র ভাবে নিধন করবার জন্যে চেষ্টা করতে হবে না। মধুর ভাবগুলিকেও নষ্ট করবার দরকার নেই। শুধু ভজনে শুধু ভক্তিতেই ষড়রিপুর বিষদাঁত ক্ষয় হয়ে যাবে। গাঢ় হবে মধুরের উৎসব। শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য আর মধুরের রসবৈচিত্রী। নরোত্তম ঠাকুর বলছেন, কাম দাও 'কৃষ্ণসেবার্পণে', ক্রোধ 'ভক্তদ্বেষীজনে', লোভ 'সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথা', মোহ 'ইষ্টলাভ বিনে' আর মদ 'কৃষ্ণগুণগানে।' আর সিদ্ধাবস্থায় প্রেম যদি জাগে তা হলে আর মাৎসর্য্য কোথায় ?

'মায়াবাদী কর্মনিষ্ঠ কুতার্কিকগণ।
নিন্দুক পাষণ্ডী যত পড়ুয়া অধম॥
সেই সব মহাদক্ষ ধাঞা পলাইল।
সেই বন্যা তা সবারে ছুঁইতে নারিল॥'

যারা সব জ্ঞানমার্গের লোক, যারা শুধু কর্মকেই ফলদাতা ভাবে, যারা যুক্তি দিয়ে ভগবানকে বিচার করতে চায়, যারা পরদ্বেষী, ভগবৎবিমুখ, প্রেমবন্যা তাদের স্পর্শও করল না। তারা চিরদগ্ধ মরুভূমি হয়ে রইল।

ভগবানের পরমসারভূতা স্বরূপশক্তির প্রধানবৃত্তির নাম হ্লাদিনী। হ্লাদিনীর প্রধান বৃত্তিই ভক্তি। অপর নামে রতি, প্রীতি, প্রেম। সিদ্ধির চেয়ে রতি গরীয়সী, মুক্তির চেয়ে ভক্তি। শ্রীকৃষ্ণের চরণ-সেবায় চিত্ত যার নিষণ্ণ, তার মোক্ষে কোনো স্পৃহা নেই। যে মহানন্দে ভগবৎকথাসাগরে বিহার করে, সে চতুর্বর্গকে তৃণের মত জ্ঞান করে। ঈশ্বরসেবা বর্জন করে ভক্ত সালোক্য-সাযুজ্য-সামীপ্য বা স্বারূপ্য—কোনো মুক্তিই চায় না।

'কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া
কভু প্রেমভক্তি না দেয় রাখে লুকাইয়া।'

যারা ভুক্তি-মুক্তি পেয়েই খুশি তাদের শ্রীকৃষ্ণ আর ভক্তি দেন না। যাদের অন্তরে শুধু ভুক্তি-মুক্তির স্পৃহা তাদের পক্ষে ভক্তি সুদুর্লভা। ভুক্তি-মুক্তির বাসনা দূর হলে পরেই ভক্তির সমুচ্ছ্বাস। কিন্তু শ্রীচৈতন্য পাত্রাপাত্র বিচার করলেন না। প্রেম দিলেন নির্বিচারে। আসক্ত-অনাসক্ত, সজ্জন-দুর্জন, হিন্দু-মুসলমান সকলকে। যেহেতু শ্রীচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অভিন্ন হয়েও স্বতন্ত্র ঈশ্বর।

'হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিল যথাতথা।
জগাই মাধাই পর্যন্ত অন্যের কা কথা॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর—প্রেম-নিগূঢ় ভাণ্ডার।
বিলাইল যারে-তারে, না কৈল বিচার॥'

ভক্তিই অমৃতস্বরূপা। ভক্তিই মধুরিমার পূর্ণিমা।

২

ফাল্গুন-পূর্ণিমার সন্ধ্যা। চন্দ্রগ্রহণ লেগেছে। ঘরে-ঘরে ঘাটে-ঘাটে উঠেছে হরিধ্বনি।

সেই হরিধ্বনির মধ্যে নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে শচীমাতার কোল আলো করে প্রকট হল গৌরহরি। আকাশের কলঙ্কী চাঁদকে দিয়ে কী হবে যখন নিষ্কলঙ্ক চাঁদের উদয় হল ভূতলে। আর যার সমস্ত সত্তাই শ্রীনামকীর্তন তার জন্মক্ষণে 'জগভরি হরিধ্বনি' হবে না তো কি।

'হরি বলি নারীগণ দেয় হুলাহুলি।
স্বর্গে বাদ্য নৃত্য করে দেব কুতূহলী॥

প্রসন্ন হৈল দশ দিগ, প্রসন্ন নদীজল।
স্থাবর-জঙ্গম হৈল আনন্দে বিহ্বল ॥'

আট-আটটি কন্যা হয়েছিল শচীর, সব একে-একে গত হয়েছে। তারপর জন্মেছে প্রথম পুত্র, বিশ্বরূপ। বিশ্বরূপের বয়স যখন নয় কি দশ, আবির্ভূত হল গৌরহরি। উঠোনে নিমগাছের নিচে আঁতুড়ঘর. সেইখানে ভূমিষ্ঠ হল বলে নাম হল নিমাই। যেন যমের মুখে তেতো লাগে, তাই।

'ডাকিনী শাকিনী হৈতে শঙ্কা উপজিল চিতে
ডরে নাম থুইল নিমাই।'

চৈতন্যভাগবতে বলছে ঃ

'ইহান অনেক জ্যেষ্ঠ কন্যা পুত্র নাঞি।
শেষ যে জন্ময়ে তার নাম সে নিমাঞি ॥'

চৌদ্দ শ' সাত শকের ফাল্গুনী-পূর্ণিমা তিথিতে পূর্বফল্গুনী নক্ষত্রে সিংহরাশিতে নিমাইয়ের জন্ম। এবার কৃষ্ণ নয়, এবার গৌর। এবার যমুনা নয়, গঙ্গা। এবার রাধা-কৃষ্ণ বা ভক্ত-ভগবানের পৃথকত্ব নয়, এবার 'রসরাজ মহাভাব তুই একরূপ।' এবার রাই-কানু মিলিত তনু। এবার 'না সো রমণ না হাম রমণী। তুঁহু মন মনোভব পেশল জানি।' এবার পতি-পত্নী ভক্ত-ভগবানের মন একত্র পেষণ করা, কিংবা পেষণ করে একত্র করা। এবার মিলনে বিরহ, বিরহে মিলন। আস্বাদ্য আর আস্বাদক একসঙ্গে। এবার অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর। এবার ব্রজপ্রেম নয়, এবার জীবপ্রেম। 'যদি গৌর না হত, কেমন হইত, কেমনে ধরিতাম দে। রাধার মহিমা, প্রেমরসসীমা জগতে জানাত কে।'

'জয় জয় জগন্নাথ শচীর নন্দন।
ত্রিভুবনে করে যার চরণ-বন্দন ॥
নীলাচলে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর।
নদীয়া নগরে দণ্ডকমণ্ডলুকর ॥

কেহ বলে পূরবে রাবণ বধিলা।
গোলোকের বিভবলীলা প্রকাশ করিলা॥
শ্রীরাধার ভাবে এবে গোরা অবতার।
হরেকৃষ্ণ নাম গৌর করিলা প্রচার॥
বাসুদেব ঘোষ কহে করি জোড়হাত।
যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ॥'

বিশ্বরূপ বলদেব, নিমাই কৃষ্ণ। আর নিত্যানন্দের অংশই বিশ্বরূপ। সুতরাং নিতাই নিমাইয়ের বড় ভাই। 'কৃষ্ণ-বলরাম দুই চৈতন্য-নিতাই।'

কৃষ্ণকথা বলো, কৃষ্ণকথাই শ্রোত্রহর, মনোহর। সেই উত্তম-শ্লোকের গুণানুবাদে মূর্খ ও পাষণ্ড ছাড়া আর কার অরুচি হবে? কৃষ্ণের পদনিঃসৃতা গঙ্গা যেমন স্বর্গ, মর্ত ও পাতাল তিন লোককে পবিত্র করে, তেমনি কৃষ্ণপ্রশ্ন বক্তা, শ্রোতা, প্রচ্ছক বা প্রশ্নকারককে উদ্ধার করে। 'অনায়াসে ভবক্ষয় কৃষ্ণের সেবন। এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন॥'

দর্পিত দৈত্যদের ভূরিভারে আক্রান্ত হয়ে খিন্না পৃথিবী গাভীরূপ ধারণ করে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হল। ক্ষীরোদসাগরের তীরে গিয়ে ব্রহ্মা পুরুষসূক্তে বা বেদমন্ত্রে দেবাদিদেব জগন্নাথের স্তব করতে লাগলেন। আকাশবাণী হল, শ্রীহরি অবতীর্ণ হবেন যদুবংশে, বসুদেব-গৃহে। আর যশোদার গর্ভে জন্ম নেবেন যোগমায়া—বিষ্ণুমায়া—কৃষ্ণ-লীলাসঙ্গিনী। আর জন্ম নেবেন সহস্রবদন স্বরাট অনন্তদেব।

দেবক আর উগ্রসেন দুই সহোদর ভাই। দেবকের সাতটি মেয়ে, সর্বকনিষ্ঠার নাম দেবকী। এই সাত-সাতটি মেয়েকেই বিয়ে করেছে বসুদেব। শূরবংশের বসুদেব, বাস করে পুণ্যনগরী মথুরায়। কংস উগ্রসেনের ছেলে, দেবকীর চেয়ে বয়সে বড়, প্রভূত স্নেহ করে ছোট বোনকে। বোনের বিয়েতে প্রাণপণ পরিশ্রম করেছে কংস, এমন কি, নবোঢ়াকে নিয়ে যখন বসুদেব যাচ্ছে রথে করে, অশ্বের রশ্মি

ধরল এসে কংস, বললে, আমিই এই রথ চালিয়ে নিয়ে যাব। সহসা অশরীরী দৈববাণী হল, 'রে মূর্খ, সারথিরূপে যাকে তুমি বহন করে নিয়ে যাচ্ছ সে দেবকীর অষ্টমগর্ভের সন্তান তোমার প্রাণহন্তা হবে।'

এক মুহূর্ত স্তম্ভিত হল কংস, পরক্ষণেই কর্তব্য স্থির করে ফেলল। এক হাতে দেবকীর চুল টেনে ধরল, আরেক হাতে প্রচণ্ড খড়্গ তুলল তাকে বধ করতে। তখন সেই কুলদূষণকে সম্বোধন করে বললে বসুদেব, 'আপনি সুপ্রশস্য, ভোজবংশের যশস্কর। সুতরাং বিবাহোৎসবের দিনেই কি করে আপনি স্ত্রীলোককে, বিশেষ করে আপনার বোনকে, হত্যা করতে উদ্যত হয়েছেন? দেহের সঙ্গে-সঙ্গে মৃত্যুও জন্ম নিয়েছে, আজ হোক বা এক শতাব্দী পরেই হোক, দেহিগণের মৃত্যু ধ্রুব। সুতরাং নিজে কেন হিংসকের ভূমিকা নিচ্ছেন? দেখুন আপনার বোন কৃপণা পুত্রিকোপমা কাষ্ঠপুত্তলীর মত অচৈতনপ্রায় হয়েছেন, সুতরাং এই কল্যাণীকে বধ করা আপনার উচিত হবে না।'

কিন্তু দুরাচার কংস নিবৃত্ত হবার লোক নয়। সে আবার খড়্গ তুলল।

তখন অনুপায় হয়ে বসুদেব বললে, 'দৈববাণী যা হয়েছে তাতে দেবকীর থেকে আপনার কোনো ভয় নেই, দেবকীর পুত্রের থেকেই আপনার ভয়। বেশ, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, দেবকীর পুত্র হওয়া-মাত্রই তাকে আমি আপনার হাতে তুলে দেব।'

কংস জানত, বসুদেব সত্যভাষী, কথার অপলাপ করবে না।

ছেড়ে দিল দেবকীকে। দেবকী বাঁচল বটে কিন্তু তার ছেলের কী হবে? প্রথম ছেলে হতেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বসুদেব সেই ভয়সম্ভবকে পৌঁছে দিল কংসের হাতে। কংস বললে, 'এ শিশুকে আপনি নিয়ে যান। এর থেকে আমার কোনো ভয় নেই। আপনার অষ্টম সন্তানই আমার মৃত্যুর কারণ, আমি তার জন্যেই অপেক্ষা করব।'

বসুদেব ছেলে নিয়ে চলে গেল। কিন্তু নারদ এসে গোল

বাধাল। নারদ কংসকে বললে, 'যদুবংশের সকলেই দেবতা, কৃষ্ণের লীলাসহচর, আর কে না জানে, কৃষ্ণ তোমার চিরশত্রু। পূর্বজন্মে তুমি কালনেমি নামে অসুর ছিলে আর বিষ্ণু তোমাকে বধ করেছিলেন। সুতরাং সব দিক থেকেই তোমার সাবধান হওয়া দরকার।'

কংস পাংশু হয়ে গেল। বসুদেব আর দেবকীকে শৃঙ্খলে বদ্ধ করে কারাগারে নিক্ষেপ করলে। আর তাদের যেমনি পুত্র জন্মাতে লাগল তাদেরকে নিধন-কারণ বিষ্ণু মনে করে একে-একে বধ করতে লাগল। শুধু তাই নয়, যদু, ভোজ ও অন্ধকদের সার্বভৌম রাজা পিতা উগ্রসেনকে বন্দী করে নিজেই সিংহাসনে আরূঢ় হল। আত্মতর্পণকামনাই যাদের একমাত্র ব্রত, তারা বাপ মা ভাই বোন কাউকেই হত্যা করতে কুণ্ঠিত হয় না।

বলদর্পিত কংস একে একে দেবকীর ছ-ছ পুত্র বিনাশ করল। শুধু তাই নয়, অসুররাজদের সঙ্গে মিলিত হয়ে যাদবনিগ্রহে লেগে গেল। যাদবগণ যে যেখানে পারল পুণ্য মথুরামণ্ডল ছেড়ে পালাতে লাগল এখানে-সেখানে, পঞ্চালে-কেকয়ে, বিদর্ভে-বিদেহে। এদিকে সপ্তম গর্ভ উৎপন্ন হল দেবকীর। ঐ গর্ভ বিষ্ণুর কলা, অনন্ত-নামধেয় অংশ। ঐ অংশই বলরাম। বলরাম যদি নিহত হয় কৃষ্ণলীলা সম্পূর্ণ হবে না, সুতরাং তাকে বাঁচানো চাই। বিশ্বাত্মা বিষ্ণু তখন যোগমায়াকে আদেশ করলেন, তুমি যাও, নন্দগোকুলে বসুদেবের পত্নী রোহিণী আশ্রয় নিয়েছে, তুমি দেবকীর গর্ভ আকর্ষণ করে রোহিণীর উদরে স্থাপন করো। তার পর আমি পূর্ণরূপে দেবকীর নন্দন হয়ে জন্মাব আর তুমি নন্দের পত্নী যশোদার গর্ভে জন্মাবে। লোককুল তোমাকে সর্বকামপ্রদাত্রী ও সর্ববরেশ্বরী বলে পূজা করবে। নানা নামে বিখ্যাত হবে তুমি পৃথিবীতে—দুর্গা, ভদ্রকালী, বিজয়া, বৈষ্ণবী, কুমুদা, চণ্ডিকা, কৃষ্ণা, মাধবী, কন্যকা, মায়া, নারায়ণী, ঈশানী, শারদা আর অম্বিকা। তুমিই আমার আবরিকা শক্তি, তুমিই প্রপঞ্চাধিকারিণী মহামায়া।

যথাদিষ্ট করল যোগমায়া। দেবকীর গর্ভলক্ষণ তিরোহিত হল আর রোহিণীর কোলে জন্ম নিল বলরাম। গর্ভ সংকর্ষণ করে নেবার জন্যে নাম হল সংকর্ষণ। লোকমনোরঞ্জক হওয়াতে 'রাম' আর বলীদের মধ্যে দুর্ধর্ষ হওয়াতে 'বলভদ্র'-ও নাম নিল। শক্তি আর কান্তির সমাহারস্বরূপ সংক্ষেপে আখ্যাত হল বলরামে।

ভক্তের অভয়দাতা ভগবান পূর্ণরূপে বসুদেবের মনে আবির্ভূত হলেন। মনোমধ্যে শ্রীমূর্তি ধারণ করে বসুদেব দিবাকরের মত দীপ্তিমান হয়ে উঠল। অনন্তর, পূর্বদিক যেমন শশাঙ্ককে ধারণ করে, তেমনি শুচিস্মিতা শুদ্ধসত্ত্বা দেবকী অচ্যুতকে ধারণ করল। যাঁতে সমস্ত জগৎ বাস করছে দেবকী তাঁরই আবাসস্থান হয়ে উঠল। কিন্তু নিজের এই গহন আনন্দ অন্যকে জানাতে পারছে না দেবকী। ঘটের মধ্যে যেমন দীপশিখা কিংবা জ্ঞানবঞ্চকের অন্তরে যেমন সুন্দর কথা রুদ্ধ থাকে তেমনি কংসের কারাকক্ষে সে শৃঙ্খলিতা। কিন্তু একদিন কংস দেখতে পেল তাকে। দেখল অঙ্গপ্রভায় অন্ধকার কারাকক্ষ আলোকিত করে বসে আছে দেবকী। কোথায় বিষাদে-মালিন্যে আচ্ছন্ন ছিল, এখন যে দেখি 'প্রভয়া বিরোচয়ন্তী'—এর অর্থ কী? নিশ্চয়ই আমার প্রাণহর হরি দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হয়েছেন। এখন আমার কী কর্তব্য?

মানসনেত্রে গর্ভশায়ী শ্রীহরিকে দেখে ফেলল কংস।

কিন্তু চুপ করে থাকলে চলবে না। তবে কি দেবকীকে বধ করব? দেবকীকে বধ করলে একসঙ্গে স্ত্রীবধ, ভগিনীবধ ও গর্ভিণী-বধের পাতক হবে, তাতে যশ, শ্রী ও পরমায়ু ক্ষীণ হবে দিন-দিন। যে শুধু হিংসা করেই জীবনধারণ করে সে জীবন্মৃত। তাহলে কী করি? হরির প্রতি বৈরবন্ধনপূর্ব্বক তার জন্মের জন্য প্রতীক্ষা করি। বিষাক্ত বিদ্বেষে হরিসংলগ্নমন হয়ে বিরাজ করতে লাগল কংস। দিনরাত্রির মধ্যে এক মুহূর্তও তার শান্তি নেই, হরিচিন্তা থেকে বিচ্ছেদ নেই, শত্রুতায় তীক্ষ্ণাগ্র অস্ত্রের মত উদ্যত হয়ে রইল। খেতে-

শুতে উঠতে-বসতে চলতে-ফিরতে সর্বসময় হৃষীকেশকে চিন্তা করে জগৎ-তন্ময় দেখতে লাগল।

ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে ঘনান্ধকার নিশীথে কংস-কারাগারে ভূমিষ্ঠ হলেন শ্রীহরি। বসুদেব দেখল, কি অদ্ভুত শিশু! চতুর্ভুজ, অম্বুজেক্ষণ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসলক্ষ্ম, গলদেশে কৌস্তুভমণি, পরিধানে পীতবাস, বর্ণ সান্দ্রপয়োদের মত মনোহর। বৈদূর্য, কিরীট ও কুণ্ডলের প্রভায় কেশদাম দেদীপ্যমান, অঙ্গদে-কঙ্কণে-মেখলায় সুশোভান্বিত। কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করতে লাগল বসুদেব।

দেবকী বললে, 'আপনার এ অলৌকিক চতুর্ভুজ রূপ সম্বরণ করুন। নচেৎ কংস আপনাকে সহজেই চিনতে পারবে।'

নিষ্কিঞ্চন সামান্য শিশু হয়ে গেলেন শ্রীকৃষ্ণ!

ওদিকে জন্মরহিত হয়েও যোগমায়া যশোদাকে নিমিত্তমাত্র করে জন্ম নিল ব্রজগৃহে। মায়াবশে যশোদার স্মৃতি অবলুপ্ত হয়েছে। তার কী হয়েছে, পুত্র না কন্যা, তার জ্ঞান নেই।

কারাগারের প্রহরীরা ঘুমে ঢলে পড়ল। লৌহদ্বার খুলে গেল সহসা, অর্গল আর শৃঙ্খল আর প্রতিবন্ধ হল না বসুদেবের। শিশু-কৃষ্ণকে নিয়ে তিনি বাইরে এসে দাঁড়ালেন। জলদ গর্জন আর বর্ষণ করছে একসঙ্গে, অনন্তদেব সহস্র ফণা বিস্তার করে বসুদেবকে আবৃত করে চলতে লাগল পিছে-পিছে। আবর্ত-আকুলা যমুনা পথ ছেড়ে দিল বসুদেবকে, যেমন রামচন্দ্রকে পথ ছেড়ে দিয়েছিল সিন্ধু। যমুনা উত্তীর্ণ হয়ে বসুদেব নন্দব্রজে এসে দেখতে পেলেন এখানেও গোপ-গোপীরা নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে আছে। শিশুপুত্রকে যশোদার শয্যায় শুইয়ে তার কন্যাকে নিয়ে পুনর্বার কারাগারে ফিরে এলেন। দ্বার আবার বদ্ধ হল, ফিরে এল প্রাক্তন বন্ধনদশা।

যোগমায়া কেঁদে উঠল। প্রহরীরা নিদ্রোত্থিত হয়ে বুঝল নবীন শিশুর জন্ম হয়েছে। কংসের কাছে পৌঁছুল প্রসববার্তা। উন্মত্তবেগে

স্খলিতপদে ছুটে এল সূতিকাগৃহে। দেবকী কাতরকণ্ঠে চাইল শিশুর প্রাণভিক্ষা। কংসের এতটুকুও দয়া হল না, সদ্যোজাতাকে কেড়ে নিল দেবকীর বাহু থেকে, শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করল সবেগে। আর-আরবার শিশুরা শুধু রক্তে-মাংসে স্তূপীকৃত হয়ে নিঃশব্দে নিহত হয়েছে, এবার আরেক রকম হল। দেবকী সবিস্ময়ে চেয়ে দেখল সায়ুধাষ্টমহাভূজা মহামায়া ঊর্ধ্বাকাশে বিরাজমানা। বজ্রপরুষকণ্ঠে ভর্ৎসনা করে উঠেছে কংসকে : 'আমাকে বধ করে তোর লাভ কি? তোর পূর্বশত্রু তোর অন্তক হয়ে জন্মেছেন অন্য কোথাও।'

'কোথায়?' রুক্ষমূর্তি কংস গর্জন করে উঠল।

'অন্য কোথাও।' অন্তর্হিত হল যোগমায়া।

'মা, কৃষ্ণ মাটি খেয়েছে।' যশোদার কাছে গোপবালকেরা এসে নালিশ করলে।

'দেখি, দেখি, মুখ খোল্ তো।' যশোদা সবেগে আকর্ষণ করল কৃষ্ণকে।

কৃষ্ণ প্রথমে চাইল পরিহার করতে, শেষে মা'র নির্বন্ধের আতিশয্যে মুখব্যাদান করল। যশোদা সভয়ে দেখল, সেই মুখের মধ্যে স্থাবর জঙ্গম অন্তরীক্ষ দিঙ্মণ্ডল জ্যোতির্মণ্ডল সূর্য চন্দ্র অগ্নি বায়ু গিরি সাগর দ্বীপ—সমুদয় বিশ্ব বিরাজ করছে। এ কী সুদুর্দর্শ রূপ, এ কী দৈবী মায়া! কিন্তু যশোদা পরাভব মানবে না। তুমি যেই হও, তুমি আমার শিশু, তুমি আমার বাৎসল্যের অধীন। ঐশ্বর্যের পণে চাই না তোমাকে, তোমাকে চাই মাধুর্যের পণে—সন্তান-স্নেহের নিবিড়তায়।

শচী খই-সন্দেশ খেতে দিয়েছে নিমাইকে। নিমাই তা না খেয়ে মাটি তুলে খেয়েছে।

'দেখি শচী ধাঞা আইলা করি হায় হায়।
মাটি কাড়ি লৈয়া কৈল মাটি কেন খায়॥

কান্দিয়া বলিল শিশু কেন কর রোষ।
তুমি মাটি খাইতে দিলে মোর কিবা দোষ॥
খই সন্দেশ অন্ন যত মাটির বিকার।
এই মাটি সেই মাটি কি ভেদ বিচার॥'

৩

সর্বকামবর্ষী কৃষ্ণের স্তব করছেন দেবতারা: 'ভগবান, আপনি সত্যব্রত, সত্যই আপনার সঙ্কল্প, সত্যই আপনার প্রাপ্তিসাধন। আপনি ত্রিসত্য, অর্থাৎ আপনি তিনকাল সত্য। আপনি সত্যের কারণ ও সত্যে অবস্থিত। আমরা আপনার শরণাপন্ন হলাম! এই দেহপ্রপঞ্চ আদিবৃক্ষস্বরূপ, এক প্রকৃতি এর আশ্রয়; সুখ-দুঃখ এর দুই ফল; সত্ত্ব, রজ ও তম এই ত্রিগুণ এর মূল; ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এর চার রস; পঞ্চ ইন্দ্রিয় এর জ্ঞান; শোক মোহ জরা মৃত্যু ক্ষুধা পিপাসা এর ছয় স্বভাব; রস রক্ত মাংস মেদ অস্থি মজ্জা শুক্র এই সাতটি এর ত্বক; পাঁচ ইন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধি অহঙ্কার এই আটটি এর বিটপ; নবদ্বার এর নয় ছিদ্র এবং দশ প্রাণ এর পত্র। জীবাত্মা ও পরমাত্মা দুই পাখি এই বৃক্ষে বাস করছে। আপনিই এই বৃক্ষের উৎপত্তিস্থান, লয়স্থান ও পালনকর্তা। যে আপনার মঙ্গলময় নাম ও রূপ শ্রবণ চিন্তন বা উচ্চারণ করে বা অন্যকে করায়, আপনার চরণ-সেবায়ই যে নিবিষ্ট, তাকে আর সংসারে আসতে হয় না পুনর্বার। আপনি ঈশ্বর, আপনার জন্মমাত্রেই আপনার চরণভূতা এই ধরিত্রীর ভার অপনীত হল। আপনি অসংসারী, আপনার জন্মের কারণ আপনার লীলা ছাড়া আর কিছু নয়। আর জীবাত্মার যে জন্ম স্থিতি ও ধ্বংস হয়ে থাকে তা আপনার অবিদ্যা থেকেই উৎপাদিত—

আসলে জীবাত্মারও জন্মাদি কিছু নেই। বারে-বারে অবতীর্ণ হয়ে আমাদের যেমন পালন করেছেন, এবারও, যদুশ্রেষ্ঠ, অবনীর গুরুভার হরণ করুন।' 'ভারং ভুবো হর যদূত্তম!'

'কৃষ্ণাদ্ভুতবলাহক।' কৃষ্ণ মেঘ ছাড়া আর কি। মেঘ বলেই তো কৃষ্ণ কামবর্ষী। পাপদাবদগ্ধ ধরণী তাপে-তৃষ্ণায় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। এবার ঝরবে অমিয়নির্ঝর। দলিতাঞ্জন-চিক্কণ স্নিগ্ধকান্ত নবঘন দেখা দিয়েছ। 'লীলামৃত বরিষণে, সিঞ্চে চৌদ্দভুবন, হেন মেঘ যবে দেখা দিল।' 'কৃষ্ণ নবজলধর, জগৎ-শস্য উপর, বরিষয়ে লীলামৃতধার।'

শুধু প্রার্থনায়ই নেমে এল মেঘ। 'ভক্তের ইচ্ছায় কৃষ্ণের সর্ব অবতার।' 'ভক্তের ইচ্ছায় অবতরে ধর্মসেতু।' ক্ষেতের আল বা সেতু হচ্ছে ক্ষেতের রক্ষক। তেমনি অবতার হচ্ছে ধর্মের রক্ষক। এবার শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হল অদ্বৈতের আহ্বানে, অদ্বৈতের হুঙ্কারে।

শান্তিপুরে বাস, বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, নাম কমলাক্ষ মিশ্র। সর্ববিদ্যায় পারঙ্গম, মহত্তম বৈষ্ণব, দীক্ষা নিয়েছেন কৃষ্ণভক্ত মাধবেন্দ্র-পুরীর কাছে। সে যুগে বৈষ্ণবেরা সমাজে বিশেষ কলকে পেত না, এক কোণে পড়ে থাকত লাঞ্ছিতের মত। লোকেরা বিষহরি, বাশুলী বা মঙ্গলচণ্ডীর পূজো করত। কৃষ্ণনামে কারু আস্থা নেই, সাড় নেই, যারা কৃষ্ণনাম করে, যাদের কৃষ্ণনামে উন্মাদনা তারা সব উপহাসের বস্তু। শুধু বিদ্যা ও বিষয়ব্যাপারের আয়োজন, ভক্তির বাষ্প নেই কোনোখানে। বৈষ্ণবেরা ম্লান, বিমর্ষ। চারদিকে কেবল প্রাণহীন বিদ্যা ও জ্ঞানহীন বিষয়ের হাঁকডাক।

'সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে।
কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণভক্তি কারো নাহি বাসে॥
বাশুলী পূজয়ে কেহো নানা-উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহো যক্ষপূজা করে॥

নিরবধি নৃত্য-গীত-বাদ্য-কোলাহল।
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল ॥'

কিংবা—

'কেহো পাপে কেহো পুণ্যে করে বিষয়ভোগ।
ভক্তি গন্ধ নাহি—যাতে যায় ভবরোগ ॥'

ভবরোগ কী? ভোগেচ্ছাই ভবরোগ। তার ক্ষয় ভক্তি-রসে। 'যেই রসে ভক্ত সুখী, কৃষ্ণ হয় বশ।' যেখানে স্বয়ং কৃষ্ণ বশীভূত সেখানে আর কিসের কান্না, কিসের কামনা?

কমলাক্ষের বাড়িতে বৈষ্ণবদের সভা বসে। সেখানে নিজেদের হীনাবস্থা নিয়ে পরস্পর তারা দুঃখ করে। কি করে যাবে এই দৈন্যদশা? কবে ঐশ্বর্য প্রতিষ্ঠিত হবে আমাদের?

কমলাক্ষ হুঙ্কার ছাড়েঃ 'আর দেরি নেই, আর্তত্রাণ-পরায়ণ মঙ্গলায়তন হরি আসবেনই আসবেন।' তারপর সসঙ্গ-ধ্যানে প্রার্থনা করেঃ 'হে কৃষ্ণ, অবতীর্ণ হও, কলিজীবের দুরবস্থা দূর করো। হে করুণা-ঘনাবলোকন, পুরটসুন্দরদ্যুতি, এ প্রাণহীন জড়ান্ধকারকে তোমার আবির্ভাবের খড়্গে খণ্ড-বিখণ্ড করে দাও।'

এই কমলাক্ষই উত্তরকালে অদ্বৈত-আচার্য।

এই অদ্বৈতের হুঙ্কারে-কাকুতিতেই শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব। অদ্বৈতেরই গর্জনে-ভজনে। গর্জনও করছে ভজনও করছে। জোরও করছে আবার মিনতিও করছে। একদিকে ডাকাতে চিৎকার আরেক দিকে পীড়িত-বিপন্নের অনুনয়। দাহ আর দৈন্য একসঙ্গে।

'হুঙ্কার করয়ে কৃষ্ণ-আবেশের তেজে।
যে ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভেদি বৈকুণ্ঠেতে বাজে ॥
যে প্রেমের হুঙ্কার শুনিঞা কৃষ্ণনাথ।
ভক্তিবশে আপনেই হইল সাক্ষাত ॥
অতএব অদ্বৈত বৈষ্ণব-অগ্রগণ্য।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড যাঁর ভক্তিযোগধন্য ॥'

কিংবা—

'আচার্য্য গোসাঞি প্রভুর ভক্ত-অবতার।
কৃষ্ণ-অবতার হেতু যাঁহার হুঙ্কার॥'

অদ্বৈত আর কী করে? কৃষ্ণকে তুলসী আর জল দেয়। এক পত্র তুলসী আর এক গণ্ডুষ জল। 'তুলসী-মঞ্জরী সহিত গঙ্গাজলে। নিরবধি সেবে কৃষ্ণ মহা-কুতূহলে॥'

'গঙ্গাজল তুলসী-মঞ্জরী অনুক্ষণ। কৃষ্ণপাদপদ্ম ভাবি করেন সমর্পণ॥' আর যে জল-তুলসী দেয় কৃষ্ণকে, তার ঋণ শোধ করতে পারে, ঘরে এমন ধন নেই কৃষ্ণের। সুতরাং কৃষ্ণ কী করে? নিজেকেই বেচে দেয় ভক্তের কাছে। স্বতন্ত্র হয়েও ভক্তপরবশ হয়ে যায়।

তাই যখন কৃষ্ণকে পূজো করো, স্মরণ করো কৃষ্ণের পাদপদ্ম। কৃষ্ণ কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, সেই লীলামানুষবিগ্রহ, বনমালী পীতবাস, সেই বেণুবাদ্যবিশারদ, গাঢ়চিত্তে এই সান্নিধ্য কল্পনা করো। স্থাপন করো সাক্ষাৎ সম্পর্ক। সাক্ষাৎ ভজনে প্রবৃত্তিযুক্ত হও। প্রবৃত্তি নেই শুধু আবৃত্তি—সেখানে শত শ্রবণ কীর্তন করলেও 'কৃষ্ণপদে প্রেমধন' মিলবে না।

সুতরাং 'অদ্বৈতের কারণে চৈতন্য অবতার।' 'কৃষ্ণের আহ্বান করে করিয়া হুঙ্কার। এমতে কৃষ্ণেরে করাইল অবতার॥'

'শুন শ্রীনিবাস! গঙ্গাদাস! শুক্লাম্বর!
করাইব কৃষ্ণ সর্ব-নয়ন-গোচর॥
সভা উদ্ধারিব কৃষ্ণ, আপনে আসিয়া।
বুঝাইব কৃষ্ণভক্তি তোমা সভা লৈয়া॥
যবে নাহি পারোঁ তবে এই দেহ হৈতে।
প্রকাশিয়া চারিভুজ, চক্র লমু হাতে॥
পাষণ্ডী কাটিয়া করিমু স্কন্ধ নাশ।
তবে কৃষ্ণ প্রভু মোর, মুঞি তাঁর দাস॥'

তেরো মাস মায়ের গর্ভে বাস করেছে, শিশু দেখতে অনেক বড় ও বলবান হয়ে জন্মাল। 'সিংহগ্রীব গজস্কন্ধ বিশাল-হৃদয়। আজানুলম্বিত ভুজ তনু রসময়॥'

'শ্রীচৈতন্যসিংহের নবদ্বীপে অবতার। সিংহগ্রীব সিংহবীর্য সিংহের হুঙ্কার॥ সেই সিংহ বসুক জীবের হৃদয়-কন্দরে। কল্মষ-দ্বিরদ নাশে যাঁহার হুঙ্কারে॥' মেয়েরা কোলে নেয় শিশুকে, কোলে ধরে রাখতে পারে না, ছাপিয়ে পড়ে। আর কী রূপ, চন্দ্র-ভানু যেন একত্র উদয়, তপ্ত আর দ্রব, দীপ্ত আর মধুর একসঙ্গে। গলিত লাবণ্যে সুবলিত আকৃতি। আয়ত-বিশাল চোখে মর্ত-দুর্লভ করুণা। করতল আর পদতল যেন প্রস্ফুট কমল—কনক-কমল। সর্ব-অঙ্গে নির্মলকান্তির স্রোত। এত রূপ কি মানুষে সম্ভব? এত করুণাবারি ধরেছে, এ কি মানুষের চোখ?

'রসিকশেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।' শুধু ঐশ্বর্যস্বরূপ নয়, আবার মাধুর্যবিগ্রহ। শুধু নিজেকে নিজের সম্ভোগ নয়, ভক্তের মধ্যে দিয়ে নিজেকে আস্বদন। ভক্তের আনন্দবর্ধনেই নিজের যশোবর্ধন। এবং ভক্তকে তিনি এই আনন্দ দিচ্ছেন কেন? নিজের সুখবাসনায় নয়, ভক্তের প্রতি নিরুপাধিক করুণায়। তিনি শুধু রসিকশেখর হলে ভক্তকে বৈধীভক্তি নিয়ে থাকতে হত, তিনি পরমকরুণ বলেই ভক্তের রাগভক্তির সমুচ্ছ্বাস।

তারই জন্যে নিমাইয়ের দুটি চোখে করুণার কালিন্দী।

কিন্তু থেকে-থেকে নিমাই কেঁদে ওঠে কেন? হরিনাম শোনবার জন্যে। হরিনাম শুনলেই তার কান্নার বিরাম। হরিনাম শুনলেই তার তরল-হাসির তরঙ্গ। 'তাবৎ কান্দেন প্রভু কমললোচন। হরিনাম শুনিলে রহেন ততক্ষণ॥'

কে একটি প্রতিবেশিনী নিমাইকে কোলে নিয়েছে আদর করে। তৎক্ষণাৎ শিশুর আকাশ-ফাটানো কান্নার রব উঠল। প্রতিবেশিনী ভীষণ অপ্রস্তুত, কিছুতেই শান্ত করতে পারছে না শিশুকে। এটা-

ওটা কত খেলনা দিচ্ছে, খাবার দিচ্ছে, আদর-আরাম দিচ্ছে, তবু নিমাই নাছোড়বান্দা। যেমন-কে-তেমন, কান্নায় সে প্রখর-মুখর।

ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন শচীরাণী। বললেন, 'তুমি যে নাজেহাল হয়ে গেলে ছেলে নিয়ে। ও কিছু নয়, বারকতক হরি বলো, ছেলে চুপ করবে দেখো।'

হরি হরি! মরি মরি! ছেলের আর কান্না নেই, মুখে-চোখে প্রসন্নতার ঢেউ।

কৃষ্ণনাম অমৃতসিন্ধু—'যার একবিন্দু পানে, উৎফুল্লিত তনু-মনে, হাসে-গায় করয়ে নর্তন।' নাম বলো, নাম শোনাও, নামই বলিষ্ঠ সাধন, নামই পরপদপ্রাপ্তির অমোঘ পাথেয়। 'তস্য নামঃ মহদ্‌যশঃ।'

আরেক দিন কাঁদছে নিমাই। চাঁদ দে মা বলে বায়না ধরেছে। জ্যোৎস্নারাত্রির আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে শচীরাণী ডাকছেন চাঁদকে, সকাতরে আয়-আয় বলছেন। অবুঝ চাঁদ গ্রাহ্যও করছে না। নিমাইও তেমনি নাছোড়। চাঁদ না দিবি তো ধূলোয় লোটাব, মাথামুড় খুঁড়ব। 'বাসু বলে এ ছাবাল ধূলোয় লোটাবা, স্নেহভরে তুমি মাগো কত ঠেকাইবা।' আকুল হয়েছে শচীরাণী, ভেবে পাচ্ছেন না কী করে শান্ত করবেন ছেলেকে। সহসা দেয়ালে-টাঙানো রাধাকৃষ্ণের একখানি ছবির দিকে চোখ পড়ল, সেটা পেড়ে এনে ছেলের হাতে দিলেন। কোথায় কান্না! এবার নিমাইয়ের কণ্ঠে হাসির লহর, কর্ণানন্দী কলধ্বনি।

'রাধাকৃষ্ণ চিত্র এক মিশ্রগৃহে ছিল।
পুত্র শান্তাইতে শচী তাহা হাতে দিল॥
চিত্র পাঞা গোরাচাঁদের মনে বড় সুখ।
বাসু কহে পাটে পহু হের নিজ মুখ॥'

শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তি। তার এক শক্তি আনন্দদায়িকা। তার অন্য নাম হ্লাদিনী। হ্লাদিনীশক্তির ঘনীভূত বিলাসই প্রেম। প্রেমের

প্রগাঢ়তম রূপই মহাভাব আর মহাভাবের মহত্তমা প্রতিমা রাধিকা। গোবিন্দানন্দিনী। শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়সারস্বরূপা। শ্রীকৃষ্ণ প্রেম, রাধিকা আনন্দ। প্রেম আর আনন্দ অভেদ, যেমন বহ্নি আর তার দীপ্তি, মৃগমদ আর তার গন্ধ। তাই রাধাকৃষ্ণ অভেদ, একাত্ম। একাত্ম হয়েও কিন্তু লীলারসের আস্বাদের জন্যে তুই ভিন্ন দেহে অভিব্যক্ত। কিন্তু এমন এক রস আছে যা তুই দেহ একীভূত না হলে সম্ভোগ হয় না। সে-সম্ভোগে রসিকশেখর কৃষ্ণকে রাধিকার ভাব-কান্তিকে অঙ্গীকৃত করতে হয়। সে-রসের নাম প্রেমভক্তি। এই প্রেমভক্তি একমাত্র শ্রীচৈতন্যে। তাই রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণই শ্রীচৈতন্য।

'রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা তুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি॥
সেই তুই এক এবে চৈতন্য গোঁসাঞি
ভাব আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঁই॥'

৪

উপেন্দ্র মিশ্রের ছেলে জগন্নাথ মিশ্র। বাড়ী শ্রীহট্ট জেলার ঢাকা-দক্ষিণ গ্রামে। বৈদিক ব্রাহ্মণ, দেখতে পুরন্দরের মত, নবদ্বীপে এসেছেন বিদ্যার্জ্জন করতে, আর পাণ্ডিত্যেও উপাধি পেয়েছেন পুরন্দর। নবদ্বীপ তখন বিদ্যার বন্দর, চতুর্দিকে শুধু বিদ্যার বাণিজ্য। যে বিদ্বান সেই সুন্দর, সেই সার্থক, সেই সুখী, সর্বত্র এই তখন মূল্যায়ন। কাঞ্চনের কৌলীন্য নয় পাণ্ডিত্যের কৌলীন্য। বিদ্বান দেখলেই লোকে সমীহ করে, আদর করে, প্রথম পঙ্‌ক্তিতে আসন দেয় সভাণ্ডে। ধনীরও গৌরব ধনে নয়, পণ্ডিতপোষণে। মায়েরাও কন্যার জন্যে 'বিত্ত' চায় না 'বিদ্যা' চায়।

অধ্যাপক নীলাম্বর চক্রবর্তী। তার বড় মেয়ের নাম শচী। শচীকেই নীলাম্বর জগন্নাথের হাতে সমর্পণ করলেন।

বিশ্বরূপকে সঙ্গে নিয়ে তোমরা একবার এস, জগন্নাথ ও শচীর উপর আদেশ এল ঢাকা-দক্ষিণ গ্রাম থেকে। জগন্নাথের মা শোভাদেবী লিখে পাঠালেন, কতদিন তোমাদের দেখি না। বিশ্বরূপ এখন না জানি কত বড়টি হয়েছে।

সপুত্রকলত্র জগন্নাথ ফিরে এল নিজ গৃহে। কিন্তু কদিন পরেই শোভাদেবী অপূর্ব এক স্বপ্ন দেখলেন। দেখলেন, কে এক জ্যোতির্ময় পুরুষ তাঁকে বলছেন, তোমার পুত্রবধূর গর্ভে শ্রীভগবান আবির্ভূত হয়েছেন, শিগগির ওদের নবদ্বীপে পাঠিয়ে দাও। এবার নবদ্বীপই নবীন হরিক্ষেত্র।

ত্বরান্বিত হয়ে ফিরে এল জগন্নাথ। 'শচীগর্ভে বৈসে সর্ব-ভুবনের বাস। ফাল্গুনী পূর্ণিমা আসি হইলা প্রকাশ॥'

জ্যোতির্বিৎ বিপ্র এসে বললে, 'এ শিশু সাক্ষাৎ নারায়ণ। এর থেকেই সর্বধর্মের স্থাপন হবে। হবে সর্বজীবের উদ্ধার। এই সর্বভূতদয়ালু।'

'ভাগবতধর্মময় ইহান শরীর।
দেব-দ্বিজ-গুরু-পিতৃ-মাতৃভক্ত ধীর॥'

বিশ্বরূপের ছোট ভাই, নাম হল বিশ্বম্ভর।

গুপ্ত ভাবে গোপালের খেলা খেলছে নিমাই। চার মাসের শিশু, ঘরে শুয়ে আছে একলা, শচী ছুটে এসে দেখে, ঘরের সমস্ত জিনিস কে ফেলে ছড়িয়ে ছত্রাকার করে দিয়েছে, ভেঙেছে দধি-দুধের হাঁড়ি, মেঝেময় ছিটিয়ে দিয়েছে ধানচালের পসরা। কই, ঘরে আর লোক কই, কোন দৈবের এই অঘটন। বাহুতে অঙ্গদ-বলয়, কটিতে কিঙ্কিণী, পায়ে মগরা খাড়ু, গলায় বাঘ-নখ, উঠোনে হামাগুড়ি দিচ্ছে নিমাই। হাতের কাছে যা পাচ্ছে, সাপ-ব্যাঙ, তাই ধরছে মুঠো চেপে। একদিন একটা সাপের উপর দিব্যি শুয়ে পড়ল, সাপ

কুণ্ডলী করে জড়িয়ে ধরল শিশুকে। সবাই ভয় পেয়ে কাঁদতে লাগল, ডাকতে লাগল গরুড়-গরুড়। সাপ বন্ধন খুলে পালাতে চাইল কিন্তু নিমাই ছাড়তে রাজি নয়। আর থেকে-থেকেই তার আঙিনা পেরিয়ে গঙ্গার দিকে যাত্রা। যখন ঘরের দিকে যায় তখন তার নগ্ন পায়ে নূপুরের ধ্বনি।

জগন্নাথ বলে, 'আমার এ পুত্রের দেহে গোপাল এসেছে।'

'কে এসেছে জেনে আমার দরকার নেই।' শচী নিমাইয়ের মাথায় রক্ষা বেঁধে দেয় : 'যেই আসুক, আমার বাছার যেন অমঙ্গল না হয়। আমার বাছা যেন সুস্থ থাকে।'

নামকরণের সময় অনেক কিছুই ধরতে দিয়েছে নিমাইকে। ধান, পুঁথি, খড়ি, সোনা, রুপো, মাটি—আরো কত কি। কিন্তু নিমাই সব ফেলে 'ভাগবত' ধরেছে। ধরেছে ভক্তি, ধরেছে লোকসুমঙ্গলা হরিকথা।

'জগন্নাথ বোলে, শুন বাপ বিশ্বম্ভর।
যাহা চিত্তে লয় তাহা ধরহ সত্বর॥
সকল ছাড়িয়া প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
'ভাগবত' ধরিয়া দিলেন আলিঙ্গন॥'

ভাগবত কী ? ভাগবত ভক্তির সুধাসত্র। ভক্তি কী ? শ্রীকৃষ্ণে সততযুক্ততাই ভক্তি। শ্রীকৃষ্ণকথাই 'স্বাদু স্বাদু পদে পদে।'

'সত্যং পরং ধীমহি।' সেই নিরস্তকুহককে, সেই স্বপ্রকাশ সত্যস্বরূপকে, পরমাত্মাকে ধ্যান করি। এ তো ব্যাসদেবের কথা। কিন্তু আমরা, আমরা যারা কলিহত জীব, যারা মন্দপ্রজ্ঞ, মন্দভাগ্য ও অল্পায়ু, যাদের 'নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং দিবা চ ব্যর্থকর্মভিঃ'—যাদের রাত্রি নিদ্রায় ও দিন ব্যর্থ কর্মে কেটে যায়—তাদের উপায় কী হবে ? উগ্রশ্রবা সূত বললেন, তোমরা শুধু ভাগবত, ভগবানের লীলাকথা শ্রবণ করো। তোমাদের শুধু ভগবৎকথায় রতি হোক, তোমরা 'বাসুদেবকথারুচিঃ' হয়ে ওঠো।

সকল বেদের প্রতিপাদ্য বাসুদেব, সকল যজ্ঞের লক্ষ্য বাসুদেব, সকল যোগের লভ্য বাসুদেব, সকল ক্রিয়ার গতি বাসুদেবে। জ্ঞান তপস্যাধর্ম বাসুদেবেই নিহিত। বাসুদেবই জীবের পরা গতি। কিন্তু কী হবে বেদে-বাদে, যাগে-যজ্ঞে, ক্রিয়ায়-অনুষ্ঠানে, যদি ভগবানে অহেতুকী ভক্তি না জন্মায়? যারা আত্মারাম, যারা নির্গ্রন্থ, অর্থাৎ যারা ছিন্নবন্ধন, তারাও শ্রীহরিকে অহেতুকী ভক্তি করে থাকে। সুতরাং অহেতুকী ভক্তিই জীবের পরমধর্ম। অহেতুকী ভক্তি ছাড়া আর মঙ্গলময় পথ নেই। হরিকথাই তাই শ্রোতব্য, স্মর্তব্য, কীর্তিতব্য। যদি বক্তা থাকে শোনো হরিকথা, যদি বক্তা না থাকে হরিকথা কীর্তন করো, আর যদি বক্তা ও শ্রোতা কেউই না থাকে, তবে মনের নির্জনে স্মরণ করো বাসুদেবকে। শ্রীকৃষ্ণকে ছুঁয়ে থাকো সব সময় —এক মুহূর্তও যেন নিরালম্ব বলে নিজেকে না অনুভব করো।

আর কিছু নয়, শুধু ভক্তি, তীব্র ভক্তি। অকামী হও বা সর্বকামী হও বা মোক্ষকামী হও, শুধু প্রগাঢ় ভক্তিতে একান্ত ভক্তিতে আরাধনা করবে পুরুষোত্তমকে। ভক্তিই পরম পুরুষার্থ। ভগবানের নামগুণের শ্রবণে-কীর্তনে ধ্যানে-আরাধনে, তাঁর ভক্তের সেবাচর্যায় ও ভক্তি-গ্রন্থের পাঠে-আবৃত্তিতেই জন্মাবে ভক্তি। নিরন্তর যে হরিকথা শোনে তার ত্রিগুণজ বিক্ষেপ দূরে যায়, বিষয়ে বৈরাগ্য আসে, আত্মা প্রসন্নতায় আরূঢ় হয়। 'পদং তৎ পরমং বিষ্ণোর্মনো যত্র প্রসীদতি।' মনের প্রসন্নতাই শ্রীবিষ্ণুর পরম পদ। সুতরাং যে হরিগুণ গান করে সেই আয়ুষ্মান।

'শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি-ফল ধরে।
জন্মে-জন্মে চৈতন্যের সঙ্গে অবতরে॥'

ভক্তের হৃদয় ভগবান আবার ভগবানের হৃদয় ভক্ত। 'সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।' 'ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম।' ভক্তের দেহ শ্রীকৃষ্ণের মন্দির আর ভক্তের হৃদয় তাঁর অচল সিংহাসন। অতএব ভক্তিসাধনই সর্বসাধন।

নিমাই হাঁটতে শিখেছে, আর হাঁটতে শিখেই শুরু করেছে নাচতে। শচী তাকে আঁট করে কাপড় পরিয়ে দিয়েছে, মাথায় চূড়া বাঁধা, তাতে ফুল গোঁজা, গলায় বনমালা, গোপালের বেশে, শচীর আঙিনায় নাচছে কনকোত্তম। নীরোগ নিটোল দেহ, ক্ষীণ কটি, প্রশস্ত বুক, অরুণ-গৌর শিশু কোটি-কন্দর্পের দর্প চূর্ণ করে এসেছে। যে দেখছে সেও নেচে উঠছে সঙ্গে-সঙ্গে। আধো মধুস্বরে হরি বলছে নিমাই। তুমিও যদি বলো সেই সঙ্গে, তবেই নিমাই হাসে, যদি না বলো তো শুনবে তার আর্তনাদ।

'এমন শিশুর রীতি কভু নাহি শুনি।
নিরবধি নাচে হাসে শুনি হরিধ্বনি॥
তাবত ক্রন্দন করে প্রবোধ না মানে।
বড় করি হরিধ্বনি যাবত না শুনে॥'

তারপর ধূলায় গড়াগড়ি দিচ্ছে নিমাই। লজ্জা কি, আনন্দবাসরে তুমিও ধূলিধূসর হও।

শচী ছুটে এসে ছেলেকে কোলে তুলে নিচ্ছে। সোনার অঙ্গ মুছে দিচ্ছে আঁচলে।

চুরি করে খেতে শিখেছে নিমাই। পড়শীদের ঘরে ঢুকতে শিখেছে। সন্তোষ করে কেউ যদি খই-সন্দেশ দেয় তা নিমাই বেশির ভাগই বিলিয়ে দিচ্ছে দু-হাতে। তাদেরই দিচ্ছে, যারা তার সঙ্গে করেছে হরিনাম। এ তো ভারি মজা! নিমাইয়ের যোগাড়-করা খাবারের পাহাড়ে ভাগ বসাবার লোভে মেয়ে-পুরুষ সবাই এখন তাই তাকে দেখলে হরি-হরি বলে। শুধু বলে না, হাততালি দেয়, কেউ-কেউ বা নাচে। যদি কোনো বাড়ি খাবার না দেয় সেখানে নিমাই সিঁদ কাটে। ভাতের হাঁড়িতে হাত ঢুকিয়ে ভাত খায়, কড়াতে চুমুক দিয়ে দুধ। যার ঘর শূন্য, তার অন্তত হাঁড়িটা ভেঙে দিয়ে আসে। আরো উৎপাত, ঘরে যদি শিশু থাকে তাকে কাঁদায়, নয়তো তার মুখে কালিঝুলি মাখিয়ে ভূত সাজায়। প্রায়ই

ধরা পড়ে না, যদি কখনো পড়ে দৈবযোগে, তখন ছাড় নেবার জন্যে তার মিনতির কি অভিনয়!

'এবার ছাড়হ মোরে না আসিব আর।
আর যদি চুরি করোঁ, দোহাই তোমার॥'

এবার নিজে চোর নয়, অপর চোরের হাতে ধরা পড়ল নিমাই।

ঘরের বাইরে কখন কত দূরে চলে এসেছে, চোর দেখল কে একটি সবল সুঠাম ফুটফুটে শিশু। শিশুর রূপ নয়, অঙ্গের আভরণই আকৃষ্ট করল চোরকে। নিমাইকে কাঁধে তুলে নিল। মনে মনে স্থির করল, বাড়ি নিয়ে গিয়ে শিশুর গা থেকে খুলে নেব গয়না, তারপর শিশুকে দূরে নির্জনে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেব। যদি বা তাতে বাধা পড়ে, শিশুকেই সরিয়ে দেব সংসার থেকে।

পথ দিয়ে লোক চলছে কাতার দিয়ে। কেউ কিছু সন্দেহ করছে না। কী করে বা করবে! নিমাই যে একটুও টুঁ করছে না, পরম নিশ্চিন্তে কাঁধের উপর বসে পা ঝুলিয়ে চলেছে। সবাই ভাবছে যার শিশু সেই বুঝি নিয়েছে কাঁধে করে, শহর ঘুরে চলেছে গাঁয়ের দিকে। কাঁধে চড়ে কেমন গরব করে চলেছে দেখ না।

তবু কারু-কারু বুঝি সন্দেহ হল। অমন লোকের কাঁধে এমন কনকের পুত্তলি! জিগগেস করে, 'কোথায় চলেছ খোকা?'

হাসি-হাসি মুখে নিমাই বলে, 'বাড়ি চলেছি।'

অমন স্বচ্ছ-সরল মুখে কথা বলছে যখন, অমন অকুণ্ঠ কণ্ঠে, তখন আর সন্দেহ কি।

এ দিকে, নিমাইকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, শচী আর জগন্নাথ পাগলের মত হয়ে পড়েছেন। শুধু বাপ-মা নয়, এ-পাড়া ও-পাড়া। খোঁজ, খোঁজ, চার দিকে লোক ছুটোছুটি করতে লাগল, কিন্তু কোথায় নিমাই! কোথায় সকলসুন্দর সহজসুন্দর গৌরহরি!

'আর কদ্দূর বাড়ি?' জিগগেস করল নিমাই।

'এই তো এসে পড়েছি। আর দেরি নেই।'

কিন্তু, ও কি, পথের ঠিক ঠাহর পাচ্ছে না চোর। না, এই পথ—এই তো, এই দিক দিয়েই তো। চোর দ্রুত করল পদক্ষেপ।

'এই যে বাবা, বাড়ি এলাম।' চোর কাঁধ থেকে নামাল নিমাইকে।

এ কি, এ যে শচীর ঘরের দরজায়ই নিমাইকে নামিয়ে দিয়েছে ওরে, তোকে কে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, কে আবার ফিরিয়ে দিয়ে গেল ? ব্যাকুল বাহুতে শিশুকে জড়িয়ে ধরলেন জগন্নাথ।

'বা, এই যে একটা লোক কাঁধে করে নিয়ে গিয়েছিল আমাকে, কত দূর নিয়ে গিয়েছিল, কত পথ হেঁটে-হেঁটে, ঘুরে-ফিরে আবার এইখানেই রেখে গেল দেখছি।'

কোথায় সেই চোর ?

বৈষ্ণবী মায়ায় সে কি পথ হারিয়েছে, না কি বৈষ্ণবী কৃপায় সে পথ পেল ?

নারায়ণ যার কাঁধে এসে উঠলেন তার আর পথ পেতেই বা বাকি কি, ঘর পেতেই বা দেরি কোথায় !

৫

'নিমাই !' ডাকলেন জগন্নাথ। বললেন, 'বাবা, ঘরের ভিতর থেকে আমার পুঁথিখানা নিয়ে এস তো।'

কোন পুঁথি কে জানে, শিশু নিমাই চলল ঘরের দিকে।

এ কি, নিমাইয়ের পায়ে নূপুর এল কোত্থেকে ! কই, না, শচী ত্রস্ত-ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, তার নূপুর নেই তো ! তবে কেন বাজছে এই রুনুঝুনু ! জগন্নাথও চঞ্চল চোখে তাকাতে লাগলেন চারদিক।

দেখ, দেখ, যেমন পা পড়ছে তেমনি শব্দ ঝরছে তালে তালে। ঘর তো ফাঁকা। তবে নিমাই ছাড়া কার এই ঝঙ্কার!

বাপের হাতে পুঁথি দিয়েই নিমাই চলে গেল খেলতে।

দ্রুত পায়ে ঘরে ঢুকলেন জগন্নাথ। শচীও অনুগমন করলেন। এ কি অদ্ভুত দৃশ্য! ঘরের মেঝেতে তিন চিহ্ন ফুটে আছে। ধ্বজ, বজ্র আর অঙ্কুশ। বিষ্ণুর তিন পদচিহ্ন। এ কে রেখে গেল!

'ঘরে দামোদর শিলা।' শচীকে মনে করিয়ে দিলেন জগন্নাথ: 'এ তারই কাণ্ড।'

তাই হবে হয়তো। সরল বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রইল শচী।

'পঞ্চগব্যে স্নান করাও শিলাকে। নিজে গিয়ে পরমান্ন রান্না করো।' হুকুম করলেন জগন্নাথ।

স্নানাহারের খুব আয়োজন হয়েছে দামোদরের। কী সমাদর শিলার! নিমাই হাসল মনে-মনে।

আমাকে কে খাওয়ায়! সকালের রোদ প্রায় দুপুরে এসে ঠেকল, আমাকে কে স্নান করায়! আমি খেলুড়েদের সঙ্গে ধূলোখেলা নিয়েই মেতে থাকি।

শচী তাকে ডাকছেন আকুল হয়ে, 'ওরে নাইবি-খাবি আয়', নিমাই গ্রাহ্যও করেনা।

'ওরে রোদে তোর মুখ যে শুকিয়ে গেল, সোনার অঙ্গ কালি হয়ে গেল—' শচী আবার ডুকরে উঠলেন: 'বাড়ি আয়। তোর খাবার বেলা যে বয়ে গেল—'

কে কাকে ডাকে।

'তুই কেমনতরো ছেলে, তোর খিদে-তেষ্টা পায়না?'

নিমাই মনে মনে হাসে, তোমাদের তো দামোদরই আছে, তাকে খাওয়াও গে।

ছেলেকে ধরবার জন্যে হাত বাড়ায় শচী। নিমাই ছুটদেয়। সাধ্য কি তুমি আমাকে ধরো। আমি তো ঘরবন্দী পাথরের টুকরো নই।

তখন শচী কাঁদতে বসে।

চোখের জল দেখলেই থাকতে পারেনা নিমাই। গুটি-গুটি এসে চুপি-চুপি ধরা দেয়।

এক তৈর্থিক ব্রাহ্মণ এসেছে জগন্নাথের বাড়িতে। গলায় ঝুলছে বালগোপালের মূর্তি, মুখে নিরবধি কৃষ্ণ-কৃষ্ণ নাম।

নামই কলিমলমথন। নামই চৈতন্যরসবিগ্রহ। নামই ঘনীভূত ব্রহ্ম।

নামকে যে শুধু শব্দ মনে করে সে মূঢ়। যার প্রতিমায় শিলাবুদ্ধি, গুরুতে মর্তবুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, চরণামৃতে জলবুদ্ধি ও নামমন্ত্রে শব্দবুদ্ধি, সেই নিরয়গামী।

কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলো।

কৃষ ধাতুর উপর ণ প্রত্যয় করে কৃষ্ণ। কৃষি সত্তাবাচক, ণ আনন্দবাচক। যে নিত্যপুরুষ নিত্য আনন্দের উৎস, সেই কৃষ্ণ। কৃষ্ণই সুখস্বামী।

কৃষ ধাতুর অর্থ দুটো। কর্ষণ করা আর আকর্ষণ করা। যে জীবহৃদয় কর্ষণ করে ভক্তির বীজ বোনে, সেই কৃষ্ণ। কিংবা যে জীবহৃদয় আকর্ষণ করে ভক্তিপথে নিয়ে যায়, সে-ও কৃষ্ণ।

কৃষি সত্তাবাচক, ণ নির্বাণবাচক। যে নিত্যপুরুষ সমস্ত কামনা-ক্লেশের নিবারক, সেই কৃষ্ণ।

কৃষির আরেক অর্থ উৎকর্ষ। ণ-এর আরেক অর্থ সদ্ভক্তি। উৎকৃষ্ট সদ্ভক্তিদাতাই কৃষ্ণ।

যে পাপের নিবৃত্তি করে ও শত্রুর নিধন করে, সে-ও কৃষ্ণ।

এই নাম-জপের বিধি কি ? এর কোনো বিধি নেই। দেশকালের অপেক্ষা নেই, অধিকারী-অনধিকারীর প্রশ্ন নেই, জাতিধর্মের বিচার নেই। শুচি-অশুচি উচ্ছিষ্ট-অনুচ্ছিষ্ট নেই। নামই নির্নিষেধ। নামই কামিতকামদ।

গোবিন্দরসে দুই চোখ ঢুলু-ঢুলু, ব্রাহ্মণকে দেখে জগন্নাথ কৃত-

কৃতার্থ। কি ভাবে তাঁকে সসম্ভ্রম সেবা করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। নিজের হাতে পা ধুয়ে দিলেন। জিগগেস করলেন, 'কোথায় আপনার দেশ ?'

'আমি দেশান্তরী।' বললে ব্রাহ্মণ। 'আমি উদাসীন। চিত্তের বিক্ষেপে আমি দেশে-দেশে ঘুরে বেড়াই।'

আতিথেয়তায় উদ্বেল হলেন জগন্নাথ। স্বহস্তে পাক করে ব্রাহ্মণ, তার রন্ধনের সমস্ত যোগাড় করে দিলেন। বিস্তৃত আয়োজন। ফলমূল খেয়ে থাকে, আজ কৃষ্ণের কৃপায় পক্ক অন্নের উপচার।

রান্না শেষ করে ব্রাহ্মণ খেতে বসেছে নির্জনে। খাবার আগে গোপালকে অন্ন নিবেদন করছে। মনে মনে বলছে, গোপাল, খাবে এস।

কোত্থেকে ছুটে এসেছে নিমাই। বলা-কওয়া নেই, অন্নের স্তূপের মধ্যে হাত ডুবিয়ে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, ক্ষুধার্ত মুখে তুলে নিয়েছে এক গ্রাস।

'হায় হায়—গেল, গেল—' চিৎকার করে উঠল ব্রাহ্মণ।

জগন্নাথ ছুটে এলেন। এ কি কাণ্ড! সর্ব অঙ্গে ধূলোবালি, প্রায় দিগম্বর, নিমাই দিব্যি ব্রাহ্মণের থালা থেকে ভাত তুলে খাচ্ছে। শুধু খাচ্ছে না, হাসছে মৃদু মৃদু।

'এ চঞ্চল শিশু ছুঁয়ে-ছেনে সব নষ্ট করে দিল—' ব্রাহ্মণ উঠে দাঁড়াল আসন থেকে।

জগন্নাথ নিমাইকে মারতে ছুটল। এ কি কদর্যতা!

ব্রাহ্মণই নিবৃত্ত করল জগন্নাথকে। বললে, 'ও অজ্ঞান শিশু, ওর কি ভালো-মন্দ শুচি-অশুচি বোধ আছে? ওকে মেরে লাভ কি? ও যখন এত চঞ্চল, বাড়ির লোকেদেরই উচিত ছিল ওকে সাবধানে রাখা।'

জগন্নাথ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন।

'আপনি কেন দুঃখ করছেন? সবই গোপালের ইচ্ছা।' ব্রাহ্মণ

বললে, 'ঘরে যদি ফলমূল কিছু থাকে তাই দিন। তাই-ই তো আমার অভ্যেস, তাই খেয়েই আজকের দিন কাটুক।'

'না, না, কিছুতেই না।' প্রবল প্রতিবাদ করলেন জগন্নাথ, 'আমি আবার সব যোগাড় করে দিচ্ছি, আপনি আবার রান্না করুন।'

রান্নার আবার যোগাড় হল।

যতক্ষণ না ব্রাহ্মণের রান্না আর খাওয়া শেষ হয় সামলাও দুরন্তকে। বেঁধে রাখতে না পারো, পাশের বাড়িতে নিয়ে যাও। ভিড়িয়ে দাও খেলুড়েদের সঙ্গে।

ছেলেকে কোলে নিয়ে চলেছেন শচী। পাড়ার মেয়েরা বলছে, 'ছি ছি, এ কি করলি ? অতিথি ব্রাহ্মণের ভাত ছুঁলি ?'

'আমি কি জানি !' ডাগর দীঘল চোখে তাকিয়ে নিমাই বললে, 'আমাকে ডাকল কেন ?'

এ আবার কেমন কথা ! পরস্পর চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল মেয়েরা।

'কোথাকার না কোথাকার ব্রাহ্মণ, কোন কুল কে জানে, তুই তার ভাত খেলি ?' আর কেউ অন্যভাবে নিতে চাইল। 'মাঝখান থেকে তোরই জাত গেল।'

হাসি-হাসি মুখে নিমাই বললে, 'আমি তো গোয়ালা। বামুনের ভাত খেলে কি গোয়ালার জাত যায় ?'

এ আবার কী অসম্ভব কথা! শচীর মুখের দিকে তাকাল মেয়েরা। ও যে ব্রাহ্মণের সন্তান এটুকুও ওকে শেখাওনি ?

বেলা ঢলে পড়েছে, দ্বিতীয়বারের রান্না শেষ করল ব্রাহ্মণ।

শুদ্ধমনে নিরিবিলিতে আহারে বসেছে আরবার। ধ্যানে বালগোপালকে ভাবছে। বলছে, গোপাল, অগ্রভাগ গ্রহণ করো।

চিত্তের ঈশ্বর গৌরচন্দ্র শুনতে পেয়েছে। ক্ষিপ্র পায়ে ছুটে চলে এসেছে ব্রাহ্মণের কাছে। তার মুদ্রিত নয়ন খোলবার আগেই নিমাই

থালা থেকে তুলে নিয়েছে অন্নমুষ্টি। শুধু তুলে নেয়নি, পুরে দিয়েছে মুখের মধ্যে।

'হায় হায়, আবার এসেছে, আবার ছুঁয়েছে—' আর্তনাদ করে উঠল ব্রাহ্মণ।

জগন্নাথ লাঠি নিয়ে তেড়ে এলেন। নিমাই ছুট দিল। শাসন-বারণ মানে না, এ কি দুর্দান্ত অনাচার! ওকে আজ মারবই মারব। ক্রুদ্ধ পায়ে জগন্নাথ পিছু নিলেন।

পাড়ার লোকেরা ধরে ফেলল জগন্নাথকে।

'দু-দুবার অতিথির ভাত ও নষ্ট করল। ছাড়ো, ওকে আমি রূঢ় হাতে শিক্ষা দেব। কিছুতেই ছাড়ব না—'

'অবোধ শিশুকে মেরে তোমার সাধুত্বের কী বাহাদুরি হবে!' সকলে নিবৃত্ত করল জগন্নাথকে: 'আর মারলেই বা শিখবে কে? শিখলেই বা লাভ কি? বামুনের নষ্ট অন্ন তো আর শুদ্ধ হবে না।'

ব্রাহ্মণও সুর মেলাল। বললে, 'মিশ্র, যেদিন যা হবার তাই হবে। কৃষ্ণ আমার জন্যে আজ ভাত মাপাননি। তা না হলে দু-দুবার ফেলা যাবে? তুমি যা পারো ফলটল আমাকে কিছু দাও। না যদি পারো, থাকব উপবাসে। উপবাসেও গোবিন্দ।'

হঠাৎ কে এক কিশোর সামনে এসে দাঁড়াল। সর্ব অঙ্গে নিরুপম লাবণ্য, স্কন্ধে যজ্ঞসূত্র, মূর্তিমন্ত ব্রহ্মতেজ, কে এই বররুচি! মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল ব্রাহ্মণ।

'এ কে! কার ছেলে?' জিগগেস না করে পারল না।

'বা, এ তো মিশ্রেরই ছেলে। বড় ছেলে।' বললে কে-একজন। 'দুরন্তের বড় ভাই প্রশান্ত।'

দেখলেই যেন নয়ন-মন আনন্দে ভরে ওঠে। ব্রাহ্মণ বললে, 'যাদের এমন পুত্র, ধন্য সেই বাবা-মা।'

সব শুনল বিশ্বরূপ। বললে, 'আপনি আমাদের অতিথি, এ

আমাদের মহৎ ভাগ্য। কিন্তু আপনি উপবাস করে থাকবেন এ দুঃসহ—তাতে আমাদের ঘোর অমঙ্গল।'

ব্রাহ্মণ বললে, 'আমি বনবাসী, ফলমূল খেয়েই দিন কাটে। কদাচিৎ অন্ন জোটান কৃষ্ণ। দেখলে তো তিনি আজ জুটিয়েও জোটালেন না। দু-দুবার রাঁধলুম, দু-দুবার পণ্ড হল। সবই কৃষ্ণেচ্ছা। তোমার ঘরে যদি কোটি ভক্ষদ্রব্যও থাকে, যদি কৃষ্ণ-আজ্ঞা না হয়, সাধ্য কি তুমি তা সম্ভোগ করো। তোমাকে যে দেখলুম, এই সন্তোষই আমার ভোজন।'

'না, না, কিছুতে নয়, আপনাকে আবার রাঁধতে হবে।' বিশ্বরূপ ব্রাহ্মণের পায়ে পড়ল: 'আপনি করুণাসিন্ধু, পরদুঃখে আপনি কাতর, পরসুখই আপনার পরম সুখ। সুতরাং আমাদের সন্তোষের জন্যে আপনি আবার রান্না করুন। আমি নিজের হাতে আবার সব যোগাড় করে দিচ্ছি।'

'কিন্তু,' ভয়ে-ভয়ে তাকাল ব্রাহ্মণ: 'কিন্তু ঐ দুরন্ত শিশুর কী হবে?'

'ওকে আমি সামলাব। ও আমার বাধ্য, অনুগত, আমি না বললে কিছুতেই আসবে না এদিকে। তা ছাড়া,' বিশ্বরূপ বললে নিশ্চিন্ত আশ্বাসে, 'এখন সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে, খেলাধুলো ছেড়ে এখন বাড়ি ফিরেছে নিমাই, এবার ঘুমিয়ে পড়বে বিভোর হয়ে—'

'ঘুমিয়ে পড়লে নিমাই একতাল কাদা।' বললেন শচী। 'তখন কে বলবে নিমাই আমার চঞ্চলের শিরোমণি।'

রাঁধতে রাঁধতে রাত হয়ে গেল ব্রাহ্মণের।

যা বলেছে বিশ্বরূপ, নিমাই মার পাশটিতে ঘুমিয়ে পড়েছে। নিদ্রার সরোবরে ফুটে আছে একটি শান্তির শ্বেতপদ্ম।

যাক, নিশ্চিন্ত হয়েছে সবাই।

তবু বলা যায়না, অধিকন্তু ন দোষায়, আরো নেওয়া যাক সতর্কতা। দুই ঘরের মাঝ-দুয়ারে বসলেন জগন্নাথ। বললেন, 'বার-

দুয়ার বেঁধে রাখো দড়ি দিয়ে। কোনো ফাঁক দিয়েই যেন বেরুতে না পারে।'

শচী বললে, 'আমিও আমার হাত দিয়ে চেপে ধরে আছি।'

চার দিক থেকে সবাই আবৃত করে আছে নিমাইকে। অন্নব্যঞ্জনের থালা নিয়ে ব্রাহ্মণ বসেছে আহারে। চোখ বুজে গোপালকে ধ্যান করছে। নিবেদন করেছে কৃপালব্ধ অন্নের অমৃত।

আমার কী আছে তোমাকে দিতে পারি? তুমি যে আমাকে অকৃপণ কৃপা করছ আমার শুধু আছে এই অনুভব। এই অনুভবটুকুই তুমি নাও।

এই অনুভবটুকুও তোমার কৃপা।

তোমার কৃপাতেই আমার ভক্তি। ভক্তি হয় কিসে? ভক্তিতে। তোমার কৃপাতে। তোমার কৃপাই সুখসারসর্বস্বা। সারঙ্গরঙ্গদা।

ধীরে-ধীরে সর্বত্র নিদ্রার আবেশ নামল। অচেষ্ট ঘুমে আচ্ছন্ন হল সকলে।

নিমাই উঠে এসে দাঁড়াল ব্রাহ্মণের সামনে। চকিতে থাবা বসাল ভাতের থালায়।

'হায় হায় হায়—' বিপ্র আবার চিৎকার করে উঠল।

কিন্তু কে শোনে! সবাই ঘুমে অচেতন।

'হায় হায় করছ কেন?' নিমাই ধমক দিয়ে উঠল: 'কেন তবে ডাকছ আমাকে? কেন তবে ভাত-ডাল নিবেদন করছ?'

'তোমাকে ডাকছি? তোমাকে নিবেদন করছি?' মূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল ব্রাহ্মণ।

'তবে আর কাকে? আমাকে ভক্তিভরে ডাকছ বলেই তো আমি থাকতে পারছি না। বারে বারে উঠে আসছি, ছুটে আসছি বারে বারে।

'কে তুমি?'

'কে আমি?'

নিমাই আট হাত মেলে দাঁড়াল। ব্রাহ্মণ দেখল, এ কী বিভূতি! এক হাতে ননী, আরেক হাতে তাই তুলে তুলে খাচ্ছে নিমাই। আর দুই হাতে বাঁশি বাজাচ্ছে। আর বাকি চার হাতে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম। শিরে শিখি-পুচ্ছ, চরণে রত্ননূপুর। বুকে কৌস্তুভ, গলায় বৈজয়ন্তী। আর এ কী! পিছনে কদমগাছ, গোপ-গোপী গাভী আর নীলাঞ্জনা যমুনা।

আনন্দে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল ব্রাহ্মণ।

গৌরসুন্দর ব্রাহ্মণের গায়ে হাত রাখল। ব্রাহ্মণ চেতনা পেয়ে কাঁদতে লাগল পা ধরে। নিমাই বললে, 'যা আজ দেখলে তা কাউকে বোলো না কিন্তু। এ আখ্যান শুধু ভক্ত আর ভগবানের। তোমার প্রেমভক্তিই তোমাকে এ দর্শনের অধিকারী করেছে।'

এক মুষ্টি অন্ন মুখে পুরল নিমাই। পরে চলে গেল ধীরে-ধীরে। শুল এসে মায়ের পাশটিতে।

সবাই জেগে উঠে দেখল ব্রাহ্মণ সুতৃপ্তিতে আহার করছে। নয়নে জল, তাই আস্বাদে মধু।

'মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।' বলছেন শ্রীকৃষ্ণ। 'শুধু আমাতে মন অর্পণ করো। আমার ভক্ত হও, যজন করো আমার, আর নমস্কার করো আমাকে। প্রতিজ্ঞা করে বলছি, শুধু তাতেই তুমি আমাকে পাবে। তুমি যে আমার স্বভাবপ্রিয়।'

শুধু ভক্তিতেই হবে। কর্ম যোগ জ্ঞান কিছুরই ভক্তি অপেক্ষা রাখে না। সে স্বতন্ত্র, স্বসম্পূর্ণ। বৈরাগ্যে যা হবে, জ্ঞানে ধ্যানে যা হবে, যা হবে তীর্থে ব্রতে দানে পুণ্যে, তা একমাত্র ভক্তিতেই ফলনীয়! একমাত্র ভক্তিতেই ঈশ্বর বশংবদ। ভক্তির সাধনে কিছুই লাগে না, না জ্ঞান না বৈরাগ্য, না অন্যতর অনুষঙ্গ। 'জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তির কভু নহে অঙ্গ।' ভক্তি অন্যনিরপেক্ষ।

বেদে পারঙ্গত, যে বা সর্বশাস্ত্রার্থবিদ, সেও যদি সর্বেশ্বরে ভক্তিযুক্ত না হয়, সে পুরুষাধম ছাড়া কিছু নয়।

ভক্তিতে জাতিকুলের বিচার নেই। ভক্তি সার্বত্রিক। হোক সে কিরাত, হূন বা অন্ধ্র, পুলিন্দ বা পুক্কস, আভীর বা যবন, সেও যদি ভক্তিকে আশ্রয় করে বা ভক্তকে আশ্রয় করে, সেও সংশুদ্ধ হয়ে ওঠে। শুধু মানুষ কেন, কীট পতঙ্গ পশুও হরিতে সংন্যস্তকর্মা হলে ঊর্ধ্বগতি লাভ করে।

সাধু ভজন করবে এ আর বেশি কথা কি! সুদুরাচারও যদি অনন্যভাক হয়ে আমাকে ভজনা করে, বলছেন শ্রীকৃষ্ণ, তাকেও সাধু বলে জানবে। যেহেতু সে সম্যকব্যবসিত, আমাকেই বুঝেছে শ্রেষ্ঠ নিশ্চয়রূপে।

আরো কত সুবিধে, ভক্তিতে স্থান-অস্থান নেই। 'ন দেশো নিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা।' যেখানে খুশি হাটে ঘাটে মাঠে ভবনে শ্মশানে ভজন করলেই হল। আর যে কোনো অবস্থায়। প্রহ্লাদ করেছিল মাতৃগর্ভে, ধ্রুব শৈশবে, অম্বরীষ যৌবনে, যযাতি বার্ধক্যে, অজামিল মৃত্যুকালে, চিত্রকেতু মরণান্তে। নরকে বসেও যদি হরিনাম করা যায়, নরক স্বর্গ হয়ে ওঠে।

শ্রীনামকীর্তনই শ্রীকৃষ্ণভজন।

৬

ক্ষণে-ক্ষণে নালিশ আসে জগন্নাথের কাছে। কবে হাতেখড়ি হয়েছে, নিমাইয়ের তবু পড়ায় একবিন্দু মন নেই। এখন তার খেলা হয়েছে গঙ্গায় সাঁতার কাটায়। তার মানে অন্যরকম দুরন্তপনায়।

পা দিয়ে অন্য স্নানার্থীদের গা ছুঁয়ে দিচ্ছে। কখনো বা ছিটিয়ে দিচ্ছে কুলকুচো করে। যে একবার স্নান করে উঠেছে তাকে দ্বিতীয় বার স্নান করাচ্ছে। দ্বিতীয় বারকে তৃতীয় বার। সাধ্য নেই তুমি

তাকে ধরো। কখন ধাবন্ত মাছের মত পিছলে যাচ্ছে কবল থেকে বোঝাও যাচ্ছে না, তাই সবাই নালিশ করছে মিশ্রের কাছে।

'তোমার ছেলের জ্বালায় গঙ্গাস্নান ছেড়ে দিতে হবে দেখছি।'

'কেন, কী করেছে?' উদ্বিগ্নস্বরে প্রশ্ন করেন জগন্নাথ।

'জলে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যা করছি, ডুব দিয়ে এসে আবার পা টেনে ধরল—'

'ধ্যান করছি ঘাটে,' আরেকজন বলল, 'জল ছিটিয়ে দিল আমার গায়ে। বললে, চোখ বুজে কাকে ধ্যান করছ? চোখ খুলে আমাকে দেখনা। কলিযুগে আমিই প্রত্যক্ষ নারায়ণ।'

আরেকজন বললে, 'ঘাটে বিষ্ণুপূজার ফুল-দুর্বো নৈবেদ্য-চন্দন সাজিয়ে স্নান করতে নেমেছি, তোমার ছেলে কোত্থেকে এসে আসনে বসে নৈবেদ্য খেতে সুরু করে দিল। ধর-ধর বলে যেই তাড়া দিতে গেলুম অমনি পালিয়ে গেল একছুটে। যেতে-যেতে বললে, যার জন্যে এনেছিলে সেই খেয়ে গেল।'

এ কী উৎপীড়ন!

আরো বিচিত্র নালিশ নিমাইয়ের বিরুদ্ধে। কেউ বলছে, আমার উত্তরীয় নিয়ে পালিয়ে গেছে। কেউ বলছে, আমার শিবলিঙ্গ। কেউ বা আমার গীতা। আমার পিঠের উপর হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে কাঁধে চড়ে বসে। এ নালিশ আরেকজনের। ধরতে যাচ্ছি, লাফিয়ে পড়ছে জলে, বলছে, আমি রাম আর রাম যার কাঁধে চড়েছিল তুমি সেই কপিবর। স্নান করে উঠেছি, বলছে আরেকজন, গায়ে বালি ছুঁড়ে মারছে, কখনো বা আমাদের তৈরি পূজার আসনে বসে নিজেই নিজেকে পূজা করছে। তুমি আমাদের বন্ধু, তুমি যদি এ-সবের প্রতিকার না করো আমরা যাই কোথা?

'তারপর নদীতে একবার নামলে আর উঠতেই চায় না। এতক্ষণ জলে ঝাঁপাঝাঁপি করলে অসুখে পড়বে যে।'

'আর দেখ দেখি আমার এই ছেলে ত্বটো। একরত্তি ছেলে, এর

কানের মধ্যে কেবলি জল ঢুকিয়ে দিচ্ছে, আর এটাকে দুর্বল পেয়ে কেবলি চোবাচ্ছে জলের নিচে। তুমিই বলো কত আর সওয়া যায় অনাচার ?'

শুধু পুরুষ নয়, মেয়ের দলও শচীর দরবারে নালিশ নিয়ে আসে।

'তোমার গুণধর ছেলে আমাদের কাপড় চুরি করে নিচ্ছে। নাইতে নেমেছি, ঘাটের পৈঠায় শুকনো শাড়ি, উঠে এসে দেখি শাড়ি নেই। নিমাই পালাচ্ছে বগলে করে।'

'যদি কিছু বলতে যাই, মন্দ বলে, ঝগড়া করে, বালি ছোঁড়ে, জল ছিটোয়—'

'আমার চুলের মধ্যে ওকড়ার ফল গুঁজে দেয়।'

'আর, কী সাংঘাতিক তোমার ছেলে', আরেক মেয়ে গর্জন করে ওঠে, 'আমাকে বলে, হ্যাঁ লা, আমাকে বিয়ে করবি ?'

কোথায়, কোথায় নিমাই ? লাঠি হাতে নিয়ে তর্জে ওঠেন জগন্নাথ। আর কোথায়! তার যা নিত্য কর্ম, গঙ্গার ঘাটে গিয়ে শুরু করেছে উৎপাত।

দাঁড়াও, ওরই একদিন কি আমারই একদিন।

যে সব মেয়ে নালিশ করতে এসেছিল তারাই আগে ছুটে গেল ঘাটের দিকে। নিমাইকে বললে, 'নিমাই, শিগগির পালা। তোর বাবা আসছেন।'

'আসছেন ?' ভয় পেল নিমাই।

'মোটা একগাছ লাঠি নিয়ে আসছেন। তোকে আজ আর আস্ত রাখবেন না। পালা যদি বাঁচতে চাস—'

জল থেকে উঠেই নিমাই ছুট দিল। যাবার আগে বললে, 'যদি বাবা এসে জিগেগেস করেন, নিমাই কোথায়, বলিস, আসেনি এদিকে।'

হন্তদন্ত হয়ে এলেন জগন্নাথ। জলে ও ঘাটে অনেক বালক-বালিকার ভিড়, অনেক স্নানার্থীর, কিন্তু, কই, নিমাইকে দেখতে পাচ্ছিনা তো!

'নিমাই কোথায় ?' গম্ভীরঘোষে হুঙ্কার করলেন জগন্নাথ।

মেয়ের দল বললে একবাক্যে, 'কই, নিমাই তো এখনো স্নানে আসেনি !'

ছেলের দলের বললে কেউ কেউ, 'দেখলাম পড়ে শুনে বই খাতা নিয়ে বাড়ি যাচ্ছে। জিগগেস করলাম, কি রে, নাইতে যাবিনে ? বললে, তোরা যা, আমি আসছি এখুনি।'

'সেই থেকে ওর জন্যে অপেক্ষা করে আছি। কই, বাড়ি যায়নি এখনো ?'

লাঠিহাতে ক্রুদ্ধ চোখে জগন্নাথ তাকাতে লাগলেন চার দিক।

বয়স্কদের কেউ-কেউ বললে, 'জলে ছিল যেন দেখেছিলাম, পালাল কোথায় ?'

আবার কেউ বললে, 'ভুল দেখেছ। নিমাই এখনো আসেনি। কি হে,' পার্শ্ববর্তীকে প্রশ্ন করল স্নানার্থী, 'দেখেছ নিমাইকে ?'

'না, আসেনি এখনো। এলে ঘাটে-গাঙে কাউকে তিষ্ঠোতে দিত নাকি ?'

ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে চললেন জগন্নাথ।

পাঠশালার পথ দিয়ে নিমাই বাড়ি ফিরছে। পায়ে-পায়ে শুকনো ধুলো, হাতে পুঁথি, আঙুলে-মুখে কালির লিখন।

'মা গো, তেল দাও, স্নান করে আসি।' মায়ের কাছে হাত পাতল নিমাই।

'এ কি, তুই যাসনি স্নান করতে ?' শচী অবাক হয়ে রইলেন।

'কই আর গেলাম ! স্নান করতে গেলে মাথার চুল কি শুকনো থাকে, না কি পরনের কাপড় বদলে যায় না ?'

সত্যিই তো, ছেলেটার গায়ে একটুকু জলস্পর্শ নেই। শুকনো খট-খট করছে। আলগা ধুলো উড়ছে গা থেকে।

লাঠিহাতে ফিরে এলেন জগন্নাথ। তেড়ে গেলেন নিমাইয়ের

দিকে। বললেন, 'স্নান করতে গিয়ে এসব দুর্ব্যবহার কেন?' অপরাধের দীর্ঘ তালিকা মেলে ধরলেন।

'স্নান করতে গিয়ে? কোথায় আজ স্নান করতে গেছি?' নিমাই গম্ভীর মুখে বললে, 'আমি যদি স্নান করতে না-ও যাই তবু আমার নামে বানিয়ে বানিয়ে বলে যার যা খুশি। আর কেউ হয়তো কিছু করে আমার নামে চালিয়ে দেয়। আমাকে কেউ দেখতে পারে না। আমি সকলের চক্ষুশূল।' অভিমানে মুখখানি থমথমে করে বাপের গা ঘেঁসে দাঁড়াল বিশ্বম্ভর।

লাঠি ফেলে দিয়ে জগন্নাথ ছেলেকে কোলে তুলে নিলেন। সত্যিই মিছিমিছি সকলে লাগায়, কেউ দুচোখে দেখতে পায়না নীলমণিকে। নইলে, সবাই বলছে কিনা, নিমাই জলের মধ্যে হুটোপুটি করছে, অথচ চেয়ে দেখ, গায়ে তার এতটুকুও স্নানচিহ্ন নেই। শুকনো পুঁথি। শুকনো বস্ত্র, শুকনো চুল। যত সব বানানো কথা।

মায়ের কাছ থেকে তেল ও বাপের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে নিমাই আবার চলে এল গঙ্গায়। শুরু করল ঝাঁপাঝাঁপি। তাকে ফিরে পেয়ে তার সঙ্গীরা খুশি। যাদের বসন চুরি যায় তারাও। আর বয়স্কের দল ভাবে, নিমাইয়ের দুষ্টুমি না থাকলে স্নান করে আনন্দ কই? ওকে কাছে পেলে পূজা-ভঙ্গও যা পূজা-সাঙ্গও তাই।

কাঁদতে শুরু করেছে নিমাই।

কী চাই, কেন কাঁদছিস, কী হয়েছে, সবাই অস্থির হয়ে উঠল। নিমাইয়ের কান্নাও অসাধারণ। শুরু হলে থামতে চায়না আর এত জল পড়ে যে মনে হয় জল-স্থল যেন ভেসে যাবে, মিশে যাবে এক হয়ে।

দু কানে কত হরিনাম করছে শচী, তবু নিমাইয়ের নিবৃত্তি নেই।

কাঁদতে-কাঁদতে মূর্চ্ছা যাবে বুঝি। শচী চোখে আঁধার দেখছে। বললে, 'বাবা, বল, তোর কী চাই? যা চাস তাই দেব।'

'তাহলে আমাকে একাদশীর নৈবেদ্য এনে দাও।' নিমাই বললে স্থির হয়ে।

'সেই নৈবেদ্য পাব কোথায় ?'

'পাশের বাড়িতে জগদীশ পণ্ডিত আর হিরণ্য ভাগবত থাকেন, তাঁরা আজ একাদশীর উপোস করেছে, বিষ্ণুর জন্যে যোগাড় করেছে অনেক নৈবেদ্য।' নিমাই বললে সরল মুখে, 'সেই নৈবেদ্য আমাকে এনে দাও। সে নৈবেদ্য পেলে আমি আর কাঁদব না।'

এ কী অসম্ভব কথা! শচী জিভ কেটে মাথায় হাত দিয়ে বললে, 'অমন কথা বলতে নেই। ও ঠাকুরের দ্রব্য, ও কি চাইতে আছে ? বল তোর কোন ফলে সন্দেশে অভিরুচি, আমি বাজার থেকে এনে দিচ্ছি।'

নিমাই আবার কান্নার রোল তুলল।

জগন্নাথ তখন গেলেন পাশের বাড়ি। ব্রাহ্মণ দুজনকে বললেন তাঁর খ্যাপা ছেলের আজগুবি কথা।

পরমবৈষ্ণব হিরণ্য আর জগদীশ তো স্তম্ভিত! আজ যে একাদশী তা ওই শিশু জানলে কি করে ? এ কি, সমস্ত শরীরে অলোকস্পর্শের শিহর জাগছে কেন ? সন্দেহ কি, ওই শিশুতেই গোপালের অধিষ্ঠান।

নৈবেদ্যের থালা নিয়ে নিমাইয়ের সামনে ধরল হিরণ্য, ধরল জগদীশ। বললে সমস্বরে 'তুমিই গোপাল। তুমি খেলেই গোপালের খাওয়া।'

নিমাই থালা থেকে কতক তুলে নিয়ে খেল, কতক বা গায়ে মাখল, কতক বা মাটিতে ফেলল, কতক বা বিলিয়ে দিল আশে-পাশে।

আর কান্না নেই, ব্যাধি নেই, অভাব-আময় নেই। শুধু অমিয় —অখণ্ড অমিয়।

৭

জিহ্বা-মরু-প্রাঙ্গণে কৃষ্ণলীলাকথাই সুধার স্বরধুনী। কর্ণানন্দি-কলধ্বনি। রসোল্লাসিতগামিনী দ্রবশ্রবা।

'নন্দসুত বলি যারে ভাগবতে গাই।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্যগোসাঞি ॥'

কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্। যিনি স্বয়ংসিদ্ধ ভগবান, তিনি আবার নন্দের অপেক্ষা রাখেন কেন, কেন আবার তার পুত্র হতে যান? রসের দুই মূর্তি, আস্বাদ্য আর আস্বাদক। যেখানে কৃষ্ণ পূর্ণ, অন্য-নিরপেক্ষ, সেখানে তিনি আস্বাদ্য। কিন্তু যেখানে তিনি লীলাপুরুষ সেখানে তিনি আস্বাদক। বাৎসল্যরস আস্বাদন করবার জন্যেই দরকার তাঁর বাপ-মা, নন্দ আর যশোদা।

'মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।
অতি হীনজ্ঞানে করে লালন-পালন ॥'

কৃষ্ণে যশোদার ঈশ্বরবুদ্ধি নেই। শুদ্ধ সন্তানবুদ্ধি। কৃষ্ণ পরতত্ত্ব, কৃষ্ণ বিভুবস্তু—এ সব কথা বললেও মানতে প্রস্তুত নয় যশোদা। কৃষ্ণ তার কাছে অপোগণ্ড শিশু ছাড়া কিছু নয়, নিতান্ত দুর্বল, নিতান্ত নিরুপায়। গায়ে মশামাছি বসলেও সে তাড়াতে জানে না, খিদে পেলেও বলতে পারে না বুঝিয়ে। সব সময়ে মায়ের উপর নির্ভর। মা খাইয়ে দিলে খাওয়া, পরিয়ে দিলে পরা, ঘুম পাড়িয়ে দিলে ঘুমোনো। তার পরে যা দুর্বৃত্ত, লাঠি দিয়ে মারতে বা দড়ি দিয়ে বাঁধতেও কসুর করেনা যশোদা। মমত্ববোধে এত তাকে হেয় ভাবে। আর কে আছে দুরন্তকে শাসন-শোধন করে! মা ছাড়া তার গতি কই? কে আর করে তার মঙ্গলচিন্তা?

বিদ্যায় বুদ্ধিতে শক্তিতে সম্পদে তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করছে, যশোদার সেই নির্মল বাৎসল্যে বশীভূত শ্রীকৃষ্ণ। মেনে নিচ্ছে তার সমস্ত বন্ধন-পীড়ন তাড়ন-তিরস্কার। তার শীর্ণ, স্বল্প অঞ্চলের অধীনতা।

দেবকীর স্নেহে ন্যূনতা ছিল। ছিল ঐশ্বর্যবুদ্ধির ভেজাল। কৃষ্ণকে শুদ্ধ সন্তান মনে করেনি, মনে করেছিল ভগবান। কংসের কারাগারে আবির্ভূত হবার পর স্তব করেছিল। কংসবধের পর কৃষ্ণ প্রণাম করতে গেলে কুণ্ঠিত হয়েছিল, ভগবানের প্রণাম নিই কি করে? কৃষ্ণের প্রতি দেবকীর হীনজ্ঞান ছিল না। ছিল ঈশ্বরজ্ঞান। তাই সে বদ্ধাঞ্জলি হয়ে থাকলো। বদ্ধাঞ্জলি হয়ে থাকলে আলিঙ্গন করি কি করে? হেয়তা না থাকলে গাঢ়তা কোথায়?

শচীও লাঠি হাতে নিয়ে মারতে যায় নিমাইকে। বাড়িতে মুচি এসেছে, তাকেই ছুঁয়ে দিয়েছে নিমাই। ছি ছি, অধম ছেলে, জাতধর্ম সব বিসর্জন দিলি। নিজের গায়ে ভাত মেখেছে, কেমন ধরো দেখি এবার। হাতের লাঠি ফেলে দাও বলছি, নইলে ঠাঁই নেব গিয়ে আঁস্তাকুড়ে।

শচী হাহাকার করে উঠল: 'বামুনের ছেলে হয়ে তোর এ কি কাণ্ড!'

'যার ব্রহ্মাণ্ড তার আবার কাণ্ড কি!' বললে নিমাই, 'সবই তার ঐশ্বর্য। তোমার শুচি আর অশুচি দুইই কল্পনা।'

মূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল শচী। দুগ্ধপোষ্য শিশু, তার মুখে এ কি অদ্বয়জ্ঞানের কথা!

প্রতিবেশিনীদের কাছে গেল দুঃখ জানাতে। 'এ ছেলে নিয়ে কি করি বলো তো! দুরন্তপনা করছে করুক, কোন ছেলেটা না করে। কিন্তু তাই বলে উচ্ছিষ্ট মানবে না? মুচিকে ছুঁয়ে দেবে? বলবে শুচি-অশুচি সব মাথার ভুল?'

'নিশ্চয়ই অপদেবতার ভর হয়েছে।' প্রতিবেশিনীরা মুখ

অন্ধকার করল: 'ষষ্ঠীঠাকরুনের পুজো করো। তিনিই তোমার ছেলেকে সুস্থ করে দেবেন।'

আঁচলের তলায় নৈবেদ্য নিয়ে ষষ্ঠীর থানে চলেছে শচী। কোত্থেকে নিমাই এসে হাজির।

সর্বনাশ হয়েছে। ভেবেছিল নিমাইকে এড়িয়ে চলে যেতে পারবে, কিন্তু সাধ্য কি তাকে ফাঁকি দাও।

'মা, কোথায় চলেছ?' নিমাই দাঁড়াল পথ জুড়ে।

'যাচ্ছি একটু কাজে। তুই এখানে কেন? তুই বাড়ি যা।' শচী পাশ কাটাতে চাইল।

'যাচ্ছি। কিন্তু তোমার আঁচলের নিচে কি আছে বলো। সন্দেশ?'

'ছি ছি, ও কথা বলতে হয় না—' জিভ কাটল শচী।

'কেন বলতে হয় না? আমার যে খিদে পেয়েছে।' নিমাই মার আঁচল চেপে ধরল।

'বাবা, এ পুজোর নৈবেদ্য।' শচীর মুখে কাতর অনুনয়: 'আমি ষষ্ঠীর থানে পুজো দিতে যাচ্ছি।'

'তবে নৈবেদ্য আমাকে দিয়ে যাও না। আমি খেলেই তো ষষ্ঠী তুষ্ট হবে।' বলে ছোঁ মেরে মার আঁচলের তলা থেকে নৈবেদ্যের ডালা কেড়ে নিল নিমাই। খেতে লাগল আনন্দে।

'আমার খ্যাপা ছেলের অপরাধ নিও না মা—' ষষ্ঠীর উদ্দেশে শচী কাঁদতে লাগল। গেল আবার প্রতিবেশিনীদের কাছে: 'এখন বলো এর কী উপায়?'

প্রতিবেশিনীরা ধরল নিমাইকে। বললে, 'তুই বামুনপণ্ডিতের ছেলে, এ তোর কী ব্যবহার!'

'কেন, কী করেছি?'

'কী করেছি! দেবতার নৈবেদ্য খেয়ে ফেলেছিস?'

'খাব না তো কি।' উচ্ছলকণ্ঠে হেসে উঠল নিমাই: 'আমিই তো দেবতা। আমি ছাড়া আর দেবতা কে!'

আমিই তো দ্বাপরে শ্যাম, কলিতে গৌর। আমিই তো প্রকাশ-বিশেষে তিন নাম ধরি—ব্রহ্ম, পরমাত্মা আর ভগবান। নির্বিশেষ-স্বরূপই ব্রহ্ম। অন্তর্যামীস্বরূপ পরমাত্মা। আর বিলাসস্বরূপই নারায়ণ। সমগ্র শক্তি, সমগ্র বীর্য, সমগ্র যশ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান আর সমগ্র বৈরাগ্য—এই ছয় ঐশ্বর্য। আমি সৎ, চিৎ ও আনন্দের বিগ্রহ। আমার দেহ নিত্যসত্তাযুক্ত, অনশ্বর। ঘনীভূত আনন্দের প্রতীক। আর এ আনন্দ মায়িক আনন্দ নয়, চিন্ময় আনন্দ। যে আনন্দ স্বপ্রকাশ, অপ্রাকৃত, আমি তারই ভূমামূর্তি। আমি অনাদি, নিত্যবিরাজমান। আমিই সর্বকারণকারণ। ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ও পালয়িতা বলে আমি গোবিন্দ। সর্ব ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা বলে আমি হৃষীকেশ।

তবু, সর্বসত্ত্বেও, সর্বেশ্বর হওয়া সত্ত্বেও, আমি ঐশ্বর্যের অনুগত নই, আমি মাধুর্যের অনুগত। হতে পারি আমি দ্বারকানাথ, হতে পারি মথুরানাথ, কিন্তু আসলে আমি ব্রজেন্দ্রনন্দন। মথুরাধিপতি নয়, মধুরাধিপতি ব্রজের শ্রীকৃষ্ণই আমি।

'সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্রকুমার।
আপনে চৈতন্যরূপে কৈল অবতার॥'

ব্রজের ভাব কী ?

প্রভু, তোমার চরণে যেন বিনিশ্চল মতি থাকে, তোমার চরণ-সংস্পর্শ ছেড়ে মন যেন কোথাও না যায়, এ ভক্ত ব্রজের নয়। প্রভু, যেন সর্বক্ষণ তোমার নামগুণগানে বিভোর তন্ময় থাকি, এও ব্রজের নয়। প্রভু, কর্মবিপাকে যেখানেই জন্ম হোক, পশু হয়ে পক্ষী হয়ে কীটপতঙ্গ হয়ে, তোমার প্রসঙ্গ যেন না ভুলি, এ বুলিও ব্রজের নয়। ব্রজের কথা অন্য কথা। তোমার ভালো হোক, তোমার কুশল হোক, তুমি সুখী হও, তুমি প্রীত হও—এ কথাই ব্রজের কথা। আমার ইচ্ছা শুধু কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা। শুধু তোমার সুখই আমার কাম্য। আমার যাই হোক, শুধু তুমি তৃপ্ত হও। তাতেই আমার

তৃপ্তি। আমার তৃপ্তি কৃষ্ণসুখতাৎপর্যময়ী। আমি আমার নিজের জন্যে কিছু চাই না, ভুক্তি-মুক্তি কিছু না, আমি চাই শুধু তোমার সুখসাধন। আমি তোমার জন্যে আমার নিজেকে চাই যেহেতু তুমি আমার নিজের চেয়েও আপনজন, 'স্বীয়ের চেয়েও প্রিয়।' তোমার স্বার্থেই আমার কৃতার্থতা।

তাই নিমাইয়ের নাম বিশ্বম্ভর। সমস্ত বিশ্বকে সে ভরণ করে, পোষণ-ধারণ করে, তাই। কিন্তু কী দিয়ে পোষণ-ধারণ করে? একমাত্র ভক্তি দিয়ে। ভক্তিই বিশ্বম্ভরের একমাত্র উপজীব্য।

'সহজে শর্করা মিষ্ট সর্বজনে জানে।
কেহো তিক্ত বাসে, জিহ্বা-দোষের কারণে॥
জিহ্বার সে দোষ, শর্করার দোষ নাঞি।
এই মত সর্বমিষ্ট চৈতন্যগোসাঞি॥'

কিন্তু ভক্তির ধার ধারে না মুরারি গুপ্ত। কুড়ি বছরের যুবক, গঙ্গাদাসের টোলে ব্যাকরণ পড়ে, তারপরে আবার কবিরাজ। যোগবাশিষ্ঠে পণ্ডিত, বেদান্তের ধুরন্ধর। নাহং নয়, বলে, সোঽহং। বলে, আমিই এক, আমিই সেই একমাত্র। কোথাও ভেদ নেই, আমিই সেই অদ্বৈত পুরুষ।

তর্ক করতে খুব ভালোবাসে। যুক্তি প্রয়োগ করে বিপক্ষকে নিরস্ত করতে। সব সময়েই যুদ্ধং দেহি ভাব, মুখে শুধু বক্তৃতার বর্ষণ। হাঁটতে-চলতে খেতে-বসতে অনুক্ষণ তার শ্রুতিবাক্যের বিশ্লেষণ, অদ্বৈততত্ত্বের জয়ধ্বনি। আর সঙ্গে-সঙ্গে হাত নাড়া মাথা নাড়ার ঘটা।

যেমন ব্রীহির বীজে মূল, নাল, পত্র, অঙ্কুর, কাণ্ড, কোশ, পুষ্প, ক্ষীর, তণ্ডুল, তুষ ও কণা বিদ্যমান থাকে, অঙ্কুরোদ্গমের সমগ্র কারণ প্রাপ্ত হলে বীজ হতে তাদের যেমন আবির্ভাব হয়, তেমনি বহুবিধ কর্মে দেবাদির শরীর অবস্থিত, বিষ্ণুশক্তি প্রাপ্ত হলেই তারা প্রকাশিত হয়। সেই বিষ্ণুই পরব্রহ্ম আর তাঁর থেকেই সমস্ত জগতের উৎপত্তি।

সুতরাং জগৎও তিনি ছাড়া কিছু নয়। আর যেমন উৎপত্তি তেমনি আবার তাঁতেই জগতের লয়-ক্ষয়। যে জগৎ দৃশ্যমান তা কোনো ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তু নয়। সমস্তই ব্রহ্মচ্ছায়া। অতএব আমাতে-ব্রহ্মতে ভেদ কোথায় ?

ভেদ কোথায় ! পিছন থেকে ভেংচি কাটল নিমাই।

পড়ুয়া বন্ধুদের নিয়ে রাস্তা দিয়ে চলেছে মুরারি, আর, যেমন তার মুদ্রাদোষ, অনররত হাত-মুখ নাড়ছে আর শাস্ত্রব্যাখ্যা করছে। আর সব চেয়ে তার যা প্রিয় তত্ত্ব, অদ্বয়তত্ত্ব, তারই স্থাপন করছে সরবগৌরবে।

পিছন থেকে হঠাৎ হাসির রোল উঠল।

চকিত-বিস্ময়ে ফিরে তাকাল মুরারি। দেখল পাঁচ বছরের ছেলে নিমাই তার অঙ্গভঙ্গির নকল করে অবোধ্য শব্দে গর্জন করছে, আর তাই দেখে তার সাঙ্গোপাঙ্গের দল ফেটে গড়িয়ে পড়ছে হাসিতে।

এ কী অকাণ্ড ! কিন্তু অর্বাচীন শিশু, এর ধুলোখেলা কে গায়ে মাখে ! মুরারি চলল এগিয়ে। চলল আবার তার শাস্ত্রের কচকচি। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আস্ফালন।

আবার হাসির ঢেউ উঠল।

ক্রুদ্ধ চোখে ফিরে তাকাল মুরারি। দেখল নিমাই আবার তার চলা-বলা নকল করে বক্তৃতা দিচ্ছে আর হাসিতে হুটোপুটি খাচ্ছে তার সঙ্গীরা।

'এ কী হচ্ছে ?'

'জ্ঞানমার্গ হচ্ছে। সোঽহং হচ্ছে।' বিদ্রূপের স্বরে বললে নিমাই। আর অমনি তার সঙ্গীদের হুল্লোড়।

'এ কী দুরাচার ! জগন্নাথের ঘরে দেখি এক অপদার্থ জন্মেছে। যাই তোর বাবাকে বলি গে যাই।'

'যাও না। জ্ঞানযোগের কথাও বলে এস গে সেই সঙ্গে।'

'আদর দিয়ে দিয়ে মাথা খেয়েছে'—তেড়ে এল মুরারি।

'কে কার মাথা খায় দেখো।' নিমাইয়ের চোখে পরিহাসের ঝিলিক।

তুপুরে খেতে বসেছে মুরারি, কে দরজায় দাঁড়িয়ে মেঘগম্ভীরস্বরে ডাক দিল : 'মুরারি!'

দেখ তো কে। মুরারি ত্রস্তব্যস্ত হয়ে উঠল।

ও মা! এ যে দেখি নিমাই। সর্বাঙ্গ ধূলিধূসর, দিগম্বর মূর্তি। পাঁচ বছরের তুধের শিশু, কণ্ঠে এ কী শাসনগম্ভীর সম্ভাষণ! ভঙ্গি যেন উদ্যত প্রহার।

'এ কি, তুমি এখানে কেন?' তিক্ত বিরক্তি মুরারির কণ্ঠে।

'আমি এখানে কেন? তোমার ভোজনের অন্ন নষ্ট করে দিতে এসেছি। দেখি কোন ব্রহ্ম তোমাকে রক্ষা করে।' বলে দিগম্বর শিশু থালা অশুচি করে দিল।

ধর ধর—ছুট দিল নিমাই। ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, 'হাত-নাড়া মাথা-নাড়া ছাড়ো। ছাড়ো জ্ঞানকাণ্ড, ছাড়ো কূটতর্ক। জীবে আর ব্রহ্মে ভেদ করো, ধরো ভক্তির পথ, অনুগতির পথ। তরজা ছেড়ে ধরো নামকীর্তন।'

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল মুরারি। ছেলেটাকে ধরা গেল না।

জীবে-ব্রহ্মে ভেদ করো। ব্রহ্ম কারণ, জীব কার্য। ব্রহ্ম পূর্ণ, জীব অংশ। ব্রহ্ম জ্ঞেয়, জীব জ্ঞাত। ব্রহ্ম প্রাপ্য, জীব প্রাপক। ব্রহ্ম উপাস্য, জীব উপাসক। ভেদ নেই? কার্য-কারণের মধ্যে, জ্ঞেয়-জ্ঞাতার মধ্যে, প্রাপ্য-প্রাপকের মধ্যে, উপাস্য-উপাসকের মধ্যে নিঃসন্দেহ ভেদ আছে। তা ছাড়া ব্রহ্ম অন্তর্যামী, সর্বহৃদয়ে তাঁর অধিষ্ঠান। যে বাস করে ও যেখানে বাস করে, অধিবাসী ও বাসস্থানও, ভিন্ন বস্তু। যে নিয়ন্ত্রিত তার থেকে যে নিয়ন্তা তার ভেদ স্পষ্ট। জীব নিয়ন্ত্রিত, ব্রহ্ম নিয়ন্তা।

কিন্তু বিচার করে দেখ, এ ভেদ আত্যন্তিক ভেদ নয়। এর মধ্যে আবার একটু অভেদের গন্ধ আছে। কারণই তো কার্যরূপে অভিব্যক্ত। পূর্ণরূপ বৃক্ষেরই তো অংশরূপ শাখা। শাখা কি বৃক্ষ থেকে একেবারে পৃথক? মৃৎপিণ্ড থেকেই তো মৃন্ময় ঘটের উদ্ভব। মৃৎপিণ্ড কারণ, ঘট কার্য। মৃৎপিণ্ড যেমন মৃত্তিকা, ঘটও তেমনি মৃত্তিকা। সুতরাং কারণে-কার্যে আবার অভেদ।

আরো একটু গভীরে যাও, আবার ভেদ পাবে। কারণ কখনো-কখনো কার্যের চেয়ে বেশি। কারণে রয়েছে কার্যাতিরিক্ততা। ঘট শুধু ঘটই, কিন্তু মৃৎপিণ্ডে ঘটও হয়, সরাও হয়। মৃৎপিণ্ড তাই ঘটের চেয়ে অতিরিক্ত। এই দিক থেকে আবার তাদের ভেদ। বৃক্ষের যে উপাদান শাখারও সেই উপাদান। কিন্তু শাখাই কিছু বৃক্ষ নয়, অথচ বৃক্ষ শাখারূপে থেকেও শাখার চেয়ে বেশি।

সুতরাং ভেদও আছে, অভেদও আছে। ভেদ থেকেও অভেদ, অভেদ থেকেও ভেদ। ব্রহ্ম আর জীব সত্তায় অভেদ, স্বাদে পৃথক।

আর সেই মহৎস্বাদের মহদুপায় ভক্তি।

বিকেলবেলা জগন্নাথের ঘরে মুরারি এসে উপস্থিত। বললে, 'নিমাই কই?'

কী আবার নালিশ না জানি, জগন্নাথ চঞ্চল হয়ে উঠলেন। প্রখরকণ্ঠে ডাকলেন নিমাইকে। কী অপকীর্তির কথা শুনতে হবে কে জানে!

মায়ের আঁচলে মুখ আড়াল করে ধূর্ত শিশু সামনে এসে দাঁড়াল।

বলা-কওয়া নেই, নিমাইয়ের পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল মুরারি। এ কী অকল্যাণ! জগন্নাথ আর শচী একসঙ্গে হায়-হায় করে উঠলেন। তুমি এত বড় একটা জ্ঞানী পুরুষ, একটা অবোধ শিশুকে তুমি প্রণাম করলে? কী আছে ওতে নত হবার?

মুচকে মুচকে হাসতে লাগল নিমাই।

'নিমাই আমাকে আজ পরম হরীতকী জুটিয়ে দিয়েছে, পরম পথ্য, পরম রসায়ন।' গদগদ কণ্ঠে বললে মুরারি, 'সমস্ত ব্যথা আর ব্যাধি হরণ করে বলেই তো হরীতকী। সে হরীতকীর নাম ভক্তি, পরম-প্রেমময়ী তৃষ্ণা, ইষ্টে গাঢ় আবিষ্টতা। বুঝতে পারছি ব্রহ্মানন্দের চেয়েও ভগবৎসাক্ষাৎকারের আনন্দ বেশি। আর সে আনন্দের জনয়িত্রী ভক্তি। মিশ্র, আপনার এ গৃহ গৃহ নয়, এ মন্দির—আর এর অধিষ্ঠাতা ব্রজবিলাসী ব্রজেন্দ্রনন্দন।'

শ্রীহরি যখন ধ্রুবকে দর্শন দিলেন, ধ্রুব বললে, 'তোমার এ সাক্ষাৎকারের কাছে কিসের ব্রহ্মানন্দ? নির্বিশেষ ব্রহ্মানন্দ গোষ্পদ আর এ সবিশেষ স্বরূপদর্শনের সুখ সমুদ্রের সমতুল।'

তোমাতে আমি তন্ময় হতে চাই না, তোমাকে আমি দেখতে শুনতে ধরতে ছুঁতে চাই। তোমাকে নিয়ে আসতে চাই আমার অনুভবের সীমার মধ্যে, সচেতন সাধনায় একটি সানন্দ-সুন্দর যথার্থ মূর্তির মধ্যে। আমার অল্পে সুখ নেই, অস্পষ্টে সুখ নেই, অগোচরে সুখ নেই। আমি চাই অনাবৃত দর্শন।

কিন্তু কতটুকু দেখব, কতক্ষণ দেখব?

'কোটি নেত্র নাহি দিল, সবে দিল দুই।
তাহাতে নিমিষ কৃষ্ণ, কি দেখিব মুঞি॥
কৃষ্ণাবলোকন বিনা ফল নাহি আন।
যেই জন কৃষ্ণ দেখে সেই ভাগ্যবান॥'

তবু, হে অখিলরসামৃতমূর্তি, তুমি আমার চোখের সামনে দাঁড়াও, তোমার সুধাদৃষ্টি আমার সমস্ত হৃদয়কে পরিব্যাপ্ত করে দিক। যেখানে বিরহবর্তিকা নিয়ে আমি একলা জেগে আছি সেখানে তোমার সঙ্গে আমার মুখচন্দ্রিকা হোক।

৮

বল্লভাচার্যের মেয়ের নাম লক্ষ্মী। গঙ্গার ঘাটে মহাদেবের পূজা করতে এসেছে। নিমাইয়ের সঙ্গে দেখা। লক্ষ্মীকে দেখে নিমাইয়ের মন, কেন কে জানে, খুশি হয়ে উঠল। জেগে উঠল 'সাহজিক প্রীতি'। ইচ্ছে হল কথা কই। ও তো এ জন্মের নয়, আগের জন্মের। ও যে তত্ত্বতঃ লক্ষ্মী বৈকুণ্ঠেশ্বরী।

নিমাই বললে, 'কাকে পুজো করতে এসেছ ?'

'মহেশ্বরকে।' লজ্জামাখানো চোখ নত করল লক্ষ্মী।

'মহেশ্বর আবার কে। আমিই তো মহেশ্বর।'

গাঢ় চোখ তুলে তাকাল লক্ষ্মী।

'আমাকে পুজো করলেই তোমার বাঞ্ছিত বর পাবে।' নিমাই মনে করিয়ে দিল।

বাঞ্ছিত বর, সে আবার কী! লক্ষ্মী দ্বিধা করতে লাগল।

'বাঞ্ছিত বর মানে মনের মতন স্বামী। তুমি তো স্বামীর জন্যেই পুজো করছ। আমাকে পুজো করলেই তুমি সেই স্বামী পাবে।' হাসতে লাগল নিমাই: 'আমিই তোমার সেই অভীপ্সিত। তোমার সংকল্প তো আমি জানি, আমার অর্চনই তোমার সংকল্প।'

লক্ষ্মী আর দ্বিধা করল না। নিমাইয়ের গায়ে পুষ্পচন্দন দিল, গলায় দিল মল্লিকার মালা। যুগল পায়ে প্রণাম করল, করল আত্মসমর্পণ।

কাত্যায়নীব্রতধারিণী গোপিনীদেরও এই কথা বলেছিল শ্রীকৃষ্ণ। বলেছিল, লজ্জায় তোমরা না বললেও আমি জানি আমার অর্চনাই তোমাদের মনোগত বাসনা। তোমাদের সেই সংকল্প আমি

অনুমোদন করি। তোমাদের সেই সংকল্প সিদ্ধ হবে। তোমাদের আমি কান্তারূপে অঙ্গীকার করব।

হেমন্তের প্রথম মাসে নন্দব্রজের কুমারীরা হবিষ্যান্ন খেয়ে কাত্যায়নীব্রত আরম্ভ করল। প্রত্যহ অরুণোদয়ে কালিন্দীর জলে স্নান করে নদীতটে বালুকাময়ী প্রতিকৃতি নির্মাণ করে গন্ধমাল্য নবপল্লব ফলমূল ও ধূপদীপ দিয়ে কাত্যায়নীর পূজা করে আর প্রার্থনা করে, হে মহামায়ে, হে মহাযোগিনি, হে সর্বেশ্বরি, নন্দগোপের পুত্রকে আমার পতি করে দাও। এই মহামায়া কুরুক্ষেত্রে ভদ্রকালী, ব্রজধামে কাত্যায়নী। কৃষ্ণে চিত্ত অর্পণ করে এমনি ভাবে এক মাস নিত্য পূজা সমাপন করল। অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমায় যথারীতি যমুনার ঘাটে সমবেত হল কুমারীরা। যথারীতি তটে বসন রেখে কৃষ্ণের গুণগান করতে করতে আনন্দে জলক্রীড়া শুরু করল। ব্রত সাঙ্গ হয়েছে, সর্বফলদাতা কৃষ্ণ কুমারীদের ব্রতফল দেবার উদ্দেশ্যে সেখানে এসে উপস্থিত হল। নিমেষে গোপিনীদের বস্ত্র হরণ করে সমীপস্থ কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করল। বললে, 'সুমধ্যমে, ব্রতাচরণে তোমরা অত্যন্ত কৃশ হয়েছ, মিথ্যে বলছি না, স্বচ্ছন্দে উঠে এসো, যার-যার আপন বস্ত্র নিয়ে যাও।'

পরিহাস শুনে গোপিকারা প্রেমে বিহ্বল ও লজ্জিত হয়ে একে-অন্যের দিকে তাকাতে লাগল, শীতল জলে আকণ্ঠমগ্ন দেহ কাঁপতে লাগল ঘন-ঘন। বললে, 'হে কৃষ্ণ, তুমি নন্দগোপের পুত্র, তুমি অন্যায় কোরো না। তোমাকে আমরা ভালোবাসি। আমরা জানি তুমি ব্রজের মধ্যে ভদ্রোত্তম। দেখছ না আমরা শীতে কাঁপছি, আমাদের বস্ত্র প্রত্যর্পণ করো। হে শ্যামসুন্দর, আমরা তোমার দাসী, তুমি আর যা কিছু বলো আমরা তাই করব। হে ধর্মজ্ঞ, আমাদের বস্ত্র ফিরিয়ে দাও। নয়তো বলে দেব রাজাকে।'

রাজা আমার কী করবে? কৃষ্ণ বিদ্রূপ করে উঠল। বললে, 'তোমাদের শেষ বন্ধন যে লজ্জা, যা তোমাদের শ্রেষ্ঠ রত্ন, তাই

আমাকে সমর্পণ করো। এই আত্মনিবেদনের ফলেই তোমাদের কাত্যায়নীপূজা সিদ্ধ হবে।'

ব্রজনন্দিনীরা আর সঙ্কোচ করল না। নিঃশব্দে জল থেকে উঠে এসে বস্ত্র সংগ্রহ করল একে-একে।

বসন পরিধান করেও স্থান ত্যাগ করল না। প্রিয়সঙ্গমে পরম নির্বৃতি লাভ করে স্থির হয়ে রইল। কৃষ্ণ তাদের মনোগত ভাব বুঝতে পারল, বললে, 'তোমাদের সংকল্প সফল হবে। আগামিনী শারদযামিনীতে পূর্ণিমায় আমার সঙ্গে মিলিত হবে তোমরা। আমাতে যাদের চিত্ত আবিষ্ট, কামভোগের জন্যে তাদের আর কোনো কামনা হয় না; যেমন বীজ ভর্জিত হলে তার থেকে আর অঙ্কুরোদ্গমের চেষ্টা থাকে না। তোমরা কৃষ্ণগৃহীতচিত্তা, তোমরা লব্ধকামা, প্রশান্ত মনে এবার ফিরে যাও ব্রজালয়ে।'

ফিরে গেল ব্রজাঙ্গনারা।

'দাদা, বাড়ি চলো, মা ভাত নিয়ে বসে আছে।' অদ্বৈত-আশ্রমের দরজায় এসে ডাক দিল নিমাই।

সারাক্ষণ শাস্ত্রপাঠ নিয়ে ব্যস্ত বিশ্বরূপ, ভাইকে বিশেষ দেখতে-শুনতে পায় না। তাছাড়া এখন অদ্বৈতের সঙ্গে মিলে বাড়ি আসাও প্রায় ছেড়ে দিয়েছে। সারাক্ষণ তার অদ্বৈতের সঙ্গে ভগবানকে নিয়ে কথা, ভগবানে অনপায়িনী ভক্তি নিয়ে। চার দিকে হাটে-ঘাটে শুধু তন্ত্র-মন্ত্র নিয়ে আলোচনা, জ্ঞান আর মায়াবাদ নিয়ে বোঝাপড়া। হাঁপিয়ে উঠেছে বিশ্বরূপ। অদ্বৈতসভায় এসে শীতল-শ্যামলের দেখা পেয়েছে। অদ্বৈতসভায় শুধু ভক্তির কথা। ভক্তিই রসের সার। ভক্তিতেই শুধু আনন্দচমৎকারিতা। প্রৌঢ়ানন্দ-চমৎকারকাষ্ঠা।

এই ভক্তির কথা পেলে খাওয়া-দাওয়া ভুলে যায় বিশ্বরূপ।

'দাদা, মা ডাকতে পাঠিয়েছেন। বাড়ি যাবে না? তোমার খিদে পায়নি?'

এ কে এসে দাঁড়াল দরজায়? অদ্বৈত চমকে তাকাল নিমাইয়ের দিকে। এ কে? এত রূপ কি মানুষের হয়? 'প্রতি অঙ্গে নিরুপম লাবণ্যের সীমা। কোটি চন্দ্র নহে এক নখের উপমা॥' সহসা আমার সমস্ত চিত্ত হরণ করে নিল কে এ মনোহর?

'বা, এ আমার ছোট ভাই নিমাই। দুরন্তের শিরোমণি।'

দুরন্তের শিরোমণি! সে কি? সমস্ত ভক্তবৃন্দের সমাধির দশা কেন? এতক্ষণ সকলে কৃষ্ণকথা বলছিলাম, এখন আর সে কথা মুখে আসছে না কেন? তবে যিনি সমস্ত কথার অতীত, যাকে নিয়ে এত কথা, তিনিই কি সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন?

'প্রাকৃত মানুষ কভু এ বালক নয়।' অদ্বৈত ঘোষণা করে উঠল। বৈষ্ণবভক্তদের বললে, 'যাও নির্ণয় করো, এ বালক কোন বস্তু। এ কোন রসিকশেখর! কোন পরমদৈবত!'

নিমাইয়ের গলা জড়িয়ে ধরে চলেছে বিশ্বরূপ। নিমাই অন্যমনে কাপড় চিবোচ্ছে।

'ছি, কাপড় চিবোচ্ছ কেন?' বিশ্বরূপ তিরস্কার করল।

'কাপড় চিবোলে কী হয়, দাদা?'

'ঠাকুর রাগ করেন।'

'কে ঠাকুর, দাদা?'

বিশ্বরূপ এক পলক থমকে দাঁড়াল। কি জানি কে ঠাকুর! একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল নিমাইয়ের দিকে।

কথা পাল্টাল। বললে, 'তুই এত দুষ্টু কেন বলতে পারিস? কেন তোর এত সব অমানুষের কর্ম?'

'অমানুষের কর্ম?' হেসে উঠল নিমাই।

বিশ্বরূপ আবার চমকাল। অমর্ত বলেই বোধ হয় কাণ্ডও অলৌকিক। ভাবল, এ শিশু-শরীরে কৃষ্ণই বুঝি খেলা করছে। তাই বুঝি এই গোপাললীলা। চৈতন্যচাপল্য।

বাড়ি ফিরে এসে ডাক দিল মাকে।

'মা, দাদাকে নিয়ে এসেছি ধরে। এবার খেতে দাও একসঙ্গে। দাদা খায়নি বলে আমিও খাইনি।'

দু' ভাই খেতে বসল একসঙ্গে। মা পরিবেশন করতে লাগল।

'তোকে লোকে নিন্দা করে, এ দেখে সহ্য হয় না।' বললে বিশ্বরূপ।

নিমাই মাথা হেঁট করে রইল।

'তুই কেন এত চঞ্চল ?'

সে কি নিন্দের ? আমার কি এক মুহূর্তও স্থির হয়ে থাকবার জো আছে ? আমি নিয়ত চলছি বলেই তো সংসারও চলছে।

'তুই অন্যের বাড়িতে ঢুকে চুরি করে খাস—'

কার বাড়ি, কার জিনিস, আর কে সে চোর !

'তাছাড়া তুই অশুচি-অস্পৃশ্য মানিস না, যাকে-তাকে ছুঁস—'

যাকে-তাকে ! সেদিন একটা কুকুরছানা বাড়ি নিয়ে এসেছিলাম কোলে করে, দাওয়ার খুঁটিতে রেখেছিলাম বেঁধে। আমাকে না জানিয়ে ছেড়ে দিলেন মা। খবর পেয়ে ছুটে এসে দেখলাম দড়ি পড়ে আছে, কুকুরছানা নেই। আমার কুকুরছানা কোথায় গেল ? কেঁদে লুটিয়ে পড়লাম ধুলোয়, উঠোনে গড়াগড়ি দিতে লাগলাম। তখন মা আর কি করেন, কথা দিলেন, আরেকটা ভালো ছানা দেবেন যোগাড় করে। আমি যাকে ছুঁই সে কি আর অশুচি থাকে ?

'তবু কেউ তোকে প্রশংসা করে না, শুধু নিন্দে করে—এতে বড় কষ্ট হয়।'

শুধু নিন্দে ? কেউ প্রশংসা করে না ?

যমুনাপুলিনে এসে কৃষ্ণ ব্রজবালকদের বললে, দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত হয়েছে, আমরা সকলে ক্ষুধার্ত, এস, এখন সকলে ভোজন করতে বসি। গোবৎসগণ জল পান করে নিকটে তৃণাহার করতে করতে বিচরণ করুক।

কৃষ্ণকে মধ্যে রেখে মণ্ডলাকারে বসল তার বয়স্যেরা। বহুদল-সমন্বিত পদ্মকর্ণিকার মত। বন্ধুরা তাদের শিকা থেকে মিষ্টান্ন ও পিষ্টক বার করতে লাগল। পদ্মপত্র বৃক্ষত্বক বা শিলাখণ্ড যে যা পেল ভোজনপাত্র করে খেতে বসল। উল্লাসকল্লোল উথলে উঠল চার দিকে। যার যে খাবার ভালো লাগছে আধখানা খেয়ে বাকি আধখানা তুলে দিচ্ছে কৃষ্ণের মুখে, কখনো বা অন্য বালকের মুখে। যজ্ঞেশ্বর আজ যেন বিরাট ভোজনযজ্ঞের অনুষ্ঠাতা। আর আজ হোমঘৃত শুধু হাস্যপরিহাসের ছিটে।

দৃশ্য দেখে ব্রহ্মা ও অন্যান্য স্বর্গবাসীরা বিমূঢ় হয়ে গেল। এ কি, অচ্যুত ব্রজবালকদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আহার করছেন! উচ্ছিষ্ট খাচ্ছেন!

ইতিমধ্যে গোবৎসেরা তৃণলোভে দূরবর্তী বনের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে। আর তাদের দেখা যাচ্ছে না। ব্রজবালকেরা উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল। কৃষ্ণ বললে, তোমরা খাচ্ছ খাও, আমি ওদের খুঁজে আনছি। কটিতটে বসনের মধ্যে অর্ধপ্রবিষ্ট বেণু, বামকক্ষে শৃঙ্গ ও বেত্রদণ্ড, ডান হাতে দধিমাখা অন্নের গ্রাস, কৃষ্ণ ধেনুর খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। গিরি, দরী, কুঞ্জ, গহ্বর—কোথাও তাদের দেখা পেল না। কী করে পাবে? নিমেষে ব্রহ্মা তাদের হরণ করে এক নির্জন গিরিগুহায় আবদ্ধ করে রেখেছে।

পুলিনে ফিরে এসে কৃষ্ণ দেখল, গোপবালকেরাও অন্তর্হিত। তাদেরও ব্রহ্মা হরণ করে বন্দী করেছে আরেক পর্বতকন্দরে।

তখন কৃষ্ণ নিজেই গোবৎস ও ব্রজবালকদের মূর্তি ধারণ করল। যে বৎসের ও বৎসপালের যেমন শরীর-প্রমাণ, যার যে পরিমাণে হাত-পা, যার যে রকম যষ্টি শৃঙ্গ বেণু ও শিকা, যার যে রকম বসন ও আভরণ, যার যে রকম শীল গুণ নাম আকৃতি বয়স ও আহার-বিহার, অবিকল অনুরূপ প্রকাশিত হল শ্রীহরি। সর্বজগৎ বিষ্ণুময়, এই বাক্য বস্তুত সার্থক করে সর্বাত্মা হয়ে ব্রজে প্রবেশ করল।

বিশেষ-বিশেষ গোপবালক হয়ে বিশেষ-বিশেষ গোবৎসকে বিশেষ-বিশেষ গোষ্ঠে রেখে বিশেষ-বিশেষ গৃহে গিয়ে উপস্থিত হল। বালকজননীরা বেণুরব শুনে উতলা হয়ে উঠে এসে স্ব-স্ব পুত্রবোধে পরব্রহ্মকে প্রগাঢ় বাহুতে আলিঙ্গন করতে লাগল। স্নেহসুখে তাদের ঝরতে লাগল স্তনামৃত। যে কালে যে ক্রীড়া বা যে কর্ম বিহিত তাই যথাক্রমে চলতে লাগল হুবহু। সায়ংকালে গৃহে ফিরলে জননীরা কৃষ্ণকে, যার যেমন অভিরুচি, করতে লাগল মর্দন-মজ্জন লেপন-অলঙ্করণ। কেউ বা বসল খাওয়াতে। কেউ বা ঘুম পাড়াল। পুত্রস্নেহ বেড়ে গেল সমধিক।

গাভীদেরও সেই দশা। যে বৎস প্রত্যাবৃত্ত হয়েছে তাদের প্রতিই বেশি অনুরাগ। তাদের অভিমুখেই স্বগত দুগ্ধক্ষরণ।

এমনি ভাবে কেটে গেল এক বছর—ব্রহ্মার এক ত্রুটিকাল। এক ত্রুটিকাল পরে ব্রহ্মা বৃন্দাবনে এসে দেখল কৃষ্ণ তার অনুচরদের সঙ্গে আগের মতই বাল্যলীলা করছে। সে কি কথা! গোকুলের সে সব বালক আর গোবৎস পর্বতগুহার মায়াশয্যায় কি এখনো শুয়ে নেই? তারা কি ছাড়া পেয়েছে? গুহায় গিয়ে দেখল, না, তারা অচেতন হয়েই পড়ে আছে ভূতলে, এখনো হয়নি পুনরুত্থান। তবে এরা, এ সব বালক আর বৎস, এরা কারা? এরা এল কোত্থেকে?

চক্ষু প্রক্ষালন করতে লাগল ব্রহ্মা। কে প্রকৃত কে মিথ্যা নির্ণয় করতে পারল না। নির্মোহ অথচ বিশ্ববিমোহন বিষ্ণুকে মোহিত করতে গিয়ে নিজেই মোহিত হয়ে গেল। অন্ধকার রাত্রির কুয়াশা কি অন্ধকার রাত্রিতে পৃথক আবরণ তৈরি করতে পারে? রৌদ্রে কি হয় কখনো খদ্যোতের পৃথক প্রকাশ?

সহসা ব্রহ্মা দেখল কি বৎস কি বৎসপাল কি যষ্টি-শৃঙ্গ সব কিছুই মেঘের মত শ্যামবর্ণ, সকলেরই পরিধানে পীতবাস, সকলেই চতুর্ভুজ, সকলেরই হাতে, শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম, মাথায় কিরীট, কানে কুণ্ডল,

পায়ে নূপুর, করে রত্নকঙ্কণ, কণ্ঠে হার ও বনমালা। বহুপুণ্য ব্যক্তিরা এ যাবৎ যত কোমল-নতুন তুলসীদল নিবেদন করেছে তা দিয়ে আপাদমস্তক আবৃত।

যে ব্রহ্মা বাণীর অধীশ্বর, তর্কের অগোচর, স্বপ্রকাশ ও অশেষমহিমাসম্পন্ন—অজ্ঞানী হয়ে পড়ল। হংসপৃষ্ঠ থেকে পড়ে গেল মাটিতে। কৃষ্ণ তখন তুলে নিল যবনিকা। ব্রহ্মা জেগে উঠে দেখল, বৃন্দাবনে অদ্বয় অনন্ত অগাধবোধ পরমপুরুষ গোপবালকের নাট্যে হাতে খাদ্যগ্রাস নিয়ে আগের মতই ইতস্তত বৎস ও বয়স্যদের অন্বেষণ করে ফিরছে। তখন ব্রহ্মা তার চতুঃশীর্ষস্থ মুকুটচতুষ্টয় দিয়ে কৃষ্ণের চরণস্পর্শ করে কম্পিতকলেবরে গদগদভাবে স্তব করতে লাগল।

হে স্তবনীয়, তুমি প্রসন্ন হবে বলেই তোমাকে স্তব করি। যারা ক্ষুদ্রপ্রমাণ ধান্য পরিত্যাগ করে স্থূলপ্রমাণ তুষ তাড়ন করে তাদের চেষ্টা যেমন নিষ্ফল তেমনি যারা তোমার মঙ্গলময় ভক্তি ছেড়ে কেবল জ্ঞানলাভেই যত্ন করে তাদের ক্লেশস্বীকারই সার। হে ভূমন, হে অপরিচ্ছিন্ন, প্রথমত যোগী হয়েও অনেকে জ্ঞানলাভ করতে না পেরে তোমাকে তাদের সকল লৌকিক কর্ম ও চেষ্টা অর্পণ করে অবিরত তোমার কথা শোনে, তাতেই তোমার প্রতি তাদের যে ভক্তি উৎপন্ন হয়, তাতেই তারা জানতে পারে তোমাকে। অতএব ভক্তিই জ্ঞানলাভের হেতু। জীবিত না থাকলে যেমন পৈত্রিক ধনে অধিকার থাকে না তেমনি ভক্তের জীবন ছাড়া মুক্তিলাভেরও উপায় নেই।

স্তবশেষে ব্রহ্মা ক্ষমাপ্রার্থনায় আনত হল।

হে ঈশ্বর, আমার দৌর্জন্য দেখ। তুমি আদ্য, তুমি অনন্ত, তুমি মায়াজীবীদেরও বিমোহক, আর আমি এমনি মূঢ় যে তোমাতে মায়া বিস্তার করে নিজ ঐশ্বর্য দেখাতে গিয়েছিলাম। হায়, শিলা যেমন আগুনের কাছে কিছুই নয়, আমিও তেমনি তোমার কাছে নিঃস্ব। আমাকে ক্ষমা করো। রজোগুণ থেকে আমার উৎপত্তি, তাই আমিই

জগৎকর্তা এই গর্বে আমার ছুচোখ অন্ধ হয়েছিল, আমাকে মার্জনা করো। আমার নিজ প্রয়োজনে সপ্তবিতস্তিমাত্রপরিমিত এই প্রকৃতি-অহঙ্কার-আকাশ-বায়ু-অগ্নি-পৃথিবী-ঘটিত ব্রহ্মাণ্ড যদিও আমার দেহ, তবু তোমার রোমকূপ এত অগণন ব্রহ্মাণ্ডরূপ পরমাণুর যাতায়াতের গবাক্ষ যে সাধ্য কি আমি তোমার মহিমা জানতে পারি? আমার অপরাধ নিও না। গর্ভস্থ শিশু যে পদদ্বয় দ্বারা তার মাকে প্রহার করে তাতে কি তার মা অপরাধ নেয়? কার্য ও কারণ কিছুই তোমার উদরের বহির্ভূত নয়। তুমি সর্বদেহীর আত্মা, তুমি সর্ব-লোকের সাক্ষী, আমার যে অপরাধ তাও তোমারই আশ্রয়ের মধ্যে, তোমারই প্রশ্রয়ের মধ্যে। তুমিই প্রকৃতিস্থ আত্মা, তুমি ছাড়া সমস্ত বিশ্বই মায়া। প্রথমে এক ছিলে, পরে সমস্ত ব্রজবালক ও বৎসরূপ ধারণ করলে। তারপর দেখি সমস্তই চতুর্ভুজরূপে বিদ্যমান। তুমিই যোগমায়া বিস্তার করে ক্রীড়া করছ। তোমারই মায়ায় এই স্বপ্নসদৃশ সততপ্রকাশ বিশ্ব সৎ বলে প্রতিভাত হচ্ছে। এক তুমিই সত্য। তুমিই পূর্ণ। তুমিই নিত্য ও অনন্ত বলেই পূর্ণ। তুমিই স্বয়ংজ্যোতি, তুমিই অজস্র সুখ, তুমিই নির্মল নিরঞ্জন। অবিচ্ছিন্ন অমৃত।

'তোর যদি একটি ছোট ভাই থাকত তুই বুঝতিস দাদার ছুঃখ।' ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বললে আবার বিশ্বরূপ।

খাওয়া কখন শেষ হয়ে গিয়েছে। নিমাই তেমনি অধোমুখ হয়েই রইল।

'বল অমন কাজ আর করবিনে?'

'করব না।' বলতে গেল নিমাই কিন্তু কথা ফুটল না। ছুচোখ বেয়ে নেমে এসেছে তরল মুক্তার স্রোত। আর নিমাই একবার কাঁদতে শুরু করলে আর তার বিরাম নেই সহজে।

'ও কি রে, কাঁদছিস কেন?' বিশ্বরূপ অস্থির হয়ে উঠল: 'তোকে কী বললাম?'

কাঁদতে-কাঁদতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল নিমাই। কাঁপতে লাগল থর থর করে। এ কি, কি সর্বনাশ, মূর্ছা গেল নাকি ?

বিশ্বরূপ অন্ধকার দেখল। উদ্বেল হয়ে উঠল উদ্বেগে। নিমাইয়ের চোখে জলের ঝাপটা দিতে লাগল। যদি জোরে দিলে তার লাগে তাই চোখের উপর বুলোতে লাগল ঠাণ্ডা হাত। ডাকতে লাগল : 'নিমাই, নিমাই, চোখ চা। আমি কি তোকে বকেছি ? আমি কি পারি তোর দোষ ধরতে ?'

চোখ মেলল নিমাই। নিমাইকে ব্যগ্র বাহুর বন্ধনে বিশ্বরূপ কোলে তুলে নিল। হাঁটতে লাগল বুকে করে। নিমাই শান্ত হয়েছে। ঘুমিয়ে পড়েছে।

ধীরে ধীরে তাকে শয্যায় শুইয়ে দিল বিশ্বরূপ। তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল নির্নিমেষে। তুমিই স্বয়ংজ্যোতি, তুমিই অজস্র সুখ, তুমিই নির্মল নিরঞ্জন। অবিচ্ছিন্ন অমৃত।

'কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্যপূর মধুর হৈতে সুমধুর
তাতে যেই মুখ-সুধাকর।
মধুর হৈতে সুমধুর তাহা হৈতে সুমধুর
তার সেই স্মিত-জ্যোৎস্নাভর॥'

৯

সারা দিন প্রায় অদ্বৈতসভায়ই কাটায় বিশ্বরূপ। বাপের সঙ্গে বড় একটা দেখা হয় না। সেদিন হঠাৎ দেখা হয়ে গেল পথের মধ্যে। জগন্নাথ অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলেন, যৌবনে কেমন সমর্থসুন্দর হয়ে উঠেছে বিশ্বরূপ। ভাবলেন ছেলের এবার বিয়ে দিই।

তা ছাড়া আবার কি। নিরবধি কেবল কৃষ্ণকীর্তনে মেতে আছে।

মনে সংসারস্বপ্নের লেশমাত্র নেই। নামমাত্র যে ঘরে ফেরে তাও ঠাকুরঘরে বসে থাকে। গৃহব্যবহারের ধারমাত্র ধারে না। একে এবার পরাতে হবে শৃঙ্খল। বন্ধনবল্লরী।

কে এই বিশ্বরূপ ?

বিশ্বরূপ বলরামের বিলাস মূর্তি। বলদেবধাম।

'বলদেব প্রকাশ—পরব্যোমে সঙ্কর্ষণ।
তেঁহো বিশ্বের উপাদান নিমিত্ত কারণ ॥
তাঁহা বিনা বিশ্বে কিছু বস্তু নহে আর।
অতএব বিশ্বরূপ নাম যে তাহার ॥'

ক্রীড়াশ্রান্ত বলরাম গোপবালকের কোলে মাথা রেখে শুয়েছে আর কৃষ্ণ তার পা টিপে দিচ্ছে। কখনো বা বীজন করছে ব্যজন দিয়ে। বন্ধুরা এসে বললে, হে মহাবল রাম, হে দুষ্টদমন কৃষ্ণ, অদূরে এক বৃহৎ তালবন আছে, তার সর্বত্রপ্রসারী সুগন্ধের আঘ্রাণ পাচ্ছি সকলে, কিন্তু সাধ্য কি সে ফল আমরা খাই। অতিবীর্য দুরাত্মা অসুর, ধেনুকাসুর, সে বন রক্ষা করছে। তোমরা ওঠো। আমাদের সে ফল খাবার ইচ্ছে হয়েছে। আমাদের সে ইচ্ছে পূরণ করো। ফল দাও আমাদের।

দুই ভাই তালবনে প্রবেশ করল। প্রমত্ত বাহুতে আকর্ষণ করে তালগাছগুলো সবলে নাড়তে লাগল বলদেব। সশব্দে শুরু হল ফলবৃষ্টি। দুর্মদ ধেনুকাসুর ছুটে এসে বলরামের বক্ষে ক্রুদ্ধ আঘাত করল। বলরাম এক হাতে তার দুই পা ধরে তাকে শূন্যে ঘোরাতে লাগল। ঘুরিয়ে-ঘুরিয়েই তার প্রাণবায়ু নিঃশেষ করল ও পরে দূরস্থ এক তালবৃক্ষের উপর তাকে নিক্ষেপ করল। মহাবাত্যায় প্রকম্পিত হল তালবন।

জগদীশ্বর ভগবান অনন্ত এ কিছু আশ্চর্য নয়। যেহেতু তন্তুতে বস্ত্রের মত তাঁতেই বিশ্ব ওতপ্রোত হয়ে আছে।

বস্ত্রের দৈর্ঘ্যের দিকে সুতো ওত আর প্রস্থের দিকে সুতো প্রোত।

বস্ত্রের সর্বত্রই সুতো, সুতো ছাড়া বস্ত্রে অন্য কিছু নেই। বস্ত্র তাই সুতোতে ওতপ্রোত। তেমনি বিশ্বও ভগবানে, বলদেবে, অনুস্যূত। বিশ্বের দৈর্ঘ্যের দিকেও তিনি প্রস্থের দিকেও তিনি।

বিয়ের উদ্যোগ হচ্ছে শুনে বিমর্ষ হল বিশ্বরূপ। মা-বাবা যদি বিয়ে করতে বলেন তবে কি সে পারবে অবাধ্য হতে? গুরুদ্রোহ অসম্ভব। তবে কী করা যায়? বিশ্বরূপ স্থির করল গৃহত্যাগ করব। সন্ন্যাসী হব।

সহপাঠী লোকনাথ, তাকে বললে মনের কথা।

লোকনাথ লাফিয়ে উঠল। বললে, 'আমিও তাহলে তোর সঙ্গে যাব।'

'সে কি, তুই যাবি কোথায়?'

'তোর পিছে-পিছে।'

কিন্তু যাব যে, নিমাইকে দেখবে কে? কে তাকে লেখাপড়া শেখাবে, কে করবে শাসনসংযম? বাবা-মার কথা বিশেষ ভাবি না কারণ যে কুলে সন্ন্যাসী হয় সে কুল উর্ধ্বগতি লাভ করে। 'গোষ্ঠীয়ে পুরুষ যার করয়ে সন্ন্যাস, ত্রিকোটি-কুলের হয় শ্রীবৈকুণ্ঠে বাস।' কিন্তু নিমাইকে তো এ কুলেই মানুষ হতে হবে, নইলে বাবা-মাকে কে দেবে সান্ত্বনা?

হায়, সন্ন্যাসীর আবার ভাবনা! তার আবার পিছটান!

শীতের রাত, বিশ্বরূপ আর লোকনাথ, ষোল বছর বয়েস, বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। যাবার আগে বিশ্বরূপ নিদ্রিত বাপ-মাকে প্রণাম করল আর নিমাইকে সঁপে দিল কৃষ্ণের পাদপদ্মে।

হে কৃষ্ণ, হে নবনবায়মান মাধুর্য, তুমি আমার নিমাইকে দেখো। হে অনন্ত ভাবনিধি, আমি কি তোমার ইয়ত্তা করতে পারি? তুমি বহুমূর্ত্যৈকমূর্তিক, একরূপে তুমি বহুমূর্তি, আবার বহুমূর্তিতেও তুমি একরূপ। একই বৈদূর্য্যমণি একদিক থেকে নীল, আরেক দিক থেকে হলদে, আরেক দিক থেকে লাল। তেমনি তুমি অচ্যুত হয়েও

বহুভাত। যেন একই ময়ূরকণ্ঠি শাড়িতে নানা বর্ণের সমবায়, নানা বর্ণের সমুচ্ছ্বাস। লবণপিণ্ডের যেমন সর্বত্রই লবণ, কোথাও এক বিন্দু স্থানেও লবণ ছাড়া অন্য কিছু নেই, তেমনি তোমাতে সমস্তই আনন্দ, আনন্দ ছাড়া আর কিছু নেই। তুমিই সর্বাশ্রয়। 'কৃষ্ণ এক সর্বাশ্রয় কৃষ্ণ সর্বধাম, কৃষ্ণের শরীরে সর্ব বিশ্বের বিশ্রাম।' তুমি কমলনয়ন, মেঘাভ, বৈদ্যুতাম্বর, তুমি দ্বিভুজ, বনমালী, জ্ঞানমুদ্রাঢ্য, তুমি ঈশ্বর।

কিন্তু গঙ্গা পেরোব কি করে? এত রাত্রে নৌকো কই, পাটনী কই? জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল বিশ্বরূপ, দেখাদেখি লোকনাথ। পথের সম্বল একখানা পুঁথি ছিল সঙ্গে, তাকে বাঁচায় কি করে? বাঁ হাত জলের উপর খাড়া রেখে বিশ্বরূপ ডান হাতে সাঁতার কাটতে লাগল, সেই ঊর্ধ্ব হাতে পুঁথি ধরা। দু' বন্ধুতে গঙ্গা পার হয়ে গেল। শীতে ভিজেকাপড়ে যাত্রা করল পশ্চিমে। কাল পূবে সূর্য উঠবে ভোরবেলা। যেটুকু আর্দ্রতা আছে শুষ্ক হয়ে যাবে।

কয়েক দিনের মধ্যেই পুরী সম্প্রদায়ের এক সন্ন্যাসীর কাছে সন্ন্যাস নিল বিশ্বরূপ। নাম হল শঙ্করারণ্য। শঙ্করারণ্যের কাছে দীক্ষা নিল লোকনাথ। দুই নবীন কিশোর দণ্ডকমণ্ডলু নিয়ে বেরুল অনন্তপথে, অনন্ত পাথেয়ের সন্ধানে।

জগন্নাথের ঘরে কান্নার রোল উঠল।

নিমাই মা-বাবাকে বললে, 'কাঁদছ কেন? আমিই তো আছি তোমাদের।'

> 'ভাল হৈল—বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল।
> পিতৃকুল মাতৃকুল দুই উদ্ধারিল ॥
> আমি তো করিব তোমা দোঁহার সেবন।
> শুনিঞা সন্তুষ্ট হৈল পিতা-মাতার মন ॥'

আশ্বাস দিচ্ছে নিমাই। দাদা তো মহৎ উদ্দেশ্যে ঘর ছেড়েছেন। সেই বড় সুখ ভেবে ছাড়ো এই ছার দুঃখ। আর দেখ আমাকে। আমি

থাকতে তোমাদের কিসের অভাব! আমি কখনো তোমাদের ছাড়ব না। আজীবন তোমাদের সেবা করব। তবে আর কিসের কান্না!

জগন্নাথের বন্ধুবান্ধবদেরও সেই কথা :

'এই কুলে ভূষণ তোমার বিশ্বম্ভর।
এই পুত্র তোমার হইব বংশধর॥
ইহা হৈতে সর্ব দুঃখ ঘুচিব তোমার।
কোটি পুত্রে কি করিব এ পুত্র যাহার॥'

বুক বেঁধে উঠে দাঁড়ালেন জগন্নাথ। স্বামীর সাহসে স্ত্রী, শচীদেবী। কৃষ্ণই পুত্র দিয়েছেন তিনিই নিয়ে নিলেন। স্বতন্ত্র জীবের তিলার্ধেরও শক্তি নেই।

তাই হে কৃষ্ণ, তোমাকেই সমর্পণ করে দিলুম ছেলে। এ কথা বলব না ছেলে আমার নিষ্ঠুর, ছেলে আমার অকৃতজ্ঞ। বলব না বালচাপল্যে সন্ন্যাস নিয়ে ধর্মভ্রষ্ট হয়েছে। বলব না তাকে তুমি ফিরিয়ে নিয়ে এস সংসারে। বরং এই আমার প্রার্থনা হোক, সে যেন আর ফিরে না আসে, সে যেন বৈষ্ণবাগ্রগণ্য হয়।

কিন্তু, নিমাইয়ের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে শচী, কিন্তু ছোট ছেলেটা ঘরে থাকবে তো? হে গোবিন্দ, আমার নিমাই যেন ঘরে থাকে, আমার নিমাই যেন সংসারী হয়। 'গৃহস্থ হইয়া ঘরে রহুক নিমাঞিা।' কিন্তু জগন্নাথের মন প্রবোধ মানে না। 'মিশ্র বোলে, এই পুত্র রহিবেক ঘরে, ইহাতে প্রমাণ মোর না লয় অন্তরে।' না, এ আমার অমূলক ভয়। নিমাইয়ের মাথায় আশীর্বাদের হাত রাখে। কৃষ্ণনির্মাল্যের হাত। হে সচ্চিদানন্দতনু ব্রজেন্দ্রনন্দন, তুমি আমার ঘরে থাকো।

নৈবেদ্যের তাম্বুল খেয়েছে নিমাই। খেয়েই অচেতন হয়ে পড়ে গেছে মাটিতে। শচী জগন্নাথ আর তত ব্যস্ত হন না তার মূর্চ্ছায়। কিন্তু বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেয়ে এ সব সে কী বলছে? জগন্নাথ শিউরে উঠলেন। কেন, ভালো কথাই তো। আশ্বাসের অর্থ খুঁজল শচী।

'মা, দাদাকে দেখলুম।'

'দাদাকে ? কোথায় ?' শচী আকুল হয়ে উঠল।

'দেখলুম, দাদা আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন হাত ধরে।'

'নিয়ে যাচ্ছেন ?' চেঁচিয়ে উঠলেন জগন্নাথ।

'বলছেন, তুই আমার মত সন্ন্যেসী হ।'

'তুই কী বললি ?'

'আমি বললুম, আমি শিশু, আমি সন্ন্যেসীর কী বুঝি ? আমার বাবা-মা দুঃখী, ঘরে থেকেই আমি তাঁদের সেবা করব। তাতেই লক্ষ্মীজনার্দন খুশি হবেন।'

> 'আমি কহি—আমার অনাথ পিতা-মাতা।
> আমি বালক, সন্ন্যাসের কিবা জানি কথা॥
> গৃহস্থ হইয়া করিব পিতা-মাতার সেবন।
> ইহাতেই তুষ্ট হবেন লক্ষ্মীনারায়ণ॥'

কী সুন্দর কথা! মন-প্রাণ ভরে গেল শচীর। দাদা গেছেন, আমি থাকব তোমাদের কাছে-কাছে। থাকব চোখের তৃপ্তি হয়ে, হাতের লাঠি হয়ে। প্রার্থনাধিক প্রাপ্তি হয়ে।

'আর কী বললে বিশ্বরূপ ?' মার কণ্ঠে বিগলিত ব্যাকুলতা।

'বললে, বাবা-মাকে আমার কোটি-কোটি প্রণাম দিস।'

শচী প্রবোধ মানুক কিন্তু জগন্নাথ শান্ত হলেন না। এই স্বপ্ন বুঝি আরেক বিসর্জনের সঙ্কেত। মুখে যাই বলুক নিমাইও থাকবে না ঘরে, দাদার পদাঙ্ক ধরবে।

তেমনিই স্বপ্ন দেখলেন জগন্নাথ। বলছেন শচীকে, 'জানো স্বপ্ন দেখলাম নিমাই মাথা মুড়েছে, পরেছে অদ্ভুত সন্ন্যাসীবেশ। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে হাসছে কাঁদছে নাচছে পথ চলছে। নিমাইকে ঘিরে অদ্বৈত আচার্য ও অন্যান্য ভক্তরা কীর্তন করছে। নিমাই সকলের মাথায় পা তুলে দিচ্ছে, বসছে গিয়ে বিষ্ণুর খট্টায়। এ সব কী দেখলাম! নিমাইও বুঝি ছেড়ে যায় আমাদের।'

কথা গায়ে মাখল না শচী। বললে, 'এ ফাঁকা স্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়। তুমি নিমাইয়ের জন্যে চিন্তা কোরো না। ও ঘর ছাড়বার ছেলে নয়। কেমন মন দিয়ে পড়ছে দেখ। আমাকে কত ভালোবাসে! আমাকে ছাড়া ওর এক তিল সোয়াস্তি নেই। আমিই ওর সব চেয়ে বড় বান্ধব। ও আমার বাৎসল্যের অধীন।'

তবু জগন্নাথ নিশ্চিন্ত হতে পারছেন কই?

শুধু অকিঞ্চন হয়ে কৃষ্ণের শরণ নিই। কৃষ্ণই কৃতজ্ঞ, বদান্য আর সমর্থ। কৃষ্ণই দাতার শিরোমণি। এক পাতা তুলসী ও এক ফোঁটা জলের বিনিময়ে আত্মবিক্রয় পর্যন্ত করে দিতে পারে অনায়াসে। তাই কৃষ্ণভজন করি। কৃষ্ণোন্মুখ হয়ে থাকি।

নিমাই-ই নতুন কৃষ্ণ। একাধারে রাধাকৃষ্ণ।

কৃষ্ণই 'রসানাং রসতমঃ'। সর্বভূতমনোহর। 'যে রূপের এক কণ, ডুবায় যে ত্রিভুবন, সর্বপ্রাণী করে আকর্ষণ।' ত্রিজগন্মানসাকর্ষী মুরলীকলকূজিত। কৃষ্ণের তিনটি বাঁশি। বৈণবী, হৈমী আর মণিময়ী। যখন গরু চরায় তখন সহচর রাখালদের আনন্দ দেবার জন্যে বৈণবী বাজায়। যখন গোপীদের আকর্ষণ করবে তখন বাজায় হৈমী। আর মণিময়ী? যখন সম্মোহিত করবে ত্রিজগৎকে। যখন মত্ত ময়ূর নৃত্য করবে আনন্দে। কৃষ্ণসারগেহিনী হরিণী মুগ্ধ হয়ে ছুটোছুটি করবে, কখনো বা গাঢ় প্রণয়দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে থাকবে স্থির হয়ে। যখন স্তনক্ষরিত ফেনগ্রাস খেতে ভুলে যাবে গোবৎসেরা। প্রণতভারবিটপী ফলে-পুষ্পে মধুধারা বর্ষণ করবে। আবর্তছলে ভাবোচ্ছ্বাস জাগবে নদীতে। কৃষ্ণের তিন বাঁশি তাই আনন্দিনী, আকর্ষিণী আর সম্মোহিনী। যার আকর্ষণে বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মী পর্যন্ত আকৃষ্ট। 'যাঁর মাধুরীতে করে লক্ষ্মী-আকর্ষণ।' যার 'পীরিতি-ময় প্রতি অঙ্গ', যে 'কেবল রসনিরমাণ'। সৌভাগ্যের 'প্রং পদং', ভূষণেরও ভূষণস্বরূপ।

কৃষ্ণাঙ্গ মাধুর্যসিন্ধু। ক্ষীরোদকশায়ী। 'আমি ক্ষীরে ভাসি

দিবানিশি ক্ষীরোদবিহারী।' কৃষ্ণের রূপ অসমোর্ধ্ব, অসম আর অনূর্ধ্ব, অর্থাৎ এর সমানও কিছু নেই, অধিকও কিছু নেই। এ রূপ অনন্যসিদ্ধ, কোনো কৃত্রিম আভরণের ধার ধারে না। সকল-সৌন্দর্যসারসন্নিবেশ। এ রূপ অপরিকলিতপূর্ব। এমনটি আর দেখিনি কখনো, শুনিনি কখনো। যত দেখি ততই অদেখা থেকে যায়। নিজের মাধুরীতে কৃষ্ণের নিজেরও অতৃপ্তি। যেহেতু নিজের রূপ নিজে কৃষ্ণ সম্পূর্ণ আস্বাদন করতে পারছে না। 'দর্পণাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী। আস্বাদিতে লোভ হয় আস্বাদিতে নারি॥'

এই আস্বাদনের একমাত্র সামর্থ্য রাধিকার। মাদনাখ্য মহা-ভাবের যে অধিকারী। কে রাধিকা? যে আরাধনা করে সেই রাধিকা। যে গোবিন্দের আনন্দিনী। যে সর্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি। ভাবের পরমাকাষ্ঠা। যার প্রথম স্নান কারুণ্যামৃত-ধারায়, দ্বিতীয় স্নান তারুণ্যামৃতধারায়, তৃতীয় স্নান লাবণ্যামৃতধারায়। স্নানশেষে পরেছে কী! 'নিজলজ্জা শ্যাম পট্টশাড়ি পরিধান।' দ্বিতীয় বসন নেই? আছে। 'কৃষ্ণ-অনুরাগ-রক্ত দ্বিতীয় বসন।' বুক ঢেকেছে কী দিয়ে? প্রণয়-মান কঞ্চুলিকায়। অঙ্গানুলেপন করছে না? করছে বৈ কি। তবে তার উপাদান কী? নিজকান্তি কুঙ্কুম, সখীপ্রণয় চন্দন, আর অধরের হাসিটুকু কর্পূর। কৃষ্ণের উজ্জ্বল রসই মৃগমদ, তার কলেবরের চিত্রলেখা। প্রেমকুটিলতাই দুই চোখের কাজল, অনুরাগই অধরের অরুণিমা। চারু ললাটে সৌভাগ্যের তিলক, প্রেমবৈচিত্ত্যই বুকের মধ্যমণি। সর্ব অঙ্গে উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব—নির্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, গর্ব, আবেগ, জাড্য, ব্রীড়া, চিন্তা। কৃষ্ণনামগুণযশই কর্ণভূষণ। কৃষ্ণনামগুণযশই রসনার দীপ।

রাধিকাই একমাত্র দর্পণ, নির্মল সৎপ্রেমদর্পণ, যাতে কৃষ্ণমাধুর্য ঠিক-ঠিক প্রতিফলিত হতে পারে। আবার সেই প্রতিফলিত জ্যোতি কৃষ্ণে পড়ে কৃষ্ণমাধুর্যকে আরো মোহনীয় করে তোলে। 'মন্মাধুর্য রাধাপ্রেম—দোঁহে হোড় করি। ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দোঁহে কেহো নাহি

হারি।' যত পান তত পিপাসা। যত স্পৃহা তত প্রীতি। যত প্রেম তত মাধুর্য। যত মাধুর্য তত প্রেম। শুধু ইন্দ্রিয় থাকলেই কি দর্শন চলে? আর শুধু দর্শনেই কি আস্বাদন? চন্দ্র তো চিরমধুর, কিন্তু সেই মাধুর্য সেই পরিপূর্ণ আস্বাদন করতে পারে যার চোখে প্রেম আছে। যতটুকু প্রেম ততটুকুই ভোগ। কৃষ্ণ তো মধুরের সম্রাট, আর, কে এমন ব্রজবাসী আছে যে না ভালোবাসে কৃষ্ণকে? কিন্তু ব্রজবাসীদের ভালোবাসা আংশিক, পূর্ণতমের চেয়ে সব সময়েই কম। পূর্ণতম প্রেম একমাত্র রাধিকায়। রাধিকায়ই একমাত্র প্রৌঢ় নির্মল পরিপক্ক প্রেম, রাধিকায়ই কৃষ্ণ-মাধুর্য-আস্বাদনের পরিপূর্ণ অধিকার। রাধিকাই স্বাদশক্তিগরীয়সী।

দর্পণে নিজের মাধুরী দেখে কৃষ্ণের আবার ইচ্ছে হয় নিজেকে আস্বাদন করি। মানুষের এই ইচ্ছেই স্বাভাবিক যে আমার মাধুর্য অন্যে আস্বাদন করুক। কিন্তু কৃষ্ণের ইচ্ছা লোকাতীত। তার ইচ্ছা, আমার মাধুর্য আর সকলে আস্বাদন তো করবেই, আমিও করি। এই-ই স্বভাব, এই-ই স্বরূপগত ধর্ম কৃষ্ণমাধুরীর। আর সে পরিপূর্ণ আস্বাদন কি করে সম্ভব যদি না রাধাভাবে উদ্ভাসিত হই। তাই কৃষ্ণের রাধিকাস্বরূপ হবার উৎকণ্ঠা। কিন্তু রাধিকা হতে পারে না বলেই কৃষ্ণের খেদ। 'কৃষ্ণের মাধুরী কৃষ্ণে উপজায় লোভ। সম্যক আস্বাদিতে নারে, মনে রহে ক্ষোভ॥' কৃষ্ণে কই সেই রাধাভাব?

কৃষ্ণের ক্ষোভের নিবারণ হল শ্রীচৈতন্যে। হল স্বাদবাঞ্ছার পরিপূর্তি। রাধিকার ভাব আর কান্তি অঙ্গীকার করে অবতীর্ণ হল নবদ্বীপে।

> 'পিতামাতা গুরুগণ আগে অবতারি।
> রাধিকার ভাব বর্ণ অঙ্গীকার করি॥
> নবদ্বীপে শচী গর্ভ-শুদ্ধ দুগ্ধসিন্ধু।
> তাহাতে প্রকট হৈল কৃষ্ণ পূর্ণ-ইন্দু॥"

১০

দেখ পড়ায় কেমন মন আমাদের নিমাইয়ের। বাড়ির বার হয় না ছেলে। সারাক্ষণ বই মুখে করে বসে থাকে। বাবা-মায়ের চোখের আড়াল হয় না। লেগে থাকে ছায়ার মত।

বিশ্বরূপ একখানা পুঁথি রেখে গেছে তার জন্যে। বড় হয়ে পড়তে বলেছে। কবে বড় হবে না জানি। কবে সব বুঝবে দাদার মত।

যাবার আগে বিশ্বরূপ ডাকল মাকে। বললে, 'মা, এই পুঁথিখানা তোমার কাছে রাখো।'

'কেন বল তো ?'

'বড় হলে পড়তে দিও নিমাইকে।'

'সে কি,' অবাক হল শচী দেবী, 'তুই নিজেই তো দিতে পারবি। আমাকে টানছিস কেন ? তোর পুঁথি তোর কাছেই থাক।'

বিশ্বরূপ হাসল। বললে, 'আমি যদি দিতে পারি, ভালো কথা। কিন্তু ঘটনার স্রোত কখন কোন দিকে যায়, আগে-পরে কে কবে মরে-বাঁচে, কে বলতে পারে ? আমি বলছি, রেখে দাও তোমার কাছে।'

তখনো কিছু বোঝে নি শচী। রাখল ছেলের কথা। রাখল পুঁথি।

খাওয়ার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, নিমাইকে পাঠাল অদ্বৈতসভায়, দাদাকে ডেকে আনতে।

কিন্তু কোথায় বিশ্বরূপ ! এখানে ওখানে কোনোখানে সে নেই, নেই বুঝি বা সংসারসীমানায়। কান্নার রোল উঠল বাড়িতে। দাদা

নেই, নিমাই লুটিয়ে পড়ল ধুলোয়। আর নিমাই যখন কাঁদছে তখন আর সব ভুলে আগে নিমাইকে শান্ত করো। নিমাই-ই তো সর্বঋণের পরিশোধ।

এই একজন বিমুখ সংসারে কৃষ্ণনাম করছিল, নবদ্বীপে বলাবলি করছে সবাই, সেও ছেড়ে গেল আমাদের। বিশ্বরূপই যদি বনে যায় তা হলে আমরাও তার সঙ্গী হব। কী সুখ হল কৃষ্ণ-নামে, 'পাষণ্ডী'র দল যখন উপহাস করবে তখন সইবে না বাক্যজ্বালা। আমরাও তাহলে কৃষ্ণ-তৃষ্ণা ছেড়ে দেব। সংসারকেই সার মানব। বাড়াব না প্রহসন।

কিন্তু অদ্বৈত টলে না। জগন্নাথের আঙিনায় সে হরিনামের ধ্বনি তোলে। বলে, হরিতেই সমস্ত হরণের পরিপূরণ। সর্বশূন্যের পূর্ণায়ন।

অদ্বৈতের উৎসাহে আর সকলেও প্রাণ পায়। আশায় বুক বাঁধে। কণ্ঠের সুর মেলায়। হরিধ্বনির লহর তোলে।

শিশুদের সঙ্গে নিমাই খেলছিল বাইরে, হঠাৎ খেলা বন্ধ করে বলে উঠল : 'আমাকে ডাকছে বাড়িতে!'

'তোকে আবার কখন ডাকল?' সঙ্গীরা আপত্তি করল।

'হ্যাঁ, ঐ যে, পাচ্ছিস না শুনতে?' ব্যস্ত হয়ে ছুট দিল নিমাই।

নিমাইকে ছুটে আসতে দেখে সবাই উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করলে : 'কি রে, কী হয়েছে? কী চাই? আসছিস কেন হন্তদন্ত হয়ে?'

'বা রে, আমাকে ডাকলে যে তোমরা।' নিমাই তাকাতে লাগল চারদিকে।

'না তো, তোমাকে ডাকি নি তো কেউ। সবাই মিলে হরিকীর্তন করছিলাম।'

'ও, ডাকো নি বুঝি।' নিমাই আবার ছুটে চলে গেল খেলা-স্থলে।

যাকে ডাকছে সে কে, নিমাই-ই বুঝি বুঝতে দিতে চায় না।

'নাম-সঙ্কীর্তন কলৌ পরম উপায়।' অনেকে একত্র হয়ে স্ফুট-কণ্ঠে কৃষ্ণনাম করাই কি শুধু সঙ্কীর্তন? না। একলা বসে সম্যক কীর্তনও সঙ্কীর্তন। সম্যক কীর্তন কী? স্পষ্ট স্বরে নামের যথার্থ উচ্চারণই সম্যক কীর্তন। তাই সজনেই হোক, নির্জনেই হোক, দলবদ্ধ হয়েই হোক বা একাকীই হোক, যখনই নাম করবে শব্দ করে করবে। শব্দেই গাঢ় হবে অভিনিবেশ। দূরে যাবে চিত্ত-বিক্ষেপের সম্ভাবনা। সংযত হবে বাগিন্দ্রিয়। আর কে না জানে রসনাই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের চালক। রসনা বশীভূত হলেই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রশমন। তাই উচ্চঘোষে নাম করো। অনুচ্চে বা নীরবে নাম করলে কি ফল হবে না? আর সব ফল হবে, শুধু প্রেম জাগবে না। নীরবে কি প্রেমসম্ভাষণ হয়? নৈঃশব্দ্য কি জাগাতে পারে প্রতিধ্বনি? তা ছাড়া উচ্চস্বর কীর্তনেই তো হতে পারে পরসেবা। বাঘের সঙ্গে নাচতে পারে হরিণ, সাপের সঙ্গে ময়ূর। পরস্পরকে চুম্বন করতে পারে। হরিদাসের ঘরের দুয়ারে বসে বেশ্যা হতে পারে বৈষ্ণবী।

প্রতিদিন একলক্ষ নাম উচ্চস্বরে কীর্তন করে হরিদাস। লক্ষহীরা তাকে ভ্রষ্ট করতে এসেছে, ব্যক্ত করেছে তার যৌবনের অভিলাষ। হরিদাস বলছে, অপেক্ষা করো, আমার নাম-সঙ্কীর্তন আগে শেষ হোক। তুমি ততক্ষণ বসে শোনো এই নামধ্বনি। নাম শেষ হলে তুমি যা চাও তাই হবে।

'হরিদাস কহে—তোমা করিব অঙ্গীকার।
সংখ্যানাম-সমাপ্তি যাবৎ না হয় আমার॥
তাবৎ তুমি বসি শুন নাম-সঙ্কীর্তন।
নামসমাপ্তি হৈলে করিব যে তোমার মন॥'

নাম শোনবার পর তোমার যা মনে হয়, অর্থাৎ তখন তোমার মনে যে বাসনা আসে তা চরিতার্থ করব। নাম শুনতে-শুনতে প্রস্তর দ্রবীভূত হল, সংখ্যাপূরণের পর লক্ষহীরার মনে জাগল শ্রীকৃষ্ণসেবার

বাসনা। 'তুলসীকে ঠাকুরকে দণ্ডবৎ করি। দ্বারে বসি নাম শুনে—বোলে হরি-হরি ॥'

নামই পূর্ণতা-দাতা। নববিধা ভক্তির জনয়িতাও নাম। সর্ববেদ, সর্বতীর্থ, সর্বসৎকর্ম থেকেও নামের মাহাত্ম্য অধিক। নামই পরম উপায়।

পড়ায় খুব মন দিয়েছে নিমাই। যা পড়ে তাই মনে রাখে, শোনামাত্রই সমস্ত প্রচ্ছন্ন অর্থ প্রকটিত করে। এমন সুবুদ্ধি শিশু আর দেখিনি কোথাও, পণ্ডিত-ছাত্র সবাই বলে একবাক্যে, বলে, বিদ্যায় এ বৃহস্পতিকে অতিক্রম করবে।

দেখে-শুনে শচী খুব খুশি। কিন্তু জগন্নাথ বিষাদগম্ভীর। বলেন, বিশ্বরূপেরও এমনি মতি ছিল অধ্যয়নে। সমস্ত শাস্ত্রপাঠ শেষ করে শেষ পর্যন্ত এই শিখল, সংসারে তিলমাত্র সত্য নেই, আর তাই জেনে বিষয়সুখ তুচ্ছ করলে। তোমার এই ছেলেও বিদ্যার অমনি ব্যাখ্যা করবে, সংসার ছেড়ে চলে যাবে অরণ্যে। সুতরাং ওর আর পড়ে কাজ নেই।

'মূর্খ হয়ে থাকবে?' শচী আরেক রকম ভয় দেখল।

'তবু ঘরে তো থাকবে। থাকবে তো চোখের উপর।' বললেন জগন্নাথ।

'কিন্তু মূর্খ হয়ে থাকলে ওকে খাওয়াবে কে?' শচীর আরেক রকম নালিশ।

'যে সকলের পোষণ-পালন করছে সেই কৃষ্ণ খাওয়াবে। এই আমাকেই তো দেখছ। এত বিদ্যার্জন করেও কেন এত দারিদ্র্য? আর দেখ, যে ভালোমত বর্ণ উচ্চারণ করতে পারে না তার দুয়ারে সহস্র পণ্ডিতের ভিড়। বিদ্যায় কিছু হবে না, যদি হয় তো হবে গোবিন্দের আনন্দে।'

আঁচলে চোখ ঝাঁপল শচী: 'মূর্খ হয়ে থাকলে কেউ তো কন্যা দেবে না নিমাইকে।'

'কপালে কৃষ্ণ যেমন লিখেছে, মূর্খ ই হোক আর পণ্ডিতই হোক, ঠিক তেমনটি জুটে যাবে আপনা-আপনি। কৃষ্ণকৃপা ছাড়া কিছুই হবার নয়। দৈন্যহীন জীবন আর কষ্টহীন মৃত্যু—তাও কৃষ্ণকৃপায়। ধনে-পুত্রেই বা কি হবে যদি কৃষ্ণ-আজ্ঞা কৃষ্ণ-ইচ্ছা না থাকে? সুতরাং চিন্তা করে লাভ নেই, কৃষ্ণই একা চিন্তাকর্তা। ডাকো নিমাইকে।'

ছ' বছরের শিশু, নিমাই কাছে এসে দাঁড়াল।

নির্মম শোনাল জগন্নাথকে। বললেন, 'আজ থেকে তোমার পড়া বন্ধ। পাঠশালা বন্ধ। বুঝলে? যেতে পারবে না আর গুরুর কাছে, পুঁথিপত্তর সব ফেলে দিয়ে এস গঙ্গায়।'

কাতর চোখে তাকিয়ে রইল নিমাই।

জগন্নাথ দমলেন না এতটুকু। কঠোর স্বরে বললেন, 'না, কিছুতে না। বিদ্যাই একজনের কাল হয়েছে। আর নয়। আমার মূর্খ পুত্রই ভালো।'

যথা আজ্ঞা। বিদ্যারসে ভঙ্গ দিয়ে খেলা নিয়ে মাতল নিমাই। দাদার শোকে একটু সংবৃত হয়েছিল, আবার উদ্ধত হয়ে উঠল। শুধু দিনমানে নয়, রাত্রেও চলল তার চাপল্য। সন্ধ্যে হয়ে গেল, বাড়ি ফিরবি নে নিমাই? আমার কি আর পড়া আছে যে বাড়ি ফিরব? আমার কি আর বই নিয়ে বসা আছে? তার চেয়ে গায়ে কম্বল-মুড়ি দিয়ে ষাঁড় সাজি, এ-বাড়ি ও-বাড়ি জিনিসপত্র ভেঙে দিয়ে আসি, পড়শির কলাবনে ঢুকে তাণ্ডব লাগাই। এ কী মূর্খের মত ব্যবহার! মূর্খ করে রেখেছ, ব্যবহার কি তবে অন্য রকম হবে?

আঁস্তাকুড়ে ঢুকেছে নিমাই। এঁটো হাঁড়ি পর-পর সাজিয়ে সিংহাসন করে বসেছে। গৌর-অঙ্গে মেখেছে হাঁড়ির কালি। সঙ্গীরা ছুটে গিয়ে খবর দিয়েছে শচীকে। দেখবে এস নিমাইয়ের কীর্তি।

হায়-হায় করে ছুটে এসেছে শচী। এ তুই করেছিস কী? এ তুই কোথায় এসে বসেছিস?

'আমি তার কী জানি!' নিমাই বলছে গম্ভীরমুখে, 'আমি তো

মূর্খ। আমার কি ভদ্রাভদ্রের জ্ঞান আছে? আমি কি জানি স্থানের ভালো-মন্দ? আমার কাছে সব জায়গাই সমান।'

'ছি ছি', ধিক্কার দিয়ে উঠল শচী, 'তা বলে তুই এঁটো-ঝুঁটো মানবি নে? আবর্জনা ফেলবার অপবিত্র স্থানে গিয়ে বসবি?'

নিমাই বললে, 'আমি যেখানে বসি সে স্থান কি অপবিত্র?'

'প্রভু বলে, মাতা! তুমি বড় শিশুমতি।
অপবিত্র স্থানে কভু নহে মোর স্থিতি॥
যথা মোর স্থিতি সেই সর্বপুণ্য স্থান।
গঙ্গা আদি সর্বতীর্থ তহিঁ অধিষ্ঠান॥'

'শিগগির উঠে আয় বলছি।' তাড়না করল শচী, 'স্নান করে আয় গঙ্গায়।'

নিমাই গ্রাহ্যও করল না।

'তোর বাবা দেখতে পেলে কী বলবেন বল তো?' শচীর কণ্ঠে এবার অনুনয় ঝরল: 'লক্ষ্মী মাণিক আমার, উঠে আয়।'

'তা হলে বলো আমাকে পড়তে দেবে? যেতে দেবে পাঠশালায়?' দুষ্টু হাসিতে নিমাইয়ের দু'চোখ ঝিলিক দিয়ে উঠল।

বহু লোক জড়ো হয়েছে ইতিমধ্যে। দেখছে মা-ছেলের কাণ্ড। বাপের কাছে খবর পাঠিয়েছে।

'সত্যিই তো কেন পড়তে দেবে না? এ কোন শত্রু পরামর্শ দিল যে ছেলেকে মূর্খ করে রাখতে হবে?' সকলে গঞ্জনা দিল শচীকে। জগন্নাথ এসে পড়লে জগন্নাথকে বললে, 'কত বড় ভাগ্য তোমাদের, ছেলে নিজের থেকেই পড়তে চায়। এমনটি আর মেলে কোথায়? সেই ছেলের মনে ব্যথা দিয়ে লাভ কি? যা করবেন কৃষ্ণ করবেন! যদি কাউকে তিনি নিয়ে যেতে চান মূর্খ বলে নিরস্ত হবেন না।'

সকলে পিড়াপিড়ি করতে লাগল জগন্নাথকে। পড়তে দাও ছেলেকে। ছেড়ে দাও কৃষ্ণের হাতে।

কৃষ্ণই মূল কারণ। আর প্রকৃতি? প্রকৃতি গৌণ কারণ। ঘটের

মূল কারণ কুম্ভকার। গৌণ কারণ চক্র-দণ্ড। অগ্নিস্পর্শে লৌহ তপ্ত হয়ে যদি দগ্ধ করে তবে সেই দাহের মূল শক্তি অগ্নি, গৌণ শক্তি লৌহ। তাই কৃষ্ণই আদিপুরুষ, প্রকৃতি তার মায়া, নিমিত্ত-কারণ। কী রকম কারণ? 'প্রকৃতি কারণ যৈছে অজাগলস্তন।' কোনো কোনো ছাগীর গলায় স্তনের মত মাংসপিণ্ড ঝোলে। দেখতে স্তনের মত হলেও তাতে দুধ জমে না। অজাগলস্তন যেমন তাই সত্যিকার স্তন নয় তেমনি প্রকৃতিও জগতের বাস্তব কারণ নয়। বাস্তব কারণ কৃষ্ণ। সবই কৃষ্ণশক্তিপ্রস্ফুরিত। সব তাই অর্পণ করো কৃষ্ণকে।

জগন্নাথ বললেন, 'উঠে আয়। এবার থেকে দেব তোকে পড়তে।'

বর্জিত হাঁড়ির রাজসভা থেকে হাসিমুখে উঠে এল নিমাই। গঙ্গাদাসের পাঠশালায় আবার পড়তে গেল।

ব্যাকরণের অধ্যাপক, গঙ্গাদাস হিমসিম খাচ্ছে নিমাইকে নিয়ে। গুরু যাই ব্যাখ্যা করে তাই খণ্ডন করে নিমাই, আর যখন খণ্ড-বিখণ্ড হয়েছে গঙ্গাদাস তখন আবার সেই মূল ব্যাখ্যা স্থাপন করে।

বিদ্যা-ব্যাখ্যা শুধু পাঠশালাতেই নয়, ঘরে-বাইরে, স্নান করতে এসে চালায় গঙ্গার ঘাটে-ঘাটে। প্রতি ঘাটে সাঁতার কেটে এসে উপস্থিত হয় আর ব্যাকরণের বিশেষ কোনো সূত্র বা টীকা ধরে কলহ করে। কোনো দ্বন্দ্বেই গৌরচন্দ্রের সঙ্গে কেউ এঁটে ওঠে না। খণ্ডন করেছ কি, স্থাপন করি ; স্থাপন করেছ কি, ছেদন করি। আমি শুধু ছেদনে-কর্তনে নই, আমি আবার আরোপে-প্রতিষ্ঠায়।

গঙ্গার বড় ক্ষোভ ছিল, কৃষ্ণ শুধু যমুনাতেই লীলা-বিহার করেছে। ঈর্ষা ছিল যমুনার প্রতি। গঙ্গার সেই ক্ষোভ মিটিয়ে দিল গৌরহরি। নূতনতর লীলা করল। শুধু কৃষ্ণলীলা নয়, যুগলিত রাধাকৃষ্ণের লীলা। এক দেহে দুই প্রেম। এক ডুবে দুই স্নান।

এবার তবে পৈতে দাও ছেলের। দিনক্ষণ ঠিক করো।

উৎসবের আয়োজন করলেন জগন্নাথ। মৃদঙ্গ-সানাই বাজতে লাগল, বিপ্রগণ শুরু করল বেদপাঠ। গৌরাঙ্গ আজ শ্রীঅঙ্গে যজ্ঞসূত্র

ধরবে, হাতে দণ্ড, কাঁধে ঝুলি, ভিক্ষেয় বেরুবে ঘরে-ঘরে। এস তোমরা দেখবে এস। বামনরূপ ধরবে আজ গৌরচন্দ্র।

বামনের মধ্যে বলি বিশ্বরূপ দেখল। দেখল হরির পদদ্বয়ে ধরণী, পদতলে রসাতল। নাভিতে আকাশ, জঙ্ঘাযুগলে পর্বতনিকর, কুক্ষিদেশে সপ্তসমুদ্র, বক্ষঃস্থলে নক্ষত্রনিচয়, হৃদয়ে ধর্ম, স্তনদ্বয়ে ঋত ও সত্য, মনে চন্দ্র, কণ্ঠে সামবেদ, বাহুচতুষ্টয়ে দেবমণ্ডলী, কর্ণযুগলে দিক, শিরে স্বর্গ, কেশে মেঘ, নাসিকায় বায়ু, দুই চক্ষে সূর্য, বদনে অগ্নি, রসনায় বরুণ, ভ্রূদ্বয়ে অধর্ম, পাদন্যাসে যজ্ঞ, ছায়াতে মৃত্যু, হাস্যে মায়া, শিরায় নদী, নখে শিলা আর রোমে ওষধি। বামন বলল, হে অসুরবর, তুমি আমাকে ত্রিপাদপরিমিত ভূমি দিয়েছ, আমি দুই পদবিন্যাসে সমগ্র পৃথিবী আক্রমণ করেছি, এখন তৃতীয় পদের জন্যে ভূমি নির্দেশ করো। গুরু শুক্রাচার্য দ্বারা তিরস্কৃত হয়েও সুব্রত বলি সত্য পরিত্যাগ করে নি, বললে, আমার মাথায় আপনি তৃতীয় পা রাখুন। 'পদং তৃতীয়ং কুরু শীর্ষ্ণি মে নিজম্।'

নিমাইয়ের মস্তকমুণ্ডন হল, পরল রক্তবস্ত্র। জগন্নাথ ছেলের কানে গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারণ করলেন। এ কী অঘটন! মন্ত্র শুনে নিমাই হুঙ্কার দিয়ে উঠল, পড়ে গেল মূর্ছিত হয়ে। সমস্ত দেহ পুলকে শিহরিত হচ্ছে, বিতরণ করছে উদ্দীপ্ত তেজ আর দুই চোখে নেমেছে অকূল শ্রাবণ। সকলের পরিচর্যায় যখন বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল নিমাইয়ের, তখন তার সে কী গম্ভীর মূর্তি! এ যেন তখন নতুন আরেক মানুষ, যেন এ জগতের কেউ নয়। ন' বছরের ছেলে তখন নিমাই, কিন্তু তার দেহে যে নতুন মানুষের আবেশ এসেছে, তাকে চিনতে কারুর ভুল হয়নি। 'চৈতন্যসিংহের নবদ্বীপ অবতার। সিংহগ্রীব সিংহবীর্য সিংহের হুঙ্কার॥' গৌরদেহে শ্রীহরির আবির্ভাব হয়েছে! সুতরাং এর নাম হোক গৌরহরি। গৌররায়।

হে কৃষ্ণ, জানি না তুমি কোথায়, জগন্নাথ প্রার্থনা করতে লাগলেন, আমার পুত্রের প্রতি রেখো তোমার শুভদৃষ্টি। কন্দর্পজয়ী

এর রূপ, দেখো ডাকিনী-দানবেরা যেন বশ করতে না পারে তাকে। আর যে ছেলে সর্বদা তোমাকে দেখে তোমাকে ডেকে খুশি, তার যেন না কোনো অমঙ্গল হয়।

প্রার্থনা শুনে মনে মনে হাসল বুঝি নিমাই।

হঠাৎ জ্ঞানীগুরুর মত গম্ভীর স্বরে মাকে ডাকল তার কাছটিতে। ভয়ে ভয়ে দাঁড়াল এসে শচী। এ যেন তার বালকপুত্র নয়, যেন কোন পরাক্রান্ত পুরুষ। শাসনশাণিত স্বরে বললে, 'মা, তুমি একাদশীর দিন ভাত খাও কেন? খাবে না ভাত।'

'খাব না।' অপরাধীর মত বললে শচী, অনুজ্ঞা পালনের ভঙ্গিতে।

'আর,' আরো বললে নিমাই, 'শোনো, এ দেহ আমি ত্যাগ করলাম এ মুহূর্তে, চললাম গৃহ ছেড়ে। যে দেহ রইল সে তোমার পুত্র, তাকে স্নেহ-যত্নে পালন কোরো। সময় হলে আমি আবার আসব, আবার দেখবে আমাকে সকলে।'

নিমাই আবার মূর্ছিত হয়ে পড়ল। জলসেকে আবার তার চেতনা ফিরে এলে সকলে দেখল, সে চণ্ডতেজ দেবাবেশ আর তাতে নেই, এ নিমাই আবার সেই সন্তান-নিমাই। সেই নিতলশীতল নবনীকোমল লাবণ্যপুঞ্জ।

'কী বলছিলি বল তো?' জগন্নাথ মনে করিয়ে দিতে চাইলেন।

'কী বলছিলাম?'

'বলছিলি, এ দেহ ছেড়ে চলে যাচ্ছি, যে রইল সে তোমার পুত্র, তাকে তোমরা দেখো।'

'কই! কখন?' বিস্ময় মানল নিমাই: 'আমি আবার কী বললাম!'

হে গোবিন্দ, নিমাই আমার ঘরে থাক, নিমাই আমার গৃহস্থ হোক। তার যত্নের আমরা ত্রুটি করব না। প্রাণপণ পরিচর্যা করব। পাখার উত্তাপের আড়ালে রাখব তাকে সন্তর্পণে।

'এ কি, এ প্রার্থনা করছ কেন?' শচী শুনতে পেয়েছে স্বামীর কাতরতা।

'জানো, দুঃস্বপন দেখেছি।'

'কী দুঃস্বপন?' শচীর মুখ কালো হয়ে উঠল।

'দেখলাম নিমাই শিখার মুণ্ডন করেছে, ধরেছে সন্ন্যাসীবেশ। সব সময়ে কৃষ্ণ বলে হাসছে কাঁদছে চলছে নাচছে। দলে দলে লোক চলেছে পিছে-পিছে, অদ্বৈত আচার্য পর্যন্ত, সুরে সুর মিলিয়ে চলেছে। সে সুর আকাশ ছুঁয়েছে, ছুঁয়েছে দিক্‌দিগন্ত। সকলের মাথায় পা তুলে দিচ্ছে নিমাই, অদ্বৈতের মাথায় পর্যন্ত, বসছে গিয়ে বিষ্ণুর সিংহাসনে। এ কী দেখলাম!'

শচী দেবী আশ্বস্ত করতে চাইল। বললে, 'এ স্বপ্নমাত্র। এ কখনো ফলবার নয়। পুঁথি ছাড়া নিমাইয়ের আর কোনো মতি নেই, রুচি নেই। ঘরের বাইরে জানে না সে পথ-প্রান্তর। বিদ্যারসভাবই তার একমাত্র বস্তু, একমাত্র ধর্ম। তুমি চিন্তা কোরো না। নিমাই আমার ঘরের ভিত্তি, আমার অন্নের স্বাদ, আমার চক্ষের তারা। আমার দেহের মেরুদণ্ড। আমাকে ছেড়ে যাবে না এক পা।'

১১

সামান্য ক'দিনের অসুখে জগন্নাথ মারা গেলেন।

শোকে মূর্ছিত হয়ে পড়ল শচী।

নিমাই বললে, 'মা, চোখ চাও। আমাকে দেখ। আমি যত দিন আছি তত দিন তোমার সব আছে। তুমি কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলো। হরি-হরি বলো।'

হরি শব্দের দুই মুখ্য অর্থ। এক, সর্ব-অমঙ্গল হরণ করে;

তুই, প্রেমে মনোহরণ করে। আর কৃষ্ণনাম? 'কোটি অশ্বমেধ এক কৃষ্ণনামসম।' অশ্বমেধযজ্ঞের ফল কী? সর্বপাপবিনাশ। কিন্তু সর্বকর্ম অনুষ্ঠানেই ত্রুটিবিচ্যুতির ভয়, উচ্চারণে স্বরভ্রংশের ত্রুটি, নিয়মে ক্রমভঙ্গের ত্রুটি, দেশকালপাত্র প্রসঙ্গে বস্তু ও দক্ষিণাদির ত্রুটি। সমস্ত ত্রুটির প্রতিকারের উদ্দেশে 'অচ্ছিদ্র-মন্ত্র' পাঠের নির্দেশ। এই অচ্ছিদ্র-মন্ত্র আর কিছু নয়, হরিনাম-সঙ্কীর্তন। 'মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রং দেশকালার্হবস্তুতঃ। সর্বং করোতি নিশ্ছিদ্রং নাম-সঙ্কীর্তনং তব॥' নামের ফল শুধু পাপনাশ নয়। আরো আছে। নামের ফল চিত্তে প্রেমের আবির্ভাব। আর প্রেমের আবির্ভাবে সাত্ত্বিক ভাবের প্রকাশ। সাত্ত্বিক ভাব আট রকম। স্বেদ, কম্প, রোমাঞ্চ, অশ্রু, স্বরভেদ, বৈবর্ণ্য, স্তম্ভ আর প্রলয়। তাছাড়া আর কী লাভ? 'অনায়াসে ভবক্ষয় কৃষ্ণের সেবন। এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন॥' প্রেমের উদয়ে ঘুচে যায় সংসারবন্ধন, দূরে যায় দুর্বাসনা। একমাত্র কামই তো হৃদ্‌রোগ, নামে সেই রোগের অন্তর্ধান।

কল্মষ কী? ভক্তিবিরোধী কর্মই কল্মষ। যে কর্মের উদ্দেশ্য শুধু আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি তাই ভক্তি-বিরোধী। হয় পার্থিব ভোগ দাও, নয় স্বর্গ দাও, নয় বা মোক্ষ, এই কামনায়ই তো ধর্মানুষ্ঠান। তাৎপর্য স্বসুখসাধন বা স্বদুঃখনিবৃত্তি। যতক্ষণ মনে ভুক্তি-মুক্তির স্পৃহা, ততক্ষণ ভক্তি নেই। ভক্তি তো আত্মসুখ নয়, কৃষ্ণসুখ। ভক্তি তো আত্মপ্রীতি নয়, কৃষ্ণপ্রীতি। ভজ্ ধাতু থেকে ভক্তির উৎপত্তি। আর ভজ্ ধাতুর অর্থ সেবা। সেবার উদ্দেশ্য শুধু সেব্যের প্রীতিসাধন। সুতরাং ভক্তি মানে কৃষ্ণকে সুখী করা। কিসে কৃষ্ণ সুখী? মমত্ব-বুদ্ধিতে। কৃষ্ণ আমারই একলার, আমি ছাড়া কৃষ্ণের কেউ নেই। কৃষ্ণ আমারই লাল্য, পাল্য, অনুগ্রাহ্য। আমার লালন-পালন-অনুগ্রহের বস্তু। কৃষ্ণে আমার ঐশ্বর্যজ্ঞান নেই, না বা স্বসুখবাসনা। শুধু প্রেমাত্মিকা সেবা। ভক্তপক্ষপাতিত্বই ভগবানের গুণ।

'আমার দিকে তাকাও।'

> 'বাহু তুলি হরি বলি প্রেমদৃষ্টে চায়।
> করিয়া কল্মষ-নাশ প্রেমেতে ভাসায়॥'

মন্দ-মন্দ হাসি নিমাইয়ের কটাক্ষে আর সেই দৃষ্টি যার উপর গিয়ে পড়ে তার সর্বশোক দূরে পালায়। শোকের মূলই হচ্ছে কল্মষ। সে কল্মষ, সে ভক্তিবিরোধী কর্মের বাসনা বিধ্বস্ত হয়। আর তার তখন ব্রজপ্রেমে নিমজ্জন। গৌরের কথা বলবে কী, বলতে উদ্যোগ করা মাত্রই, কুশল-পটলী অর্থাৎ সর্ববিধ মঙ্গলের অভ্যুদয় ঘটবে।

> 'শুন মাতা! মনে কিছু না চিন্তিহ তুমি।
> সকল তোমার আছে যদি আছি আমি॥
> ব্রহ্মা-মহেশ্বরের যে দুর্লভ লোকে বলে।
> তাহা আমি তোমারে আনিঞা দিব হেলে॥'

কিন্তু ক্রোধে একেবারে তপ্ত তাণ্ডব। সংসারের অবস্থা বুঝতে চায় না, একটা জিনিসের আবদার করেছে কি, তখুনি তা মেটানো চাই। নইলে ঘর-দুয়ার-ভাঙা ঝড়ের আকার ধারণ করবে নিমাই।

গঙ্গাস্নান করতে যাচ্ছে, মাকে বললে, 'মা, মালা-চন্দন দাও। গঙ্গাপূজা করব।'

প্রমাদ গণল শচী। বললে, 'বাবা, একটু অপেক্ষা কর, মালা নিয়ে আসি!'

'নিয়ে আসি! এখন তুমি আনতে যাবে?' নিমাই, এগারো-বারো বছরের ছেলে, রুদ্রমূর্তি ধারণ করল: 'এতক্ষণ আনোনি কেন? কী করছিলে ঘরে বসে?'

দ্রুত শব্দে ঘরে ঢুকল নিমাই। যত গঙ্গাজলের কলসী ছিল একের পর এক ভাঙতে লাগল। ছোট-বড় যত ঘট ছিল ঘরে, কোনোটার মধ্যে বা তেল নুন বা ঘি, সকলের গায়ে মারতে লাগল লাঠির বাড়ি। যত শিকা ছিল, বড়ি বা মশলাপাতির, সব ছিঁড়তে

লাগল টেনে-টেনে। শুধু শিকা নয় হাতের কাছে যত কাপড় পেল একটাও আস্ত রাখল না। তারপর আর যখন ভাঙবার জিনিস নেই তখন আক্রোশ গিয়ে পড়ল খোদ ঘরের উপর, তার দরজা-জানলার উপর। ঘর-দোর ভেঙেও ঠাণ্ডা হল না। সামনে যে গাছ ছিল তাকেই পিটতে লাগল নির্মমের মত। গাছ গেছে, এবার মাটিকে প্রহার করো। লাঠির ঘায়ে জর্জর হল পৃথিবী।

জননী শচী ভয় পেয়ে গৃহের উপান্তে গিয়ে লুকোল।

ভঙ্গন-যজ্ঞ সাঙ্গ করে নিমাই দাঁড়াল অঙ্গনে। অতৃপ্ত রোষে ধূলোয় গড়াগড়ি খেতে লাগল। কনকঅঙ্গ কালি হয়ে গেল মুহূর্তে। বৈকুণ্ঠপতি ধরিত্রীকে শয্যা করলেন।

'চারিবেদে যে প্রভুরে করে অন্বেষণ।
সে প্রভু যায়েন নিদ্রা শচীর অঙ্গন॥'

শচী মালা আনাল। নিদ্রিত পুত্রের শ্রীঅঙ্গে হাত রেখে ধীরস্বরে বললে, 'ওঠ বাপ ওঠ, এই ছাখ মালা এসেছে। যা এবার গিয়ে ইচ্ছেমত পুজো কর।'

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল নিমাই। ছি ছি, ঘরদোরের এ কী হাল করেছি! লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চাইল।

শচী বললে, 'বেশ হয়েছে, ভালো হয়েছে। তোর আপদ-বালাই কেটে গেছে।'

'ভাল হইল বাপ! যত ফেলিলা ভাঙ্গিয়া।
যাউক তোমার সব বালাই লইয়া॥'

সংসারের এত অযথা অপচয় করল নিমাই, তবু জননীর আপশোষ নেই। ক্রীড়াময় চঞ্চল বালকের জন্যে আবার রান্নার আয়োজন চলল। গোকুলনগরের যশোদাকে কত সহ্য করতে হয়েছিল কৃষ্ণ-চাপল্য। আমিও সহ্য করি।

গঙ্গাস্নান করে বাড়ি ফিরল নিমাই। তুলসী-জল দিয়ে বিষ্ণুপূজা করল। খেয়ে-দেয়ে হৃষ্টমনে পান চিবুতে বসল।

শচী কাছে এসে ভয়ে ভয়ে বললে, 'ঘরের জিনিসপত্র নষ্ট করে লাভ কি ? এ সব তো তোমার নিজের জিনিস। নিজের জিনিস কি কেউ নষ্ট করে ?'

মৃদু-মৃদু হাসতে লাগল নিমাই।

'ঘরে আর কিছু নেই, কাল খাবে কি ?'

'কৃষ্ণ খাওয়াবেন।'

'প্রভু বলে কৃষ্ণ পোষ্টা করিবে পোষণ।'

সন্ধ্যের দিকে মাকে নিভৃতে ডাকল নিমাই। দু' তোলা সোনা মার হাতে দিয়ে বললে, 'কৃষ্ণ পাঠিয়ে দিলেন। এ দিয়ে যত দিন চলে, সংসার খরচ করো।'

'সে কি !' অবাক হয়ে গেল শচী : 'এ সোনা তুই কোথায় পেলি ?'

নিমাই উত্তর করে না। পাশ কাটিয়ে চলে যায় হাসতে-হাসতে।

এ কি বিপদের মধ্যে এনে ফেলল। শুধু একবার নয়, যখনই অভাব হয় সংসারে, সম্বলসঙ্কোচ হয়, নিমাই সোনা নিয়ে আসে। কার সোনা কোথা থেকে আনে কে বলবে ! ধার করে, না, এ কি কোনো অমানুষী বিভূতি ! ভাঙাতে ভয় পায় শচী। কিন্তু না ভাঙালেই চলবে কেন ? যাকে সোনা দিয়ে পাঠায় বাজারে, তাকে বলে দেয়, পাঁচ-দশ ঠাঁই দেখিয়ে-শুধিয়ে তবে ভাঙাবি। আমার ভারি ভয় করছে।

ভয়ের কিছু নেই, নিমাইই সব ধরে আছে, আচ্ছাদন করে আছে।

ইন্দ্রযজ্ঞ বন্ধ করে দিল কৃষ্ণ। মহেন্দ্রঃ কিং করিষ্যতি ? জীবের পালন-পোষণের ব্যাপারে ইন্দ্র কী করবে ? সুতরাং ভয় পেয়ে ইন্দ্রকে পুজো করবার কোনো প্রয়োজন নেই। স্বয়ং ঈশ্বর বলে ইন্দ্রের গর্ব, তাই কৃষ্ণাধীন গোপেদের উপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হল দেবরাজ। প্রলয়ঙ্কর মেঘসমূহকে আদেশ করল, প্রবল বেগে বর্ষণ

করো, বিধ্বস্ত করো গোপরাজ্য। বাচাল বালক, অবিনীত, পণ্ডিত-মানী, অজ্ঞ, মর্ত্য কৃষ্ণকে অবলম্বন করে গোপেরা আমার পূজা বন্ধ করেছে, এ অপমান অসহ্য। বনবাসী গোপের ধনৈশ্বর্য্য বেশি হয়েছে বুঝি ? ওদের ঐশ্বর্য্যমদ নিশ্চিহ্ন করে দাও।

মেঘসমূহ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ছুটে এল দিগ্বিদিক ছেয়ে। ছুটে এল প্রচণ্ড প্রভঞ্জন। বিদ্যুন্মালায় উজ্জ্বলীকৃত হয়ে ছুটে এল বজ্র। জল আর শিলা ঝরতে লাগল অবিচ্ছেদে। গোপগোপীরা প্রথমে গৃহমধ্যে আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষা করতে চেষ্টা করল কিন্তু ক্রমে সমস্ত পৃথিবী পরিপ্লাবিত হলে, উচ্চাবচ সমস্ত স্থান একাকার হয়ে গেলে, তারা বাতে ও শীতে কাঁপতে কাঁপতে কৃষ্ণের শরণাপন্ন হল। বলতে লাগল, 'হে কৃষ্ণ, হে মহাভাগ, হে ভক্তবৎসল, কুপিত ইন্দ্রের থেকে এখন আমাদের রক্ষা করা তোমারই কর্তব্য। আমরা ইন্দ্রের যজ্ঞ হতে দিইনি, তাই ইন্দ্র আমাদের ধ্বংস করতে অকালপ্রবৃত্ত হয়েছে, তাই এই অত্যুগ্র অতিবাতসহ শিলা-জল বর্ষণ।'

কৃষ্ণ অভয় দিল সকলকে। 'আমি নিজ ক্ষমতায় এর প্রতিকার করব। যে সব দেবতার সদ্ভক্তি আছে তারা গর্বভরে কখনো নিজেদের ঈশ্বর বলে ভাবে না। কিন্তু ইন্দ্রের মোহ জন্মেছে। আমি অভিমান ভঙ্গ করি, অসাধুর তাতে বিনয়ই উৎপন্ন হয়। আমিই গোষ্ঠের শরণ্য ও নাথ, গোষ্ঠই আমার পরিবার, আমিই আত্মযোগ দ্বারা এই গোষ্ঠ রক্ষা করব, এ আমি নিশ্চয় করছি।'

বালক যেমন অনায়াসে একহাতে ছাতা মেলে ধরে তেমনি অবলীলায় সাত বছরের কৃষ্ণ বাঁ হাতে গোবর্ধনগিরি উত্তোলন করল। দক্ষিণ হাত দক্ষিণ কটিতে রেখে দাঁড়াল বঙ্কিম হয়ে। গোপগোপীদের সম্বোধন করে বললে, 'সমস্ত লোকজন শকট-গোধন নিয়ে গিরিকন্দরে প্রবেশ করুন। আপনারা ভয় করবেন না যে আমার হাত থেকে পাহাড় পড়ে যাবে। বাত ও বৃষ্টি থেকে আপনাদের উদ্ধার করবার জন্যেই এই ব্যবস্থা।'

যথাসুখে ব্রজবাসীরা ভৃত্য পুরোহিতসহ সমস্ত উপজীবীদের নিয়ে গিরিকন্দরে আশ্রয় নিল। ক্ষুধা তৃষ্ণা ব্যথা ও সুখেচ্ছা ত্যাগ করে কৃষ্ণ সাত দিন পর্বত ধরে রইল, মুহূর্তের জন্যেও স্থান থেকে বিচলিত হল না। কৃষ্ণের বিক্রম দেখে ইন্দ্রের মোহ দূরীভূত হল, ভ্রষ্টসঙ্কল্প হয়ে মেঘসমূহকে প্রত্যাহার করল। বাতবর্ষণ থেমে গেল, নির্মেঘ আকাশে দেখা দিল সূর্য। ব্রজবাসীরা স্ত্রী-পুত্র ধনসম্পত্তি গো-শকট সব কিছু নিয়ে বেরিয়ে এল একে-একে। সকলে স্তব করতে লাগল, ইন্দ্রের গর্বাপহারী গোবিন্দ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হন। 'পিতাগুরুস্ত্বং জগতামধীশ'—এই বলে ইন্দ্রও শরণ নিল কৃষ্ণের।

সকলের সমক্ষে কৃষ্ণ গিরিগোবর্ধনকে তার পূর্বস্থানে নামিয়ে রাখল।

'এই অনাথ ছেলেটাকে তোমার হাতে সঁপে দিলাম।' শচী কেঁদে পড়ল গঙ্গাদাসের কাছে: 'একে যদি তুমি একটু যত্ন করে লেখা পড়া শেখাও—'

'নিশ্চয়ই শেখাব।' গঙ্গাদাস মহা খুশি: 'নিমাইয়ের মত ছাত্র পাওয়া ভাগ্যের কথা। আপনি কিছু ভাববেন না। এর বাপ নেই বলে কোনো বিঘ্ন হবে না।'

টোলে সর্বোত্তম প্রথম ছাত্র নিমাই। বয়েস আর কত হবে? তেরো-চোদ্দ। ঢের-ঢের বুড়ো-বুড়ো ছেলেরাও পড়ছে সেই টোলে, কমলাকান্ত, কৃষ্ণানন্দ, মুরারি। কিন্তু বিদ্যায় নিমাই সর্বপ্রধান। সর্বক্ষণ ডুবে আছে বিদ্যারসে। স্নানে ভোজনে পর্যটনে সর্বত্র শাস্ত্রকথা। সকলকে তর্কে নামাও। তারপরে পরাস্ত করো। অন্য টোলের ছাত্র হলে তো কথাই নেই। গায়ে পড়ে যুদ্ধ করবে। স্নানের ঘাটে হলেও ছাড়বে না। এ ঘাট থেকে ও ঘাটে ভেসে যাবে। এমন কি দরকার হলে সাঁতরে গঙ্গা পার হয়ে চলে যায় ওপারে, সূত্র স্থাপন করে নিজের ব্যাখ্যা নিজেই খণ্ডন করে আসে।

'না ছাড়েন শ্রীহস্তে পুস্তক একক্ষণ।
পড়েন গোষ্ঠীতে যেন প্রত্যক্ষ মদন॥
ললাটে শোভয়ে ঊর্ধ্ব তিলক সুন্দর।
শিরে শ্রীচাঁচর কেশ সর্ব-মনোহর॥
স্কন্ধে উপবীত, ব্রহ্মতেজ মূর্তিমন্ত।
হাস্যময় শ্রীমুখ প্রসন্ন, দিব্য দন্ত॥
কিবা সে অদ্ভুত দুই কমল নয়ন।
কিবা সে অদ্ভুত শোভে ত্রিকচ্ছ-বসন॥
যেই দেখে সেই এক দৃষ্টে রূপ চায়।
হেন নাহি ধন্য ধন্য বলি যে না যায়॥'

অদ্বৈত আচার্যের আশ্রিত কমলাকান্ত। কমলাকান্তর উপরই অদ্বৈতের ব্যবহারিক বিষয়ের ভার। কমলাকান্তই অদ্বৈতের সাংসারিক আয়-ব্যয়ের হিসেব রাখে। অদ্বৈতের সঙ্গে কমলাকান্ত এসেছে নীলাচলে। অদ্বৈতের তখন কোথায় তিন শো টাকার মত ঋণ ছিল, অদ্বৈতকে না জানিয়ে কমলাকান্ত রাজা প্রতাপরুদ্রের কাছে চিঠি লিখে পাঠাল টাকা চেয়ে। লিখে পাঠাল, অদ্বৈত স্বরূপতঃ ঈশ্বরতত্ত্ব, দৈবে তার কিছু ঋণ হয়েছে—তিনশোর মত টাকা পেলে তার ঋণ পরিশোধ হয়, রাজা যদি অনুকূল হন।

চিঠি প্রতাপরুদ্রের কাছে পৌঁছুবার আগেই কি ভাবে কে জানে গৌরাঙ্গের হাতে এসে পড়ল। এ কী অন্যায় কথা! পত্রে অদ্বৈতকে ঈশ্বর বলা হয়েছে, তাতে না হয় কিছু দোষ নেই, কেননা, 'আচার্য দৈবত ঈশ্বর,' কিন্তু তাই বলে দৈন্য জানাবার কী হয়েছিল? যে ঈশ্বর সে কি দরিদ্র? অদ্বৈতের দারিদ্র্যের ইঙ্গিত করে কমলাকান্ত তার ঈশ্বরত্বকে খর্ব করেছে। এ অপরাধের শাস্তি বিধেয়।

মহাপ্রভু তাঁর সেবক গোবিন্দকে বললেন, 'আজ থেকে কমলাকান্তকে এখানে আসতে দেবে না।'

'দ্বারমানা' হয়ে গিয়েছে জানতে পেরে কমলাকান্ত ম্লান হয়ে

গেল। কিন্তু অদ্বৈত আচার্য আনন্দিত। বললে, 'কমলাকান্ত, এ দণ্ড তোমার প্রতি প্রভুর অসীম অনুগ্রহ। স্নেহ না থাকলে কি এমন দণ্ড কেউ দেয় কখনো? তাই এ তোমার দণ্ড নয়, এ প্রসাদ।'

কমলাকান্তকে ডেকে পাঠালেন গৌরাঙ্গ।

দণ্ডিতকে আবার ডেকে পাঠালেন! অদ্বৈত অনুযোগ করতে লাগল, 'এর উপর আবার দর্শন দিচ্ছেন কমলাকান্তকে?'

মহাপ্রভু হাসতে লাগলেন।

'কমলাকান্ত দু ভাবে আমাকে বিড়ম্বিত করেছে।' বলতে লাগল আচার্য, 'প্রথমত আমাকে না জানিয়ে রাজার কাছে অর্থভিক্ষা করেছে; দ্বিতীয়ত, আমি ঈশ্বর নই অথচ আমার ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করেছে।'

প্রসন্নবরদ মূর্তিতে তাকিয়ে রইলেন মহাপ্রভু। এ তো অদ্বৈতের অভিযোগ নয়, কৃপালুর প্রতি প্রণয়কোপ। যে দণ্ডার্হ তার প্রতিও করুণার উৎসার। যে বিতাড়িত তাকেও আবার নিমন্ত্রণ!

'ও রকম করো কেন?' মহাপ্রভু কমলাকান্তকে বললেন, 'এতে আচার্যের লজ্জা ও ধর্মহানি হয় না? নিজের অভাব জানানোই তো লজ্জা আর রাজার ভিক্ষা গ্রহণ করাই তো ধর্মহানি। শোনো, বিষয়ীর অন্ন খেলে মন মলিন হয়, আর রাজার মত বিষয়াসক্ত আর কে আছে? আর চিত্ত যদি মলিন হয় কৃষ্ণস্মরণ হয় না। আর কৃষ্ণস্মৃতির স্ফূর্তি যদি না হয় তা হলে জীবন অর্থহীন।'

'প্রতিগ্রহ না করিয়ে কভু রাজধন।
বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন॥
মন দুষ্ট হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ।
কৃষ্ণস্মৃতি বিনু হয় নিষ্ফল জীবন॥'

শুধু কৃষ্ণভজন করো। অন্য কামনা করেও যদি কেউ কৃষ্ণভজন করে, কৃষ্ণরসে কাম ধুয়ে যায়। কাচের অন্বেষণ করতে-করতে ধ্রুব পেয়ে গেল পরমরত্ন। পিতৃসিংহাসন পাবার জন্যে কৃষ্ণকে ডেকেছিল,

কৃষ্ণ এসে দাঁড়াতে আর সিংহাসনের বাসনা রইল না। বললে, আমি কৃতার্থ, আমার আর অন্য বরের প্রয়োজন নেই।

কৃষ্ণ তো বলতে পারতেন, তুমি সিংহাসন চেয়েছ, সিংহাসন নিয়েই তুষ্ট থাকো, আমাকে চাইছ কোন হিসেবে? কিন্তু না, কৃষ্ণকৃপার এই তো বৈশিষ্ট্য। না চাইলেও দিয়ে দেন যা সত্যিকার চাইবার। ছেলে মাটি খাচ্ছে দেখতে পেয়ে মা তার মুখের মাটি ফেলে দিয়ে মিষ্টি পুরে দেন—এও তেমনি। বিষয়সুখের জন্যে কৃষ্ণভজনা করছে, অমৃত ছেড়ে বিষ, এ তো মূর্খের আচরণ। কৃষ্ণ তো সর্ববিজ্ঞ, তিনি মূর্খতাকে অনুমোদন করবেন কেন? সর্ব-কামনার আচ্ছাদক, সর্বকামনার পরিপূরক নিজপাদপল্লব দিয়ে দেবেন। 'আমি বিজ্ঞ, এই মূর্খে বিষয় কেনে দিব। স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব॥' 'অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন। না মাগিতেও কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ॥' সাধক প্রার্থনা না করলেও যা সত্যি প্রার্থিতব্য, সেই দুর্লভ সেই অপ্রাপ্য সেই অগোচর বস্তুই তাকে দিয়ে দেন বাসুদেব। 'কামলাগি কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণরসে। কাম ছাড়ি দাস হৈতে হয় অভিলাষে॥'

রায়-স্বরূপের গলা ধরে মহাপ্রভু কাঁদছেন আর বলছেন, বান্ধব, আমার কৃষ্ণের মাধুর্যের কথা শোন। আমার কৃষ্ণ সর্বচিত্তাকর্ষক, সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ! 'শৃঙ্গার-রসরাজময় মূর্তিধর। আত্ম পর্যন্ত সর্বচিত্তহর॥' যে আমার কৃষ্ণের মাধুর্যের কথা কণামাত্র শুনবে তার এই মাধুর্যের লোভে সব কিছু ছাড়তে হবে, লোকধর্ম, বেদধর্ম, দেহ-গেহ-ভোগ-তৃষ্ণা। নিষ্কিঞ্চন যোগী হয়ে ভিক্ষা মেগে খেতে হবে। কায়ক্লেশে জীবন ধারণের জন্যেই তো ভিক্ষা, দেহ না থাকলে কৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদন করব কি করে? গোপীরা আর কী তপস্যা করেছিল? শুধু নেত্র ভরে কৃষ্ণরূপমাধুরী পান করেছিল আর নিজেদের নয়নমনতনুকে শ্লাঘা করেছিল অনুক্ষণ। 'কান্তাভাব সাধ্যশিরোমণি।' যে রাগমার্গে থেকে শুধু অনুরাগে কৃষ্ণকে ভজনা

করে তারই কাছে কৃষ্ণমাধুর্য সুখলভ্য। 'কেবল যে রাগমার্গে, ভজে কৃষ্ণ অনুরাগে, তার কৃষ্ণ-মাধুর্য সুলভ।'

মুরারি গুপ্তের সঙ্গেই নিমাইয়ের বেশি ঝগড়া। শিশুজ্ঞানে নিমাইয়ের সঙ্গে তর্কে নামতে চায় না মুরারি, আর তারই জন্যে নিমাইয়ের আক্রোশ! আমি শিশু!

'যাও, যাও, বদ্যির ছেলে, রুগী-পত্তর নিয়ে থাকোগে।' নিমাই গঞ্জনা দিয়ে ওঠে, 'লতা-পাতা ঘাঁটো গে যাও। এ ব্যাকরণ শাস্ত্র, এতে তোমার কফ-পিত্ত-অজীর্ণের কথা লেখা নেই। যাও, ফিরে যাও, তোমার রুগীদের নিয়ে পড়ো গে।'

রুদ্র-অংশ মুরারির হঠাৎ চটে ওঠার কথা। কিন্তু মুরারির কি হয়েছে, নরম হয়ে গিয়েছে।

বেশ, যখন বলছ এত করে, ধরো তর্কের সূত্র ধরো। অর্থ বলো, আমি তা খণ্ডন করব এবং যখন আমার যুক্তিতে তোমার আস্থা হবে তখন দেখবে তোমার প্রথম অর্থ ই আবার প্রতিষ্ঠিত করেছি নতুনতরো যুক্তির জোরে। বেশ তো, এ পদ্ধতি উভয়ত।

কেউ কারু সঙ্গে এঁটে উঠছে না। তখন হঠাৎ নিমাই মুরারির গায়ে হাত রেখে স্পর্শ করল।

শিহরভরা সর্বাঙ্গে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল মুরারি। প্রকৃত মানুষ নয় এই পুরুষ। তা না হোক, কিন্তু মুরারি কি জানে কার প্রভাবে তার এত পাণ্ডিত্য! এত চাতুর্য-প্রাচুর্য!

'মুরারি, কৃষ্ণ ভজনা করো।' দিনের পর দিন বলছেন মহাপ্রভু।

'কৃষ্ণ?' দ্বিধায় জড়ানো মুরারির কণ্ঠস্বর।

'হ্যাঁ, কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান। সর্বাংশী, সর্বাশ্রয়, সর্বরসময় নির্মল প্রেম।'

'তুমি বলছ, কৃষ্ণকে ধরব?'

'হ্যাঁ, কৃষ্ণ বিনা উপাসনা নেই। কৃষ্ণই বিদগ্ধমধুর রসিকশেখর।'

'আচ্ছা, তুমি যখন বলছ—' মহাপ্রভুর প্রতি গৌরববুদ্ধির বলে

শেষ পর্যন্ত রাজি হল মুরারি। বললে, 'আমি তোমার কিঙ্কর, কত আর তোমার আদেশ লঙ্ঘন করব! কালই দীক্ষা দিও আমাকে।'

ঘরে গিয়ে কাঁদতে বসল মুরারি। সমস্ত রাত কেঁদে কাটাল। তার রঘুনাথের কাছে প্রার্থনা করতে লাগল, 'হে রাম, রঘুনাথ, তোমাকে আমি কেমন করে ছাড়ব? তোমার চেয়ে আমার কাছে আর কেউ বড় নেই, কারুর হতে নেই। তোমাকে ছেড়ে আমি বাঁচব না কিছুতেই। যদি তোমাকে ছাড়তে হয় তা হলে আজ রাত্রেই যেন আমার প্রাণ যায়।'

পরদিন সকালে উঠে কাঁদতে-কাঁদতে মহাপ্রভুর পায়ে এসে পড়ল মুরারি। বললে, 'তোমার বাক্য লঙ্ঘন করি এ আমার সাধ্য নয়, অথচ আমার রামত্যাগও অসাধ্য। এখন তবে উপায় কী! একমাত্র উপায় আমার মৃত্যু। আমাকে এখুনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করতে দাও।'

মহাপ্রভু মুরারিকে তুলে নিলেন ধুলো থেকে। আলিঙ্গন করে বললেন, 'গুপ্ত, তুমি ধন্য। আমার কথায়ও তোমার মন টলল না, তোমার সুদৃঢ় ভজনকে সাধুবাদ করি। তুমি শ্রীরামকিঙ্কর হনুমান, তুমি কেন আমার কথায় তোমার রঘুনাথকে ত্যাগ করবে? তোমার ভক্তিনিষ্ঠা দেখবার জন্যেই আমি তোমাকে কৃষ্ণভজনের কথা বলেছিলাম। তোমার রামই তোমার তত্ত্ববস্তু।'

মুরারি রাম বলুক, রাম ভজুক, তুমি দেহ ধরেছ কি করতে, যদি না কৃষ্ণ বলো! 'একই বিগ্রহ ধরে নানাকার রূপ।' আর তোমার এই দেহই সেই বিগ্রহের মন্দির। এই দেহের মধ্যেই সেই আনন্দ-সন্দোহের বাসা।

'হেন দেহ পাইয়া না হইল কৃষ্ণে রতি।
কতকাল গিয়া আর ভুঞ্জিব দুর্গতি॥
যে নর-শরীর লাগি দেবে কাম্য করে।
তাহা ব্যর্থ যায় মিথ্যা সুখের বিহারে॥'

১২

হে প্রাণপ্রিয়, আমি তোমাকে ছাড়া আর কিছু জানি না। যদি তোমার ইচ্ছে হয়, আমাকে আলিঙ্গন করো, নয়তো মর্দন করো পদতলে। নয়তো অদর্শনে রেখে মর্মাহত করো। হে প্রেমলম্পট, যা করলে তুমি সুখী হও, তাই করো নির্বিচারে। কেন না তোমার সুখই আমার একমাত্র কাম্য যেহেতু তুমিই আমার একমাত্র। তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই।

যদি চিত্ত স্থির না হয়, নির্জিত না হয়, তবে তপস্যায় কী দরকার? আর যদি চিত্ত হরিস্মরণে না মগ্ন হয় তবে চিত্ত স্থির হবে কি করে? আর যদি চিত্ত আর্দ্র না হয় তবে আর হরিস্মরণে প্রয়োজন কী? আর যদি কামনা ক্ষয় না হয় তা হলে চিত্তই বা আর্দ্র হবে কি দিয়ে?

বিদ্যা কী? হরিভক্তিই বিদ্যা। বেদাদিশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের নাম বিদ্যা নয়।

কীর্তি কী? ভগবৎপরায়ণ বলে খ্যাতির নামই কীর্তি। দান বা সেবা থেকে যে খ্যাতি তা কীর্তি নয়।

শ্রী কী? কৃষ্ণপ্রেমই শ্রী। ভূয়িষ্ঠ ধনজনগ্রামও বিত্ত নয়।

দুঃখ কী? ভক্তের বিরহই দুঃখ। হৃদ্‌ব্রণের যন্ত্রণাও দুঃখ নয়।

মুক্ত কে? ভক্তসামীপ্যে যার অবস্থিতি, প্রেমভক্তিতে যে প্রীতিমান, সিদ্ধদেহের প্রতি যার আস্থা, হরিনাম শুনে যার চিত্ত সরসদ্রব, সে।

গান করবে কী? ব্রজকেলি।

এই বিশ্বে শ্রেয় কী? সাধুসঙ্গ।

স্মরণীয় কী ? নাম।

অনুধ্যেয় কী ? শ্রীকৃষ্ণচরণ।

স্থেয় কী ? তার মানে, বাস করবে কোথায় ? ব্রজধামে।

শ্রবণের আনন্দী কী ? বৃন্দাবনলীলা।

উপাস্য কে ? রাধাকৃষ্ণ।

বলো বলো, আরো বলো। রসে যারা অনভিজ্ঞ তারা নির্বাণ-বিম্বফল চুষুক, আমরা রসতত্ত্ববিদ, আমরা কেন তা করতে যাব ? মদনমন্থরা গোপরামা নয়নাঞ্জনে যে শ্যামামৃত পান করেছে, আমরা তার অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ পান করব।

ষোল বছর বয়স, গঙ্গাদাসের টোল ছেড়ে নিজে টোল খুলল নিমাই। নিজের বাড়িতে জায়গা নেই, মুকুন্দসঞ্জয়কে ধরল। তোমার চণ্ডীমণ্ডপ আছে, সেইখানে একটু স্থান দাও না, একটা বিদ্যার মন্দির তুলি।

নবদ্বীপে কত বড়-বড় পণ্ডিতের টোল, এই কোমলকান্ত কিশোরের স্পর্ধা কী নতুন টোল চালাবে। তবু, কি জানি কেন, রাজি হল মুকুন্দসঞ্জয়। যিনি ধন দিয়েছেন তিনি যদি আমার গৃহে বিদ্যার সমাজ বসান, আমি তো কৃতকৃতার্থ।

'আমার ছেলেরাও কিন্তু পড়বে।' আবদার করল মুকুন্দ।

'তা আর বলতে।' সায় দিল নিমাই।

কিন্তু শিখবে কী ? লোকে দেখবে, শাস্ত্র আর ব্যাকরণ, কিন্তু, প্রস্তরের নিচে নির্ঝর, শিখবে আসলে ভক্তির মধুরিমা।

ভগবান একই বস্তু কিন্তু জ্ঞানী যোগী আর ভক্ত—তিন জনের তিন রকম অনুভব। একজন আম দেখল, আরেকজন আম শুঁকল, তৃতীয় ব্যক্তি আম খেল। সব চেয়ে বেশি জিতল কে ? নিঃসন্দেহ, তৃতীয় ব্যক্তি। তৃতীয় ব্যক্তিই ভক্ত।

জ্ঞানী অনুভব করে ভগবানের অঙ্গকান্তিরূপ নির্বিশেষ ব্রহ্মকে, যোগী অনুভব করে ভগবানের অংশস্বরূপ পরমাত্মাকে, আর ভক্ত

অনুভব করে ভগবানের সর্বৈশ্বর্যপরিপূর্ণ বিগ্রহস্বরূপকে। নির্বিশেষ ব্রহ্মে রূপ নেই লীলা নেই বিলাস নেই। পরমাত্মায় রূপ আছে, সৃষ্টির ক্ষেত্রে লীলাও আছে কিন্তু জীব সম্বন্ধে সে নিস্পৃহ, উদাসীন, সাক্ষিমাত্র। কিন্তু ভক্তের ভগবানে জীবলীলাবিনোদবৈচিত্র্য, অখণ্ড আনন্দঘন আস্বাদ। ভক্তের অনুভবে ভিতরেও ভগবান বাইরেও ভগবান।

জ্ঞানীর কাছে দুধ শুধু সাদা, যোগীর কাছে দুধ শাদা আর তরল, কিন্তু ভক্তের কাছে দুধ শাদা, তরল আর মধুর।

তোমার কাছে পড়া মানে কৃষ্ণসেবার পাঠ নেওয়া। কৃষ্ণসেবার জন্যে যে বেগবতী বলবতী বাসনা তার নামই প্রেম। 'কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।' প্রিয়ের প্রীতিবিধানই প্রিয়োপাসনার তাৎপর্য। যদি প্রিয়ের কাছে নিজের জন্যে কিছু চাই তা প্রিয়ত্ব-পরিপন্থী। তা হলে তা প্রিয়ের জন্যে সাধন নয়, নিজের জন্যে প্রসাধন। 'আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত।' যারা মোক্ষ চায় তাদের কি কৃষ্ণে মমতা আছে? মমত্ববুদ্ধি ছাড়া প্রেম কোথায়? তুমি আমার আপন জন, অনুভবে এই তীব্রতা না এলে তোমাকে ভালোবাসি কি করে? তুমি আমার সখা। তাই তো তোমার কাঁধে চড়ি, চড়তে সাহস পাই, মুখের ফল মিষ্টি লাগলে সেই উচ্ছিষ্ট ফলই খাইয়ে দিই তোমাকে। তারপর তোমাকে যখন গোপালরূপে বাৎসল্য করি তখন তোমাকে তাড়ন-ভর্ৎসন করতেও ছাড়ি না। তারপর আবার তোমার সঙ্গে মধুর হই। আর এই মাধুর্যেই আমার আস্বাদের আধিক্য। উজ্জ্বলতম সমৃদ্ধি। জ্ঞানে-যোগে কামে-মোক্ষে এই সমৃদ্ধি কোথায়? তাই মধুমত্তম রসই হচ্ছে প্রেম।

বনমালী ঘটক শচী দেবীকে এসে বললে, 'ছেলের এবার বিয়ে দাও।'

'না, না, ছেলের এখন বিয়ে কি!' শচী দেবী কথা মোটে গায়ে মাখল না: 'ছেলে আমার আরো বড় হোক, বিদ্বান হোক।'

বনমালী বললে, 'যে পাত্রীর সন্ধান এনেছি তার জুড়ি তুমি পাবে না নবদ্বীপে।'

শচী দেবী তবু কান পাতল না।

'বল্লভ আচার্যের মেয়ে লক্ষ্মী। একেবারে লক্ষ্মীর প্রতিমা। রূপে-শীলে কুলে-মানে অদ্বিতীয়া। নিমাইয়ের সঙ্গে অপরূপ মানাবে।'

তবুও প্রশ্রয় দিচ্ছে না শচী।

রাস্তায় নিমাইয়ের সঙ্গে বনমালীর দেখা। নিমাই শুধোল : 'কোথায় গিয়েছিলেন ?'

'তোমাদের বাড়িতে।'

'কেন, কী ব্যাপার ?'

'তোমার মাকে তোমার বিয়ের কথা বলতে। হাতে একটা খুব ভালো সম্বন্ধ ছিল তার হদিস দিতে।'

'তা মা কী বলল ?' মৃদু-মৃদু হাসতে লাগল নিমাই।

'শ্রদ্ধা করে কথাই কইল না। উড়িয়ে দিল একবাক্যে।'

গম্ভীর মুখে বাড়ি ফিরে নিমাই মাকে জিগগেস করলে, 'বনমালী আচার্যকে ফিরিয়ে দিয়েছ কেন ?'

এ কী ইঙ্গিত! উৎফুল্ল চোখে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

'হাঁ, আমি তো এখন গৃহস্থ। তাই আমার গৃহধর্ম পালন করা উচিত।' নিমাই বললে, 'আর গৃহিণী ছাড়া গৃহধর্ম কোথায় ?'

বনমালীকে তক্ষুনি ডেকে পাঠাল শচী। বনমালী বল্লভ মিশ্রকে খবর দিলে।

বল্লভ লাফিয়ে উঠল : 'সেই পরম পণ্ডিত সর্বগুণের সাগর বিশ্বম্ভর আমার জামাই হবে? কিন্তু বনমালী, আমি যে নির্ধন, পাঁচটি হরীতকীর বেশি যে আমি দিতে পারব না।'

'দিতে হবে না তোমাকে।'

গঙ্গায় যাচ্ছে লক্ষ্মী আর টোল থেকে ফিরছে নিমাই, পথে হঠাৎ

দেখা হয়ে গেল। মুহূর্তে 'পূর্বসিদ্ধ ভাব' মনে পড়ে গেল দুজনের। নিমাই শ্রীকৃষ্ণ আর লক্ষ্মী শ্রীলক্ষ্মী। আর তাদের স্বাভাবিক ভাব কান্তাভাব। 'কান্তাপ্রেম সর্বসাধ্যসার।' ব্রজের প্রীতিই কেবলা প্রীতি। কান্তাভাবের সেবা প্রেমানুগা। তাতে আছে নিষ্ঠা, পরিচর্যা, মমত্ববুদ্ধির গাঢ়তা, গৌরববুদ্ধির হীনতা, নির্বিচার অনুগতি। কান্তা-ভাবেই মধুরতার সর্বাতিশয়।

শুভদিনে গোধূলিসময়ে বিয়ে হল। চারদিকে 'লেহ-দেহ' রব পড়ে গেল। পড়ে গেল হরিধ্বনি। গন্ধে মাল্যে চন্দনে কজ্জলে উজ্জ্বল হয়ে বসল দুজনে। কেউ বললে, হর-গৌরী, কেউ বললে রতি-মদন, কেউ বা শচী-ইন্দ্র। কেউ বা রাম-সীতা, কেউ বা রাধা-মাধব, কেউ বা লক্ষ্মী-নারায়ণ।

মা-শব্দের অর্থ লক্ষ্মী। যিনি লক্ষ্মীর ধব বা পতি তিনিই মাধব। মা-শব্দের আরেক অর্থ বিদ্যা। বিদ্যা বা সরস্বতীর যিনি পতি তিনিই মাধব। লক্ষ্মীর মত সরস্বতীও বিষ্ণুর পত্নী। শ্রুতিতে ব্রহ্মবিদ্যার নাম মধুবিদ্যা। যে বিদ্যায় আনন্দচিন্ময়রসের আস্বাদন করা যায় তা মধুবিদ্যা নয় তো কি। মধুবিদ্যায় যিনি অবগম্য তিনিই মাধব। মা-শব্দের আরেক অর্থ, ধী, বুদ্ধি। যিনি মৌনের সাহায্যে বুদ্ধির ধবন বা দূরীকরণ করেন তিনিই মাধব। অর্থাৎ স্বল্পফলদায়ী কর্ম থেকে যিনি জীবকে নিজের দিকে আকর্ষণ করেন তিনিই মাধব। ধব-শব্দের আরেক অর্থ বস্ত্র। বস্ত্র শরীরকে আচ্ছাদন করেই শরীরের শোভা বিস্তার করে। তেমনি যিনি মা-কে বা শ্রীরাধাকে ঢেকে রেখেছেন আলিঙ্গনে, সেই নিত্যলীলাপরায়ণ শ্যামসুন্দরই মাধব। মা-শব্দের অর্থ হ্লাদিনী বা আনন্দিনী শক্তি। সেই শক্তিই শ্রীমতী।

মুখে করবে মাধবের নাম, মনে করবে মাধবের ধ্যান আর সকল কাজে স্মরণ করবে মাধবকে। মাধবই পরমানন্দ, তাকেই বন্দনা করো—তাঁরই কৃপায় মূক বাচাল হয়, পঙ্গু যায় গিরিলঙ্ঘনে। তিল-তুলসী দিয়ে এই দেহ মাধবকে উৎসর্গ করে দাও আর বলো, হে

মাধব, তোমাকে বার বার মিনতি করছি, তোমার দয়া যেন আমাকে না ছাড়ে।

আর নারায়ণ কে ?

নর থেকে উদ্ভূত বলে নার। তাই নার অর্থ জীবসমূহ। অয়ন অর্থ আশ্রয়। সমগ্র জীবসমূহের আশ্রয় বা আলয় বলে নারায়ণ। নার-শব্দের আরেক অর্থ জল। জলে অর্থাৎ কারণ-জলে অবস্থান করেন বলেও নারায়ণ। নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণেরই বিলাস। অধীশ, অখিললোকসাক্ষী শ্রীকৃষ্ণ। আশ্রিতাশ্রয়-বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণই সর্বধাম—জগদ্ধাম। অনাদিরাদি-গোবিন্দ, নারায়ণেরও মূল, নারায়ণেরও অবতারী। নিখিল শক্তির অধিষ্ঠানই শ্রীকৃষ্ণ।

গোবিন্দ কে ?

গো অর্থ গরু, গো অর্থ পৃথিবী, গো অর্থ ইন্দ্রিয়। আর বিন্দ ধাতুর অর্থ পালন। যিনি গো-পালন করেন তিনিই গোবিন্দ। বিশ্বের পালনকর্তা বলেও গোবিন্দ। সর্ব-ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা বলেও গোবিন্দ। পরিকরবর্গের ইন্দ্রিয়সমূহকে আনন্দে পালন বা পোষণ করেন বলেও গোবিন্দ।

শচীর গৃহ পদ্মগন্ধে ভরে উঠল, দূরে গেল দারিদ্র্যের মালিন্য। আনন্দের বিদ্যুৎ খেলতে লাগল অন্ধকারে। বুঝি কমলা এসেছে দীনের আলয়ে। দীন কে ? নিরুপম লাবণ্যের আহ্লাদমূর্তি নিমাই, মেঘমালিন্যের লেশমাত্র নেই। কোটি কন্দর্পের রূপকেও যেন হার মানিয়েছে। ব্যক্ত হয়েও যে ব্যক্ত নয় তাকে বোঝে এমন শক্তি কার ? নিমাই নিজেকে জানাচ্ছে না বলে লক্ষ্মীও মুখ ঝেঁপে আছে। না জানালে জানে এমন সাধ্য কার ? যার প্রতি কৃপা হবে শুধু সেই পাবে জানবার অধিকার। 'যারে তান কৃপা হয় সেই জানে তানে।'

বিদ্যারসে কখনো নিমাইয়ের পরিহাস কখনো বা অটল-নিটোল গাম্ভীর্য। নবদ্বীপে এমন পণ্ডিত নেই যে দুদণ্ড তার টোলে এসে না

বসে, শুনে না যায় তার আখ্যান-ব্যাখ্যান। বৃদ্ধ, বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ, বিখ্যাত কেউ উপেক্ষা করতে পারে না নিমাইকে। সাহস নেই কোথাও দন্তস্ফুট করে। বিদ্যার নিশ্ছিদ্র স্তম্ভ। কিন্তু যখন বিদ্যার আসনে নেই তখন চাপল্য-তারল্যের প্রতিমূর্তি। শিষ্যদের নিয়ে গঙ্গায় লাফাচ্ছে-ঝাঁপাচ্ছে, কখনো বা রাজপথে ছুটোছুটি করছে। এত বড় পণ্ডিত, আর অধ্যাপক, তার এ কী লঘুচিত্ততা! কে কার কথা শোনে! গালমন্দ করলেও নিমাই চটে না। বরং উল্টে সে নিজেই ঠাট্টা বিদ্রূপ করে, বিশেষত যাদের বাড়ি শ্রীহট্ট, যাদের কথায় পূর্বাঞ্চলের টান। আর নবদ্বীপে শ্রীহট্টের লোক তো কিছু কম নয়।

'তুমি যে ঠাট্টা করো তোমার বাড়ি কোন জেলায়?' শ্রীহট্টিরা পালটা আক্রমণ করে।

প্রশ্ন শুনে আবার নিমাইয়ের পরিহাস।

লাঠি নিয়ে তেড়ে আসে শ্রীহট্টিরা, নিমাই ছুট দেয়। সাধ্য কি তার সঙ্গে পাল্লা দেয় কেউ। অনুপায় হয়ে শ্রীহট্টিরা আর্জি করে দেওয়ানে। তদন্তে দারোগা-পেয়াদা আসে, কিন্তু তারাও নিমাইয়ের পক্ষ হয়ে হাসে। বলে, এ আবার একটা মামলার বিষয় নাকি?

কিন্তু এত বিদ্যায়ই বা হল কী, কী বা হল এত সারল্যের ভূমিকায়?

কৃষ্ণরস কই?

> 'হেন দিব্য শরীরে না হয় কৃষ্ণরস।
> কি করিব বিদ্যায় হইলে কালবশ॥'

কৃষ্ণই সমস্ত রসের বিষয় ও আশ্রয়, সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য, তার কথা কই?

সাধন-ভক্তির থেকেই রতির উদয়, সেই সাধন-ভক্তি কোথায়? শ্রবণ-কীর্তনাদি অনুষ্ঠানই সাধন-ভক্তির অঙ্গ, তাও ত দেখি না। ও সব অনুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি হলে রতির আবির্ভাব। রতি গাঢ় হলেই

প্রেম। যাতে চিত্ত স্নিগ্ধ হয়, কৃষ্ণে আত্যন্তিকী মমতা জন্মে রতির সেই প্রগাঢ়তাই প্রেম। প্রেম যখন চিত্তকে দ্রবীভূত করে তখন তা স্নেহ। স্নেহে ক্ষণকালিক বিচ্ছেদও সহনাতীত। স্নেহ থেকে মান। মাধুর্যকে নবীনতর আস্বাদ করবার চেষ্টায় যখন অদাক্ষিণ্য ধারণ করে তখন তা মান। মান যদি বিশ্বাস করে যে প্রিয়জন এই অদাক্ষিণ্য মোচন করবেই তখনই তা প্রণয়। প্রণয় থেকে রাগ। মিলনের আশায় যখন দুঃখও সুখ বলে অনুভূত হবে তখনই তা রাগ। রাগের বৃদ্ধি অনুরাগ। প্রিয়জনকে যখন বারে-বারে নিত্য-নতুন বলে আস্বাদ হবে, প্রতি দর্শনেই সে অভূতপূর্ব, তখনই অনুরাগ। অনুরাগে সমস্ত চিত্ত যখন বিভোর, টইটুম্বুর, তখনই তা ভাব। আর ভাবের পরমকাষ্ঠা মহাভাব।

এসব লক্ষণ কোথায় নিমাইয়ে?

মুকুন্দ দত্ত কেমন কৃষ্ণগীত গাইছে। যে শুনছে সেই তন্ময় হয়ে যাচ্ছে। কেউ কাঁদছে কেউ হাসছে কেউ বা উদ্দাম নৃত্য করছে। কেউ গড়াগড়ি খাচ্ছে, কেউ বা হুঙ্কার করে মালসাট মারছে, কেউ বা মুকুন্দের দু'পা ধরে লুটিয়ে পড়ছে। ওসব কিছুতেই যেন নিমাইয়ের মনোযোগ নেই। মুকুন্দ তার সহপাঠী, পথে দেখা হলেই তার সঙ্গে শুধু ব্যাকরণের তর্ক চালায় নিমাই। যে অদ্বৈতসভায় মুকুন্দের গান হচ্ছে তার ধার দিয়েও সে হাঁটে না। শ্রীবাস পণ্ডিত, যার শ্রবণে কীর্তনে আনন্দ, যে নিজের ঘরে কীর্তন করে ও শ্রবণ করে গিয়ে অদ্বৈতসভায়, তার সঙ্গে দেখা হলেও নিমাই শাস্ত্রের ধাঁধা জিগগেস করে, জিগগেস করে ব্যাকরণের ফাঁকি। কৃষ্ণকথা মুখেও আনেনা। সবাই কৃষ্ণকথা শোনবার জন্যে উৎসুক কিন্তু নিমাইয়ের কাছে কেবল ভাষাতত্ত্বের কচকচি। এই মিথ্যা বাক্যে কারু রুচি নেই। ঐ 'ফাঁকি' আসছে রে, দূর থেকে নিমাইকে দেখে সকলে কেটে পড়ে।

একদিন অমনি পালিয়ে যাচ্ছিল মুকুন্দ।

'ও আমাকে দেখে পালায় কেন?' পাশের লোককে জিগগেস করল নিমাই।

'গঙ্গাস্নানে যাচ্ছে বোধ হয়।' বললে পার্শ্ববর্তী।

'ওদিকে গঙ্গা কোথায়?'

'তবে বোধ হয় অন্যত্র কাজ আছে।'

'না, না, আমাকে দেখে পালাচ্ছে।' বললে নিমাই, 'দেখা হলে আমি শাস্ত্র-ব্যাকরণ বলব, কৃষ্ণকথা বলবনা, তাই এড়িয়ে যাচ্ছে আমাকে। ওহে মুকুন্দ পণ্ডিত'—গলা তুলে হাঁক দিল নিমাই।

মুকুন্দ শুনেও শুনলনা, বেরিয়ে গেল হনহন করে।

'আমার থেকে পালিয়ে পালিয়ে এমনি থাকবে কদ্দিন?' মুকুন্দের উদ্দেশে হেঁকে বললে নিমাই, 'কদিন পর এমন বাঁধনে বাঁধব ছেড়ে যেতে পথ পাবে না। দেখবে বৈষ্ণব কাকে বলে। দেখবে এ বৈষ্ণবের ঘরের দরজায় "অজ ভব" দাঁড়িয়ে আছেন পাহারায়। দেখবে—'

যারা শুনল তারা রুষ্ট হল নিমাইয়ের উপর। কী স্পর্ধা, ব্রহ্মা আর শিবকে দ্বারস্থ করে! দেবদেবী মানেনা নিমাই। নিমাই নাস্তিক।

শ্রীবাসেরও সেই আক্ষেপ। আহা, নিমাই যদি বৈষ্ণব হত, কত সুখের হত। বিদ্যার নেশাই ওর কাল হল। বিদ্যার তৃপ্তি ছাড়া আর কিছুই ওর কাছে লোভনীয় হল না। এত বড় পণ্ডিত, কিন্তু সারশস্যশূন্য, কৃষ্ণে রতি নেই একবিন্দু। 'মনুষ্যের এমন পাণ্ডিত্য দেখি নাঞি। কৃষ্ণ না ভজেন সবে এই দুঃখ পাই॥' সকলে মনে মনে প্রার্থনা করে, হে কৃষ্ণ, নিমাই অধ্যয়ন ছেড়ে তোমার রসে মত্ত হোক, নিরবধি প্রেমভাবে ভজনা করুক তোমার। 'কেহো বলে, হেন রূপ হেন বিদ্যা যার। না ভজিলে কৃষ্ণ নহে কিছু উপকার।'

সমস্ত নদীয়া তখন ধন-পুত্ররসে মত্ত, কিন্তু শ্রীবাস আর তার তিন ভাই—শ্রীরাম, শ্রীপতি আর শ্রীনিধি—রাতে নিজগৃহে উচ্চস্বরে

কীর্তন করে একত্র। কীর্তনের গোলমালে পাষণ্ডীরা ঘুমুতে পারে না। বাপু, ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে কৃষ্ণনাম করলে হয়না ? প্রমত্ত হয়ে নাচতে কাঁদতে লাফাতে-ঝাঁপাতে হবে ? দাঁড়াও, তোমাদের বাড়িঘর গঙ্গায় টেনে নিয়ে ফেলব, সবংশে তাড়িয়ে দেব নবদ্বীপ থেকে।

জীবের কৃষ্ণহীনতা দেখে বুক ফেটে যায় শ্রীবাসের। দীনদয়ার্দ্রনাথ, কবে আসবে তুমি, কবে জাগবে তুমি, অলোককাতর আমরা, কবে দেখব তোমাকে ?

একদিন পথের মধ্যে নিমাইয়ের সঙ্গে শ্রীবাসের দেখা। সশিষ্য চলেছে হন-হন করে। শ্রীবাসকে দেখে নিমাই দ্রুত একটা নমস্কার করল। শ্রীবাস বললে, 'কি হে উদ্ধতের চূড়ামণি, চলেছ কোথায় ?'

নিমাই কোনো উত্তর দিলনা। মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

শ্রীবাস বললে, 'কী ছার বিদ্যার লোভে দিন কাটাচ্ছ ? বিদ্যায় কী হবে যদি কৃষ্ণভক্তি না হয় ? 'পড়ে কেন লোক—কৃষ্ণভক্তি জানিবারে। সে যদি নহিল তবে বিদ্যায় কি করে॥' কতই তো পড়লে কিন্তু পেলে কী ? যদি কিছু পেতে চাও তো কৃষ্ণভজন শুরু করো। 'ডেকে সর্বথা ব্যর্থ না গোঙাও কাল। পড়িলা ত এবে কৃষ্ণ ভজহ সকাল'॥'

নিমাই দাঁড়াল না। চলে যেতে যেতে বললে, 'পণ্ডিত ধৈর্য ধরো, তোমার কৃপায় তাও নিশ্চয়ই হবে একদিন।'

তারপর সেদিন আবার গদাধরের সঙ্গে নিমাইয়ের দেখা।

গদাধর পালিয়ে যাচ্ছিল, নিমাই ছুটে গিয়ে তার দুহাত চেপে ধরল। 'কি হে পণ্ডিত, শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে যাও। মুক্তির লক্ষণ কাকে বলে ?'

কিছু না বলেও ছাড়ান নেই। আমতা-আমতা করতে লাগল গদাধর। বললে, 'আত্যন্তিক দুঃখ-নাশই মুক্তির লক্ষণ।'

আর যায় কোথা। নিমাই গদাধরকে পেড়ে ধরল। ব্যাখ্যার

এমন সব দোষ ধরতে লাগল যে গদাধরের সাধ্য নেই তা খণ্ডন করে। সাধ্য নেই ধূলিজালের মধ্য থেকে মুক্তির পথ দেখে।

'বাবা, পালাতে পারলে বাঁচি!' মনের গোপনে মিনতি করতে লাগল গদাধর।

ছেড়ে দিল নিমাই। বললে, 'আজ ছেড়ে দিলাম বটে কিন্তু কাল আবার ধরব।'

সবাই অদ্বৈতসকাশে গিয়ে নালিশ করে, 'কই তোমার কৃষ্ণ কই?'

হুঙ্কার করে ওঠে অদ্বৈত: 'আসছে, আসছে, ধৈর্য ধরো, নদীয়া শহরেই আছে সে প্রচ্ছন্ন হয়ে। কী হয় দেখবে সকলে চোখ খুলে—দুই চোখে সে দেখা আর শেষে কুলিয়ে উঠবে না। 'করাইমু কৃষ্ণ সর্ব-নয়ন-গোচর। তবে সে অদ্বৈত নাম কৃষ্ণের কিঙ্কর॥ আর দিন কথো গিয়া থাক ভাই সব। এথাই দেখিবা সব কৃষ্ণ অনুভব॥'

পিতৃকার্য করে গয়া থেকে গৌরাঙ্গ যখন ফিরে এল তখন তার সর্ব অঙ্গে প্রেমবিকার। শচী মনে করল তার বায়ুরোগ হয়েছে, আত্মীয়-বন্ধুরাও তাকে সমর্থন করল। কেউ বললে, ডাব-নারকোলের জল খাওয়াও, কেউ বললে শিবাদি-ঘৃত মাখাও এবং কেউ বললে বেঁধে রাখো দড়ি দিয়ে। শ্রীবাসকে ডাকা হল—তোমার কী মনে হয়?

তুলসী প্রদক্ষিণ করছে গৌরাঙ্গ। শ্রীবাসকে দেখে কাঁদতে লাগল, কম্প আর রোমহর্ষ হতে লাগল সর্বাঙ্গে। শ্রীবাসকে নমস্কার করতে গিয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়ল। বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেয়ে গৌরাঙ্গ শ্রীবাসকে উদ্দেশ করে বললে, 'সবাই বলছে আমি বায়ুরোগে আক্রান্ত হয়েছি, আমাকে বেঁধে রাখতে চাইছে। তুমি কী বুঝছ?'

'তোমার শরীরে মহাভক্তিযোগের আবির্ভাব হয়েছে।' গদগদস্বরে বললে শ্রীবাস, 'মহাকৃষ্ণ-অনুগ্রহ।'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল গৌরাঙ্গ। বললে, 'তুমিও যদি বলতে আমার বায়ুরোগ হয়েছে তাহলে আমি গঙ্গায় প্রবেশ করতাম।'

'আহা, তোমার যেমন বাই তাহা আমি চাই।' শ্রীবাস বললে যুক্তকরে।

আর গদাধর?

গদাধর ছায়ার মত ফিরতে লাগল গৌরের সঙ্গে। সেবায় ঢেলে দিল মন-প্রাণ। নীলাচলে এসেছেন মহাপ্রভু, সেখানেও গদাধর। নীলাচল ছেড়ে যাচ্ছেন বৃন্দাবন, গদাধরও সঙ্গ নিয়েছে।

বাধা দিলেন মহাপ্রভু। বললেন, 'গদাধর, তুমি ক্ষেত্রসন্ন্যাস নিয়েছ, নিয়েছ টোটাগোপীনাথের সেবা। তোমার নীলাচল ছাড়া চলবে না!'

প্রভুর আদেশ কোনদিন লঙ্ঘন করেনা গদাধর, আজ কী হল কে জানে, বললে, 'না, থাকব না নীলাচলে, প্রভুহীন প্রাণহীন নীলাচলে।' 'যাঁহা তুমি সেই নীলাচল। ক্ষেত্রসন্ন্যাস মোর যাক রসাতল॥'

'ছি, ও কথা মুখে আনতে নেই।' প্রভু প্রবোধের সুরে বললেন, 'গোপীনাথের সেবা করবে কে?'

'জানি না। তোমাকে দর্শনই আমার গোপীনাথের সেবা।'

'তুমি যদি গোপীনাথের সেবা ত্যাগ করো লোকে আমাকে নিন্দে করবে।' প্রভু বললেন অনুনয়ের সুরে, 'আমার উপর দোষ আসুক তুমি কি তাই চাও?'

'সব দোষ আমার। যদি তুমি সঙ্গে না নাও আমি একা-একা চলে যাব।'

মহাপ্রভু সঙ্গে নিলেন না গদাধরকে। দলছাড়া গদাধর একা-একা চলল।

ফটকে তাকে ডাকালেন মহাপ্রভু। বললেন, 'তুমি শুধু নিজের সুখ চাও? আমার সুখ চাওনা?'

অশ্রুভরা চোখে তাকিয়ে রইল গদাধর।

'বলো, আমি যাতে সুখী হই তা চাওনা তুমি? তুমি নিজের

সুখ চাও বলেই আমার সঙ্গে থাকতে চাও অহর্নিশ? যদি আমার সুখ চাইতে—'

গদাধর মাথা নত করে রইল।

'চাও আমার সুখ? যদি আমার সুখ চাও, নীলাচলে ফিরে যাও। আর কোনো কথা বোলো না।' বলে মহাপ্রভু দ্রুতপায়ে নৌকোয় গিয়ে উঠলেন।

নৌকো ছেড়ে দিল।

নৌকোর উদ্দেশে ছুটতে পারলনা গদাধর। পা উঠলনা। ছিন্ন তরুর মত পড়ে গেল মূর্ছিত হয়ে।

১৩

নবদ্বীপে ঈশ্বরপুরীর আবির্ভাব হল।

কে ঈশ্বরপুরী?

পূর্বাশ্রম কামারহাটি, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। আর কিছু পরিচয় নেই? আছে। মহাপ্রেমনিকেতন মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য।

কে মাধবেন্দ্র?

চেননা তাকে? মাধবেন্দ্রই তো লৌকিক লীলায় শ্রীগৌরাঙ্গের পরমগুরু।

থাকবার স্থায়ী কোনো স্থান নেই, তীর্থে-তীর্থে ঘুরে বেড়ায় মাধবেন্দ্র। অযাচক। অযাচিত ভাবে ফল-দুধ পেলে তবে খায়, নচেৎ নিরন্বু উপবাস।

ব্রজমণ্ডলে এসেছে মাধবেন্দ্র। গোবর্ধন প্রদক্ষিণ করে সন্ধ্যেয় বসেছে গোবিন্দকুণ্ডের ধারে। আপনা-আপনি কিছু জোটেনি, তাই রয়েছে অনাহারে। না জুটুক, বসে বসে নামকীর্তন করি।

কোথা থেকে এক গোপবালক এসে হাজির। বললে, 'আমি এই গ্রামেই থাকি, আমি অযাচকদের খাবার জোটাই। এই নাও, একভাঁড় দুধ এনেছি তোমার জন্যে। নাও, খেয়ে ফেল। ভাঁড় আমি পরে এসে নিয়ে যাব।'

কী মিষ্টি দুধ! মাধবেন্দ্র খেয়ে নিল এক চুমুকে। ফিরে এসে ভাঁড় নিয়ে যাবে বালক, তারই প্রতীক্ষায় বসে রইল। কীর্তন করতে লাগল।

কিন্তু, কই, বালকের আর দেখা নেই।

শেষরাতে স্বপ্ন দেখল মাধবেন্দ্র। এসেছে সেই বালক, মাধবেন্দ্রের হাত ধরে—তাকে নিয়ে এসেছে এক কুঞ্জে, বলছে, আমি কে জানো?

কে?

মধুর হেসে বালক বললে, আমি গোবর্ধনের অধিপতি। আমি গোপাল।

তুমি? তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইল মাধবেন্দ্র।

জানো, আমার সেবক ম্লেচ্ছের ভয়ে আমাকে এই কুঞ্জে লুকিয়ে রেখে চলে গিয়েছে। আর ফিরে আসেনি। আমার ভারি কষ্ট হচ্ছে এখানে।

কষ্ট? কিসের কষ্ট?

একা থাকার কষ্ট। রোদ বৃষ্টি শীত দাবানলের কষ্ট।

আমি—আমি কী করতে পারি?

তুমিই তো পারো, তোমার জন্যেই তো আমি বসে আছি। তুমি আমাকে এই কুঞ্জ থেকে মুক্ত করো, সেবা-প্রতিষ্ঠা করো আমার।

ঘুম ভাঙল। ব্রজবাসীদের ডাকল মাধবেন্দ্র। তাদের নিয়ে আঁতি-পাঁতি খুঁজতে বেরুল। অনেক সন্ধানের পর দেখা পেল গোপালের।

আর কথা নেই, গোবর্ধনের উপর বসিয়ে তার সেবা-প্রতিষ্ঠা করল।

কিছুদিন পরে স্বপ্নে আবার দেখা দিল গোপাল্। মাধবেন্দ্রকে বললে, তুমি আমার অঙ্গের তাপ দূর করার জন্যে অনেক সেবা করেছ, কিন্তু জানো, এখনো আমি শীতল হইনি।

কিসে শীতল হবে বলো ?

মলয়জ চন্দন লেপন করলে বুঝি শীতল হই। আনবে সে চন্দন ?

সে চন্দন কোথায় ?

নীলাচলে।

তখুনি যাত্রা করল মাধবেন্দ্র। প্রথমে এল শান্তিপুরে, অদ্বৈতের ঘরে। পুরীগোস্বামীর প্রেমাবেশ দেখে অদ্বৈতের আনন্দ আর ধরে না। বলে, আমাকে দীক্ষা দিয়ে যাও।

অদ্বৈতকে দীক্ষা দিয়ে মাধবেন্দ্র যাত্রা করল দক্ষিণে। এল রেমুণায়, বালেশ্বরের এক গ্রামে। রেমুণায় গোপীনাথকে দর্শন করল, কি কি তার ভোগ লাগে জানতে চাইল সবিস্তার। তেমনি ভোগ লাগাব গোপালের। জানতে পেল সন্ধ্যায় যে ভোগ দেওয়া হয় গোপীনাথকে, তার নাম অমৃতকেলি। সে আবার কী জিনিস! সে এক অপূর্ব ক্ষীর, গোপীনাথের ক্ষীর বলেই সবাই জানে। দ্বাদশ পাত্রে তা নিবেদন করা হয়। আহা, তেমন একটু ক্ষীর যদি পেতাম অযাচিত, দেখতাম খেয়ে কেমন তার স্বাদ-গন্ধ। যদি ভালো হত অমনি করে রেঁধে খাওয়াতাম আমার গোপালকে।

ছি, ছি আমি না অযাচক-বৃত্তি গ্রহণ করেছি ? তবে আমার মনে ক্ষীর পাওয়ার, ক্ষীর খাওয়ার বাসনা কেন ? নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল, কাউকে কিছু না বলে মন্দিরপ্রাঙ্গণ ছেড়ে চলে গেল অন্যমনে। গ্রামের শূন্যহাটে বসে কীর্তন করতে লাগল।

এদিকে পূজারী গোপীনাথের শয়ন দিয়ে ঘরে গিয়ে ঘুমিয়েছে, স্বপ্ন দেখল। গোপীনাথ বলছে, ওঠ, দরজা খোল। আমার ভক্ত মাধবেন্দ্রের জন্যে একভাঁড় ক্ষীর লুকিয়ে রেখেছি ; যাও তাকে দিয়ে এস। সে শূন্য হাটে বসে আছে একা-একা। কোথায় ক্ষীর,

কোথায় লুকিয়ে রেখেছ ? পূজারী অবাক মানল। আমার মায়ায় তোমার তা চোখে পড়েনি, সেই ক্ষীর আমার ধড়ার আঁচলে লুকানো আছে।

পূজারী ছুটে গিয়ে মন্দিরের দ্বার খুলল। কি আশ্চর্য, গোপী-নাথের বস্ত্রাঞ্চলের নিচে ক্ষীরভাণ্ড।

ক্ষীরের ভাঁড় নিয়ে ছুটল পূজারী। কিন্তু কে মাধবেন্দ্র, এত রাতে কোথায় কোন তল্লাটে লুকিয়ে আছে ? হাটে ঢুকে ডাকতে লাগল চেঁচিয়ে, কে মাধবপুরী, কোথায় আছ, বেরিয়ে এস শিগগির। তোমার জন্যে গোপীনাথ ক্ষীর চুরি করেছেন। চুরি করে পাঠিয়ে দিয়েছেন আমার হাতে।

সাড়াও নেই শব্দও নেই, কোথায় মাধবেন্দ্র ? গোপীনাথের স্বপন কি তবে মিথ্যে ?

বিহ্বলের মত বেরিয়ে এল মাধব। এই যে আমি, কোথায় আমার গোপালভোগ ?

প্রেমাশ্রুবিগলিতনেত্র মাধবকে দেখে পূজারী বিমুগ্ধ হয়ে গেল। প্রণাম করল দণ্ডবৎ। এমনটি না হলে কি গোপীনাথ নিজে চোর সাজেন ! চুরি করেন ভক্তের জন্যে, ভক্তপরবশ হন !

মাধবের হাতে ক্ষীরভাণ্ড তুলে দিয়ে চলে গেল পূজারী। মাধব সেই ক্ষীরপ্রসাদ গ্রহণ করল। সর্বাঙ্গে অমৃতায়িত হয়ে উঠল।

ভাণ্ডটা ভাঙল টুকরো-টুকরো করে, টুকরোগুলো বেঁধে নিল বহির্বাসে, ইচ্ছে একেক টুকরো খাবে প্রত্যহ। কিন্তু ভয় হল, রাত ভোর হলেই ভিড় জমবে হাটে, দিকে-দিকে সুখ্যাতি কীর্তন শুরু হবে। পূজারী কি ঢ্যাঁটরা পিটোতে বাকি রাখবে ? সবচেয়ে ভয়, আর কিছু নয়, প্রতিষ্ঠার। ভক্তির শত্রুই হল খ্যাতি। সুতরাং এ স্থান ত্যাগ করো, কেউ যেন তোমার না যন্ত্রণা বাড়ায়।

রাত্রি প্রভাত হবার আগেই মাধবেন্দ্র রেমুণা ত্যাগ করল। কিন্তু যে প্রতিষ্ঠা চায় না, প্রতিষ্ঠা যে তারই অনুগামিনী।

অন্তত গোপীনাথের তো প্রতিষ্ঠা হল। তার নাম হল "ক্ষীরচোরা গোপীনাথ।"

মাধবেন্দ্র নীলাচলে এল, প্রেমবিহ্বল হয়ে দর্শন করল জগন্নাথ।

পালাবে কোথায়? গোপালের জন্যে চন্দন নিয়ে যাবে না? চন্দনই তো এখন তোমার বন্ধন হয়ে দাঁড়াল। উপায় কি, নিজে ঠাণ্ডা না হই, গোপাল তো ঠাণ্ডা হোক। জগন্নাথের সেবকদের বললে স্বপ্নবৃত্তান্ত। তারা রাজার লোকদের গিয়ে ধরলে। রাজ-পুরুষদের আনুকূল্যে জোগাড় হল এক মণ চন্দন আর বিশ তোলা কর্পূর। বহন করে নিয়ে যাবে কে? রাজপুরুষরাই ত্ব'জন বাহক দিয়ে দিল। চন্দন আর কর্পূর নিয়ে মাধবেন্দ্র ফিরে এল রেমুণায়। যাবার আগে আরেক বার দেখে যাই গোপীনাথকে।

রাত্রে আবার স্বপ্ন দেখল মাধব। দেখল গোপাল এসেছে। মুখে মদিরমধুর হাসি। বলছে, মাধব, তোমার প্রেমচন্দন কত গাঢ় তা পরীক্ষা করবার জন্যে তোমাকে বৃক্ষচন্দন আনতে বলেছিলাম। এ বৃক্ষচন্দন আর তোমাকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে না। তুমি এ চন্দন গোপীনাথের অঙ্গেই লেপন কর। তাতেই আমার তাপক্ষয় হবে।

গোপীনাথকে মাখালেই তুমি শীতল হবে?

হব। গোপীনাথের আর আমার একই অঙ্গ।

পূজারীকে ডাকল মাধবেন্দ্র। শোনাল গোপালের প্রত্যাদেশ। ত্বজনে চন্দন ঘষতে বসে গেল আর ত্বজন লাগল গায়ে মাখাতে। প্রত্যহ চলল এমন ঘর্ষণ-ম্রক্ষণ। যত দিনে না চন্দন শেষ হল মাধবেন্দ্র থেকে গেল রেমুণায়।

যখন দেহ রাখছে মাধবেন্দ্র, এই বলে কাঁদছে, পেলাম না, পেলাম না, কৃষ্ণ পেলাম না, মথুরা পেলাম না, কিছুই পেলাম না। হে দীনদয়ার্দ্র, হে করুণাকেতন, অলোককাতর হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি পথে-পথে, কবে তোমার দর্শন পাব? আর যত দিন তুমি থাকবে

অদর্শনে, কি করব আমি, কোথায় যাব, বলো, কেমন করে আমার দিন কাটবে ?

সেই মাধবেন্দ্রের আশীর্বাদধন্য ঈশ্বর। সর্বদা কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা। একখানা আবার কাব্যগ্রন্থ লিখেছে, নাম শ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃত। চাদরের নিচে সবসময়ে রয়েছে সে পুঁথি। অন্তরে-বাহিরে সর্বত্র অক্ষরকৃষ্ণস্পর্শ।

অলক্ষিতে আছে নবদ্বীপে। আর কেউ না পারুক চিনতে পেরেছে গৌরহরি। অন্তত ভক্ত বলে চিনতে পেরেছে।

কৃপাসুধাসরিৎ শ্রীগৌরাঙ্গ। নদীর জল যখন কূল ছাপিয়ে মাঠে এসে পড়ে তখন কী হয় ? সমস্ত মাঠ জলে ভেসে যায়, ডুবে যায়। কিন্তু কতক্ষণ দাঁড়ায় জল, কোথায় দাঁড়ায় ? যে সব জায়গা উঁচু বা সমতল সেখানে দাঁড়ায় না, সেখান থেকে সরে পড়ে আস্তে-আস্তে। কিন্তু যে জায়গা নিচু, যে জায়গায় গর্ত বা খোদল, সেখানেই জল দাঁড়ায়, সেখানেই জল জমে।

গৌরকৃপা সর্বত্র সমান ভাবে বর্ষিত হচ্ছে, কিন্তু অভিমানের স্ফীতি, বা অহমিকার ঔদ্ধত্য তাকে ধরে রাখতে পারছে না। ধরে রাখতে পারছে কে ? ধরে রাখতে পারছে শূন্যতা, দীনতা, নিরভিমানতা। এ নয় যে ভগবান শুধু ভক্তকেই কৃপা করেন। ভগবানের কৃপা অচ্ছিন্নপ্রবাহা, নিরন্তর তার বর্ষণ হচ্ছে সর্বত্র। ভক্তই একমাত্র পাত্র যার মধ্যে কৃপা থাকতে পারে, জমতে পারে। যেমন গর্তের মধ্যে বৃষ্টির জল তেমনি ভক্তির মধ্যে, দৈন্যের মধ্যে, অহঙ্কার-শূন্যতার মধ্যে ভগবানের কৃপা।

পড়িয়ে ফিরছে একদিন নিমাই, পথে ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে দেখা। দ্বিধা-কুণ্ঠা নেই, ঈশ্বরকে প্রণাম করল নিমাই।

'তুমি কে ?' জিগগেস করল ঈশ্বর।

'আমি নিমাই।'

'কোন নিমাই ?'

পড়ুয়াদের পুঁথি পড়াই, আমি নিমাই পণ্ডিত।'

'তুমি ?' কত নাম-ডাক শুনেছে সেই লোক চোখের সামনে, ঈশ্বর নির্নিমেষ তাকিয়ে রইল ! তাই সিদ্ধপুরুষের মত তোমার এমন পরমগম্ভীর শরীর, এমন প্রেমপরিপূর্ণ চোখ—'

'আপনি ?'

'আমি এক কৃষ্ণকথক। কৃষ্ণপ্রস্তাবই আমার একমাত্র প্রসঙ্গ।'

'তবে আর কথা নেই। চলুন আমাদের ঘরে। সেখানেই আজ ভিক্ষা করবেন প্রসাদ।' সনির্বন্ধ নিমন্ত্রণ করল নিমাই।

'তাই চলো। তোমাদের ঘরে গেলে সর্বক্ষণ, বহুক্ষণ তোমাকে দেখতে পাব চোখ ভরে। তোমার চোখের দৃষ্টিই তো আমার পরম প্রসাদ।'

প্রহ্লাদকে তার বন্ধুরা জিগগেস করলে, প্রহ্লাদ, সুখ কিসে ? প্রহ্লাদ বললে, স্বার্থপর হয়ে যদি শুধু নিজের সুখ খুঁজে বেড়াও, সুখ নেই, পাবে না সুখ। কিসে পাব তবে ? প্রহ্লাদ বললে, আমাদের একজন প্রিয়জন আছে, তার নাম আত্মা। সে পূর্ণতৃপ্ত, নিত্যসুখী, তার কোনো অভাব নেই আকাঙ্ক্ষা নেই। আমাদের কী এমন সেবা আছে না প্রীতি আছে যে তাকে আমরা সুখী করব ! কিন্তু মজা কী জানো, যদি আমরা তাকে সুখী করবার জন্যে চেষ্টা করি তা হলেই আমাদের সুখ হয়। আমাদের সুখ শুধু সেই আত্মাকে সুখী করবার উদ্যমে। আর কোনো উপায়েই, কোনো রহস্যেই, আমাদের সুখ নেই।

দর্পণ দেখ, দর্পণে দেখ তোমার মুখচ্ছায়া। তোমার ইচ্ছে হল তিলকচন্দনের ফোঁটা কেটে ঐ প্রতিবিম্বকে সুখী করি। দর্পণের পিছনে হাত বাড়িয়ে প্রতিবিম্বকে ধরতে গেলে, নিষ্ফল সেই দুশ্চেষ্টা। তখন কী করো ? বিম্বে অর্থাৎ নিজমুখে তিলক চন্দন রচনা করো, তাই তখন ফুটে উঠবে প্রতিবিম্বে। তুমি হাসলেই প্রতিবিম্ব হাসে, তুমি সুখী হলেই প্রতিবিম্ব সুখী। তোমার মাধ্যম ছাড়া প্রতিবিম্বকে

ধরাছোঁয়া যাবে না, তোমার মাধ্যম ছাড়া পৌঁছুনো যাবে না প্রতিবিম্বে। তাই আত্মার সুখেই আত্মসুখ। তাই কৃষ্ণসুখে সুখী—এ ছাড়া আর পথ নেই, কৌশল নেই।

সুতরাং বিচিত্র বাসনা স্বীকার করে কৃষ্ণসুখসাধনে তৎপর হও। যারা গোবিন্দকে ভালোবাসে তারা বাসনাকে হেয় করে না, নষ্ট-দগ্ধ করে না, পূর্ণমাত্রায় বাঁচিয়ে রাখে। তারা কৃষ্ণের জন্যে ফুল তোলে, মালা গাঁথে, চন্দন ঘষে, সে মালাচন্দন কৃষ্ণের গলায় তুলিয়ে দেয়। কৃষ্ণের জন্যে তারা গরু দুইয়ে দুধ জ্বাল দিয়ে ক্ষীর তৈরি করে। কৃষ্ণ দেখে খুশি হবে বলে নয়নে কাজল দেয়, অধরে তাম্বুল আঁকে। কটাক্ষ আর হাসিকে যুগপৎ উজ্জ্বল করে। লাবণ্যের স্ফূর্তির জন্যে গাত্র-মার্জনায় তৎপর হয়। অশাসনের ঢেউ আনে বসনে। সকল বাসনা কৃষ্ণের তৃপ্তির জন্যে উৎসর্গ করে। কা'কে তুমি শারীরিক ক্লেশ বলছ, এ কৃষ্ণভোগ, এ কৃষ্ণস্বাদ, এ কৃষ্ণস্পর্শ। এই আমার আনন্দসন্দোহ। শীতে কি করল গোপী ? গায়ের উত্তরীয় কৃষ্ণকে দিয়ে নিজে রইল রিক্তগাত্রে—কৃষ্ণ যদি উত্তাপে থাকে তাহলে আর আমার শীত কোথায় ? কৃষ্ণ যদি আরামে থাকে তাহলে আমার আর ব্যাধি কি !

শান্তি শান্তি—শান্তি তো সুখ নয়। আমি স্বস্তি চাই না, আমি সুখ চাই। শান্তি মানে কি ? শান্তি মানে দুঃখনিবৃত্তি, দুঃখ-পরিহার। দুঃখ যাতে না ছুঁতে পারে তেমনি একটা সুরক্ষিত অবস্থায় আসা শান্তি। কিন্তু আমার ইষ্ট, আমার উদ্দেশ্য তো নঙর্থক নয়, সদর্থক। আমার ইষ্ট, আমার উদ্দেশ্য সুখ। ঘুমিয়ে পড়া নয়, জেগে থাকা।

আর এ সুখ আমার নিত্যসুখ। এ সুখে বয়স নেই জরা নেই মৃত্যু নেই, নেই দুর্ধর্ষ কালপ্রতাপ। আমার পাঁচ বছরের গোপাল পাঁচ বছরেরই থাকে। আমার কিশোরকৃষ্ণ নওলকিশোরই থাকে, নিত্যকিশোর, কোনোদিন সে বুড়ো হয় না। আর তুমি যদি তার

ষোড়শী সখী হও, তুমিও থাকবে তেমনি চিরন্তনী স্থিরদেহী। জাগতিক সুখ গোয়ালার দুধের মত, জল-মেশানো। স্বার্থদোষ কামদোষের ছোঁয়াচ লাগা। আর ব্রজের সুখ? ব্রজের সুখ খাঁটি দুধ, শুদ্ধ-শুভ্র-মধু-স্বাদু, নেই একবিন্দু কামস্বার্থের গন্ধ। নিজসুখে তাৎপর্য নেই, রাধাকৃষ্ণ সুখী হলেই আমার অনিবার্য সুখ। আমার অনিবার্য জাগৃতি।

নিমাইয়ের ঘরে আতিথ্য নিল ঈশ্বর।

তারপর কিছুদিন বাসা নিল গোপীনাথ আচার্যের ঘরে। রোজ সেখানে তার কৃষ্ণলীলামৃত পুঁথি পড়িয়ে শোনায় গদাধরকে। একদিন নিমাই এসে হাজির। নিমাইকে দেখে ঈশ্বরের যেমন কুণ্ঠা তেমনি উৎসাহ। তুমি জগৎখ্যাত পণ্ডিত, তুমি শুনবে আমার পুঁথি?

কেন শুনব না? কৃষ্ণকথার কি তৃষ্ণা মেটে?

'তাহলে শোনো। কিন্তু এক কথা।'

'কি কথা?'

'কোথায় কী দোষ-ত্রুটি হয়েছে বলবে সব সরল ভাবে।'

'দোষত্রুটি?' নিমাই উত্তেজিত হয়ে বললে, 'ভক্ত কৃষ্ণের কথা লিখছে তাতে আবার দোষত্রুটি কি! কার সাধ্য কৃষ্ণকথার দোষ ধরে! ভক্তবাক্যে যে দোষ দেখে সেই পাপী, সেই দোষী। ভক্তের যেরকমই ছন্দ-কবিত্ব হোক, কৃষ্ণের অখণ্ড বিনোদ।'

ঈশ্বরপুরী চুপ করে রইল।

'যে মূর্খ সে 'বিষ্ণায়' বলছে আর যে পণ্ডিত সে ঠিক-ঠিক বলছে 'বিষ্ণবে'।' নিমাই বলছে হাসিমুখে, 'কিন্তু বিষ্ণু কি তারতম্য করছেন? দুই-ই তিনি সমান ভাবে গ্রহণ করছেন। কেন করবেন না? তিনি যে ভাবগ্রাহী জনার্দন!'

'মূর্খে বোলে বিষ্ণায়, বিষ্ণবে বোলে ধীর।
দুই বাক্য পরিগ্রহ করে কৃষ্ণ বীর॥'

ইহাতে যে দোষ দেখে তাহাতে সে দোষ।
ভক্তের বর্ণনমাত্র কৃষ্ণের সন্তোষ॥'

আরেক দিন ব্যাকরণের কথা উঠল, আত্মনেপদী না পরস্মৈপদী। নিমাই বললে, 'যে ধাতুর কথা বলছেন সে পরস্মৈপদী।'

বিদ্যারস-বিচারে ঈশ্বরও পশ্চাৎপদ নয়। সে দেখিয়ে দিল ভুল হয়েছে নিমাইয়ের। ধাতু পরস্মৈপদী নয়, আত্মনেপদী।

হার মানল নিমাই। ভক্তের কাছে ভৃত্যের কাছে হার মানতে তার বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা নেই। কিন্তু, যাই বলো, আত্মপদ, অহঙ্কারের পদ নয়; পরপদ, পরমপদই নির্ভুল। পরমপদই স্থিরতম আশ্রয়।

শ্রীকৃষ্ণ আবার অবতীর্ণ হলেন কেন? তার মুখ্য বা অন্তরঙ্গ কারণ কি? শুধু প্রেমরসনির্যাসের আস্বাদন আর রাগমার্গ ভক্তিপ্রচার।

ভূভারহরণের জন্যে নয়, ভক্তিযোগবিধানের জন্যে তাঁর আসা।

কী রকম ভক্তি? রাগমার্গের ভক্তি। আত্মসুখ চাই না পরসুখেই পরমসুখ—এই হল প্রেমসার।

১৪

কী হয়েছে নিমাইয়ের?

কী জানি কী হল!

কখনো হাসছে কখনো কাঁদছে কখনো ধুলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছে। কখনো মালসাট মেরে হুঙ্কার-গর্জন করছে। কখনো বা সর্ব-অঙ্গ স্তম্ভাকার হয়ে যাচ্ছে। শচী ভয় পেয়ে লোক ডাকাডাকি শুরু করে দিয়েছে। ওগো দেখে যাও, আমার নিমাইয়ের এ কী হল? এই দেখ, যাকে কাছে পাচ্ছে মারছে, নিজের ঘরদোর তছনছ করছে। এ কী, মাটিতে যে পড়ল মূর্ছিত হয়ে। শিগগির যাও, বদ্যি ডাকো।

ছুটে এল লোকজন। সবাই বললে, বায়ুরোগ হয়েছে। মাথায় বিষ্ণুতেল দাও।

আমি সব ব্যবস্থা করছি। বললে বুদ্ধিমন্ত খান। নবদ্বীপের টাকাওয়ালা লোক, নিমাইয়ের প্রতি পক্ষপাতী। ধরে আনল কবরেজ। কবরেজ তেল চাপাল।

তেলে ঠাণ্ডা হল না নিমাই। আচম্বিতে অলৌকিক শব্দ করে উঠছে : 'আমিই সেই, আমাকে কেউ চিনতে পারল না।' বলে ছুটল রাস্তা দিয়ে : 'বিশ্ব ধরে আছি বলেই তো আমি বিশ্বম্ভর।'

ধরো, ধরো, নিশ্চয়ই ওর ওপরে দানবের অধিষ্ঠান হয়েছে। কেউ বা বললে, ভর করেছে ডাকিনী। নারায়ণতৈল লাগবে। আর এ তেল শুধু মাথায় নয়, মাখাতে হবে সর্বাঙ্গে।

তৈলাক্ত কলেবরে খলখল করে হাসছে নিমাই।

হাহাকার করছে শচী, আর সকলেও ম্রিয়মাণ, মহাবল বায়ু কী ভীষণ কাণ্ড করে ফেলল, আমাদের সে সোনার নিমাই আর নেই—চারদিকে এমনি যখন বিষাদ আর নৈরাশ্য—হঠাৎ. স্বভাবের আলো ঝলমল করে উঠল। এ কী, কই সেই মেঘবিকার, এ যে দেখি নীলের নির্মল থালায় রুপালি রোদের ক্ষীর। নিমাই আবার আগের মতন হয়েছে। বায়ু নেই, আগুন নেই, নেই আর আস্ফালন। ফিরে এসেছে স্বরূপানন্দে। হাসছে মৃত্যু-মৃত্যু।

সবাই হরিধ্বনি করে উঠল।

কেউ এল উপদেশ দিতে। বললে, 'তুমি এত বুদ্ধি ধরো, তবু তুমি কৃষ্ণভজন করো না কেন?'

'যার কৃষ্ণকথারুচি সেই ভাগ্যবান।' প্রদ্যুম্ন মিত্রকে বললেন মহাপ্রভু।

নীলাচলবাসী ব্রাহ্মণ, প্রদ্যুম্ন প্রভুর কাছে এসে বললে, 'প্রভু, আমি দীনাধম গৃহস্থ। আমার কৃষ্ণকথা শোনবার খুব ইচ্ছে। তুমি দয়া করে শোনাবে আমাকে কৃষ্ণকথা?'

প্রভু হাসলেন। বললেন, 'আমি কৃষ্ণকথার কী জানি? জানে শুধু রামানন্দ। তার কাছ থেকেই শুনি আমি কৃষ্ণকথা। তুমিও তার কাছেই যাও। সেই তোমাকে শোনাবে।'

প্রদ্যুম্ন মহাপ্রভুর দিকে তাকিয়ে রইল নির্নিমেষে। কী অনবদ্য দৈন্য, পাণ্ডিত্যের এক তন্তু অভিমান নেই, না বা কৌলীন্যের। আর ভক্তের গুণগরিমা প্রকাশ করতে কী উচ্ছ্বসিত আগ্রহ!

'মিশ্র, তোমার যে কৃষ্ণকথা শুনতে মন হয়েছে, তোমার এ মহাভাগ্য।' বললেন আবার মহাপ্রভু।

যদি হরিকথাতে রতি না হয় তা হলে ধর্মকর্ম পরিশ্রমের সামিল। যার ভগবানের প্রতি টান আছে তার আর টানাপোড়েন নেই, নেই কোনো টানাটানি। তোমার যখন কৃষ্ণকথায় লালসা তখন তোমার ধর্মানুষ্ঠানও অর্থান্বিত।

প্রদ্যুম্ন গেল রামানন্দের বাড়ি। রামানন্দ বাড়ি নেই। চাকর বললে, 'আপনি বসুন। শিগগিরই ফিরবেন।'

'কোথায় তিনি?'

'তাঁর বাগানে আছেন।'

'বাগানে? সেখানে কী?'

'অভিনয় শেখাচ্ছেন।'

'কাকে?'

'দুটি পরমাসুন্দরী কিশোরী দেবদাসীকে।'

'আর কেউ আছে সেখানে উপস্থিত?'

'না, আর কেউ নেই।'

ভৃত্য আরো বিশদ হল। রামানন্দ রায় নাটক লিখেছেন, নাম শ্রীজগন্নাথবল্লভ। আকাঙ্ক্ষা, স্বয়ং জগন্নাথের সামনে সেই নাটকের অভিনয় হবে। তারই জন্যে এত চেষ্টা-যত্ন-আয়াস-ক্লেশ চলেছে।

জগন্নাথবল্লভ নাটকে পাত্র-পাত্রী তো অনেক। নায়ক কৃষ্ণ ও তার সখা মধুমঙ্গল, এই দুই পাত্র আর পাত্রী সাত জন। নায়িকা

রাধিকা, তার সখী মাধবিকা, মদনিকা, শশীমুখী, অশোকমঞ্জরী আর মদনমঞ্জরী আর বনদেবী বৃন্দা। এত জনের মধ্যে শুধু ছুটিকে বেছে অভিনয় শেখাচ্ছেন কেন? তাও নির্জন বাগানে?

শুধু অভিনয় শেখাচ্ছেন? নিজের হাতে তাদের গায়ে তেল-হলুদ মাখাচ্ছেন, তারপর স্নান করিয়ে গা মেজে দিচ্ছেন। স্নানান্তে সর্বাঙ্গ মণ্ডন করে বসন পরাচ্ছেন। কোন অঙ্গে কোন অলঙ্কার শোভা পাবে তাই দিয়ে সাজাচ্ছেন বেছে-বেছে। সাজাচ্ছেন মাল্যানুলেপনে।

বলো কি?

উপায় কী তাছাড়া। অভিনয় নিখুঁত করা চাই। যে দুজনকে শেখাচ্ছেন তাদের একজন হয়তো কৃষ্ণ আরেকজন রাধিকা। কৃষ্ণ-রাধিকার নিগূঢ়-দুর্গম ভাব রামানন্দ ছাড়া আর কে শেখাবে? অভি-নেত্রীদের অঙ্গসৌষ্ঠব কমনীয় না হলে অভিনয় মধুর হবে কি করে? আর এই মাধুর্য সম্পাদনের জন্যে যত লৌকিক উপায় ও উপাদান আছে সব কিছুই সম্বল করেছে রামানন্দ। ব্রজলীলায় যারা অভিনয় করবে তাদের দেহ স্নিগ্ধলাবণ্যে কান্তোজ্জ্বল হতে হবে তাই রামানন্দের নিজ হাতে ক্ষালন-মার্জন, নিজ হাতে মর্দন-মণ্ডন। আমি নিজ হাতে ধুয়ে মুছে সাজিয়ে-গুছিয়ে না দিলে আমার তৃপ্তি নেই। আমার পূজা রাগানুগা। আমি রাধারাণীর দাসী। দেবদাসীদ্বয়ের সেবার সময়েও আমার সেই আরোপ, সেই ভাব।

অত কথা কে বোঝে! গুম হয়ে বসে রইল প্রদ্যুম্ন।

মহড়া শেষ হবার পর দেবদাসীদের প্রসাদ খাইয়ে তাদের নিজ-ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে রামানন্দ ঘরে ফিরল।

ভৃত্য খবর দিল প্রদ্যুম্ন মিশ্র বসে আছে।

সনমস্কার রামানন্দ মিশ্রের কাছে এসে দাঁড়াল। বললে, 'আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি, ক্ষমা করবেন। আপনার পায়ের ধুলোয় আমার ঘর পবিত্র হল। বলুন, কী করতে পারি আপনার জন্যে।'

বেলা অনেক হয়ে গিয়েছে, মিশ্র উঠে পড়ল। বললে, 'আমার অন্য কোনো প্রয়োজন নেই। শুধু আপনাকে দর্শন করতে এসেছিলাম। দর্শন পেলাম, তাতেই আমি কৃতকৃতার্থ।'

ফিরে গেল প্রত্যুম্ন।

পরদিন সকালে মহাপ্রভুর কাছে যেতেই মহাপ্রভু জিগগেস করলেন, 'কি, রামানন্দের কাছে শুনলে কৃষ্ণকথা?'

প্রত্যুম্ন রামানন্দের কীর্তিকথা ব্যক্ত করল বিরক্ত হয়ে।

এ দুর্গম মহিমা! উদ্যানের বিরলে বসে পূর্ণযৌবনা দেবদাসীদের অভিনয় শিক্ষা দিচ্ছে। ভাব-বিভ্রমের আধার, নৃত্যগীতের উচ্ছ্বাস যে সব রমণী, তাদের। শুধু দেখছে না, স্পর্শ করছে। অঙ্গভঙ্গি শেখাতে যেটুকু দরকার শুধু ততটুকু নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি অন্তরঙ্গ। নিজহাতে তেল মাখাচ্ছে, স্নান করাচ্ছে, গাত্রমার্জনা করে দিচ্ছে, রচনা করছে বেশভূষা। কী পরিমাণ চিত্তচাঞ্চল্য হবার কথা সহজেই অনুমেয়। তার কাছে কৃষ্ণকথা শুনব কি। বরং কলঙ্ককথা শুনি!

মহাপ্রভু বললেন, 'তুমি রামানন্দের কাছেই যাও। সেই সত্যকার কৃষ্ণকথার অধিকারী।'

এ যে আশ্চর্য কথা, প্রত্যুম্ন বিমূঢ় চোখে তাকিয়ে রইল।

'হ্যাঁ, রামানন্দের কথা।' বললেন মহাপ্রভু, 'সুন্দরী যুবতী মেয়ে যদি একটুকরো কাঠ বা পাথরকে স্পর্শ করে তা হলে কাঠ বা পাথরের কী হয়? কিছু হয় না। কোনো বিকারই তাতে হয় না। রামানন্দও তেমনি কাষ্ঠ-প্রস্তরের মতই নির্বিকার।'

'আপনি বলছেন?'

'হ্যাঁ, আমিই বলছি। গুহ্য অঙ্গের দর্শনে স্পর্শনেও তার ভাবান্তর নেই। তার যে দাসীভাবে আরাধনা। তার ইন্দ্রিয়ের প্রাকৃতত্ব নেই। তুমি ফিরে যাও তার কাছে। বোলো আমি পাঠিয়েছি। প্রাণ ভরে কৃষ্ণকথা শুনে এস।'

প্রত্যুম্ন ছুটতে ছুটতে চলে এল রামানন্দের কাছে। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে বললে, 'প্রভু আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন আপনার কাছে।'

'কেন বলুন তো ?' প্রভুর নাম শুনে প্রেমাবিষ্ট হল রামানন্দ।

'কৃষ্ণকথা শোনবার জন্যে।'

প্রভুর কৃপায় কৃষ্ণকথা অন্তরে স্ফুরিত হোক। প্রাণের উল্লাসে রামানন্দ বলতে লাগল। আর প্রত্যুম্ন? প্রত্যুম্ন নাচতে লাগল কৃষ্ণপ্রেমে।

দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে, তবু না বক্তা, না শ্রোতা, কারুরই আত্মস্মৃতি নেই।

নিমাই চলল তার শিষ্যদের সঙ্গে লীলা করতে।

বললে, 'চলো বাজারে যাই। কত দিন কিছু আসেনি সংসারে '

'চলুন।' বললে পড়ুয়ারা। 'কিন্তু কেনবার কড়ি কোথায়? নিয়েছেন সঙ্গে করে ?'

'কোথায় পাব ? দেখি মিষ্টি কথায় পাই কিনা।' নিমাই হাসল : 'দেখি মধুরের বাজারদর কত ?'

বাজারে ঢুকতেই প্রথমে ডাকল তন্তুবায়।

'ও ঠাকুর, আমার দোকানে আসুন, দেখুন না কেমন সুন্দর আর মজবুত ধুতি—'

'কই দেখি।'

একখানা ধুতি বাছল নিমাই।

'খুব ভালো, কেমন মিহি অথচ টেঁকসই।' ক্রেতার পছন্দকে তারিফ করল দোকানি।

'দাম কত ? আর দাম জিগগেস করেই বা লাভ কী। দেব কোত্থেকে ? একটা কাণাকড়িও হাতে নেই।'

দোকানি ফাঁপরে পড়ল। বললে, 'তা দামের জন্যে ভাবনা কি। দাম না হয় কদিন পরে দেবেন।'

'না বাবা, ঋণ করতে পারব না।' নিমাই ফিরে চলল :

'কোনোদিন ঋণ করিনি। যদি নির্দ্দিষ্ট দিনের মধ্যে শোধ করতে না পারি।'

'না পারেন তো মেয়াদ বাড়িয়ে নেবেন।' দোকানি দোনামনা করতে লাগল।

'না বাবা, সেই মেয়াদও বজায় থাকে কিনা তার ঠিক কি।' নিমাই পা বাড়াল রাস্তায়: 'একে ঋণ তায় আবার কথার খেলাপ —অত পোষাবেনা। অদৃষ্টে যখন নেই তখন আর কী করব!'

রাস্তায় নেমে পড়েছে নিমাই, পিছন থেকে ডাকল দোকানি। 'ও ঠাকুর, ধুতিখানা তুমি অমনি নিয়ে যাও। তোমার ইচ্ছে হয়েছে, তাই আমি কৃপা হয়েছে বলে মনে করছি। তুমি যদি নাও মনে হচ্ছে তাইতেই আমার মঙ্গল।'

নিমাই নিল হাত বাড়িয়ে।

'ও ঠাকুর, পান খেয়ে যাও।' তাম্বুলি ডাকল।

হনহন করে চলে যাচ্ছে নিমাই, বললে, 'পান খাবার কড়ি নেই।'

'আহাহা, নাই বা থাকল, এক খিলি পান তোমাকে খাওয়াতে পারি না?' পানওয়ালা বললে ব্যগ্র হয়ে।

নিমাই থামল। বললে, 'তুমি খাওয়াতে চাইলে আমিই বা বিনা কড়িতে খাব কেন?'

'না খাও তো, তুমি হাতে নিয়ে ফেলে দাও রাস্তায়—'

'তা তোমার জিনিস আমি অমনি-অমনি নেবই বা কেন, ফেলবই বা কেন?' নিমাই মুখ ফেরাল: 'যখন স্বচ্ছল হব তখন কিনে খাব।'

'না, তুমি যদি আমার হাতের পান না খাও আমি প্রাণ দেব। তোমাকে বিনা দামে পান খাওয়াব এই আমার প্রাণের অভিলাষ।' পানওয়ালা নিমাইয়ের হাত ধরল।

নিমাই হাসতে হাসতে বললে, 'তোমার প্রাণ যাওয়ার চাইতে আমার পান খাওয়ায় ঝঞ্ঝাট কম। দাও তাহলে এক খিলি।'

পর্ণে-চূর্ণে-খদিরে-কর্পূরে পান সাজতে লাগল তাম্বুলি।

বাজার থেকে নিমাই চলল এবার গোয়ালার ঘরে। বললে, 'দই-ক্ষীর কী আছে আনো দেখি।'

গোয়ালারা আনতে লাগল ভাঁড়ে ভাঁড়ে। যা পারো খাও, নয়তো পাঠিয়ে দিই বাড়িতে। দাম? দাম কিসের? তুমি খাবে এই তার দাম।

'ভালো দেখে গন্ধ আনো।' গন্ধবণিকের ঘরে গিয়ে হাঁক দিল।

নিয়ে এল দিব্য গন্ধ। দাম কত নেবে? আমার গন্ধ যদি তোমার গায়ে লাগে, তোমার গায়ে থাকে, তাই আমার দাম।

মালাকরের ঘরে গিয়ে নিমাই বললে, 'মালা দাও। দাম দিতে পারব না কিন্তু।'

'তোমার গলায় যদি আমার মালা দোলে, সেই আমার দাম।'

তারপর শঙ্খবণিকের ঘরে গিয়ে শঙ্খ চাইল নিমাই।

শঙ্খবণিক নিমাইয়ের দক্ষিণ হাতে তুলে দিল শঙ্খ।

'দাম?'

'তুমি যদি এই শঙ্খে একটি ধ্বনি তোলো', বললে শাখারি, 'তবে সেই আমার জয়ধ্বনি।'

চলো শ্রীধরের ওখানে যাই এবার। নিমাই বললে পড়ুয়াদের। যদি সেখানে জিততে পারি তবেই আমার জয়কার।

শ্রীধর বাজারে কলার খোলা বেচে, বেচে থোড়-মোচা। সামান্য আয়ের মানুষ, তা থেকে যদি বা কিছু উদ্বৃত্ত থাকে কৃষ্ণসেবায় ব্যয় করে। যদি উদ্বৃত্ত না থাকে তাতেও দুঃখ নেই, মুখের নাম কে হরণ করবে? দিবানিশি উচ্চকণ্ঠে কৃষ্ণ বলে। এত জোরে চেঁচায় পাশের বাড়ির লোক ঘুমুতে পারে না।

'এই উপদ্রবের মানে কী?' নিমাই প্রায় তেড়ে আসে।

নিমাইকে ভীষণ ভয় করে শ্রীধর। বলে, 'বেশ এবার থেকে আস্তে আস্তে নাম করব।'

'কী দরকার এত হাঁক-ডাকে? এতকাল তো হরি-হরি করলে কিন্তু হল কী?' নিমাই রুখে থাকে তেমনি : 'অন্নবস্ত্রের অভাব ঘুচল?'

'কই, আমার অভাব কই ? আমি তো উপোস করে থাকিনা, আর ছোট হোক বড় হোক কাপড়ও তো পরি। রাজা রত্নঘরে থাকুক কিন্তু পাখিও তো আছে বৃক্ষশাখে। রত্ন নেই বলে পাখির দুঃখ নেই। তেমনি তো তোর আকাশ আছে।'

'তোমার যখন এত সুখ তখন বিনাদামে জিনিস দাও।' শ্রীধরের সওদাপাতিতে হাত দিল নিমাই।

মুঠো চেপে ধরে বাধা দিল শ্রীধর। বললে, 'জিনিস নেবে তো দাম দিয়ে নেবে, কেড়ে নেবে কেন ?'

'তোমার তো অনেক আছে। তবে দেবে না কেন ?'

'আমি গরিব, আমার আবার কী থাকবে ?'

'তুমি আসলে কৃপণ, দান করতে চাও না।' নিমাই চোখ পাকাল।

'যাই হই, পণ্যের দাম ছাড়তে পারব না। তুমি বরং অন্য দোকানির কাছে যাও।'

'তুমি বললেই হবে ? আমার জোগানদার তুমি, আমাকে তোমার কাছ থেকেই নিতে হবে।' নির্বিচল দাঁড়িয়ে রইল নিমাই।

'ঠাকুর, তোমার পায়ে পড়ি। আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব কোরো না।' করজোড়ে মিনতি করল শ্রীধর।

'না, দ্বন্দ্ব কিসের ? নিজের জিনিস নিজে নেব তাতে কার কী মাথাব্যথা ?' একখাবলা তরকারি তুলে নিল নিমাই।

'তোমার পায়ে পড়ি। গরিবের তুমি ক্ষতি কোরো না। অন্য দোকানে গিয়ে দৌরাত্ম্য করো।' হাতের থেকে প্রায় আদ্ধেক জিনিস কেড়ে নিল শ্রীধর।

নিমাই ক্রুদ্ধ হয়ে বললে, 'তুমি আমার হাতের জিনিস কেড়ে নিচ্ছ ?'

'সবটা নিতে পারলাম কই ? ওগো, বাকিটাও ফিরিয়ে দাও।'

নিমাই তবু নরম হল না, বললে, 'এই দেওয়া জিনিস ফিরিয়ে নেওয়াটা কি ভালো হল ?'

'বা, আমি তোমাকে দিলাম কখন? তুমিই তো জোর করে তুলে নিয়েছ।'

'জানো আমি কে?'

'তা কে না জানে? তুমি টোলের পণ্ডিত, ঔদ্ধত্যের অবতার।'

'আজ্ঞে না। তুমি গঙ্গাকে চেন তো? যে গঙ্গায় প্রতিদিন নৈবেদ্য দাও? কি, চেন?'

বা, পারকর্ত্রী ভগভাগ্যবতী গঙ্গাকে চিনি না? সর্বশ্রমহরা সর্বদুঃখ-প্রশমনী। শুদ্ধস্রোতা, তেজোজ্জ্বলা, মধুরদ্রবা। হরিকন্যা পরমার্থা-পুরাতনী।

'বা, চিনি বৈকি।'

'সেই গঙ্গার বাপ আমি।'

'ছি-ছি-ছি।' দু হাত দিয়ে কান ঢাকল শ্রীধর। বিষ্ণু-বিষ্ণু কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলতে লাগল। 'বয়সের সঙ্গে সঙ্গে লোকে ধীর হয়, ভদ্র হয়, তুমি একেবারে বিপরীত। যতই তোমার বয়স বাড়ছে ততই তুমি দুর্বিনীত হচ্ছ। তোমার কি গঙ্গাকেও ভয় নেই?'

'আমার কাউকেই ভয় নেই। তুমি যদি তোমার দেবতাকে, গঙ্গাকে, বিনিদামে রোজ নৈবেদ্য দিতে পারো, আমাকে বিনিদামে না হোক কিছু কম দামেও তো দিতে পারো। মেয়ে অমনি অমনি পাবে, তার বাপ দাম কিছু ধরে দিলেও পাবেনা খানিকটা?'

'বেশ, তোমাকেও অমনি দেব। দাম কমাতে পারবনা।' হাত ছেড়ে দিল শ্রীধর।

'দেবে?' উজ্জ্বল চোখে হাসতে লাগল নিমাই: 'যা বিনিদামে পাওয়া যায় তার মূল্যই অসীম। হোক সে সামান্য, দেওয়ার গুণেই অপরূপ। কিন্তু দেবে কী শুনি?'

'রোজ একটুকরো থোড় আর খোলার পাত্র দেব তোমাকে আজীবন।'

'দেবে?'

'দেব। হ্যাঁ, আমার সঙ্গে আর দ্বন্দ্ব কোরো না।'

'না, দ্বন্দ্ব কোথায়? তোমার খোলায় আমি খাব। তোমার থোড়-মোচাই শ্রীব্যঞ্জন হয়ে উঠবে।'

প্রভু, আমি মূঢ়, অক্রূর শ্রীকৃষ্ণের স্তব করছে : স্বপ্নতুল্য দেহ পুত্র গৃহ দারা অর্থ ও স্বজনকে সত্য ভেবে ঘুরে মরছি। অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হয়ে অনিত্য ও অনাত্মে বিপরীত বুদ্ধি করছি, দ্বন্দ্বে ক্রীড়া করছি সর্বক্ষণ। যা আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় সেই আত্মাকেই জানছি না। তৃণাচ্ছন্ন স্নিগ্ধ জল ছেড়ে মৃগতৃষ্ণার দিকে ছুটছি। তোমাকে ত্যাগ করে ছুটছি দেহাভিমুখে। আমি বিষয়-বাসনায় বিভ্রান্ত, কামে ও কর্মে ক্ষুভিত, উন্মাদী। মনকে সংযত করতে অসমর্থ। প্রভু, মানুষের সংসারের সমাপ্তি যখন কাছে আসে, তখনই সাধুসেবায় তোমার প্রতি তার মমতা হয়। কিন্তু তোমার কৃপা না হলে কে বা করে সাধুসেবা, কার সাধ্য তোমাতে মতি আনে। তুমিই সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের কারণ-আকর। তুমিই পরিপূর্ণ। তুমিই সকলের নিয়ন্তা, সকলের অধিষ্ঠাতা। তোমারই পদপরবশ হলাম, আমাকে পরিত্রাণ করো।

১৫

'মা, আমি কিছু দিন প্রবাস করে আসি।'

শচী চমকে উঠল : 'কোথায়?'

'পদ্মায়। পূর্ববঙ্গে।'

শচী চাইল নিবৃত্ত করতে কিন্তু নিমাই টলল না। লক্ষ্মীকে বললে, মাকে দেখো। মাকে বললে, দেখো লক্ষ্মীকে।

অধ্যাপক-শিরোমণি নিমাই পণ্ডিত এসেছে, দলে দলে লোক

আসছে দিক-দিগন্তর থেকে। পড়ুয়ারা বললে, ভেবেছিলাম নবদ্বীপ যাব। মূর্তিমন্ত বৃহস্পতি দ্বারে এসে দাঁড়াল। তোমার টিপ্পনী মিলিয়ে ব্যাকরণ অভ্যাস করি আমরা, এবার সাক্ষাৎ শিষ্য করো আমাদের। তোমার মুখের অমৃতবচন শুনি।

অমৃতবচনই শোনাতে এসেছি তোমাদের কাছে। প্রথমে নবদ্বীপে না হয়ে এই পদ্মাপূত পূর্বাঞ্চলে। সে বচন পার্থিব বিদ্যা নয়, অমর্ত বিদ্যা।

সে বিদ্যার নাম কী ?

সে বিদ্যার নাম হরিনাম। পরিণামে হরিনাম।

এ কী আশ্চর্য কথা !

যে নিমাই উদ্ধতের শিরোমণি, চঞ্চলের জয়োত্তম, দিবানিশি যে পুঁথি-পাঁতি নিয়ে বিভোর, বৈষ্ণবে যার প্রগাঢ় বিতৃষ্ণা, সে কি না এখন হরিনাম বলছে। শুধু বলছে না, স্ফুটকণ্ঠে কীর্তন লাগিয়েছে। শুধু পথে-পথে নয়, নদীতে, নৌকোয়, এপারে-ওপারে। সজ্জন-দুর্জন আচারী-বিচারী অক্ষম-অধম, পতিত-পীড়িত—সবাইকে এক নৌকোর সোয়ারী করে এক বন্দরে নিয়ে যাচ্ছে। এক আনন্দের বন্দরে।

নিমাইয়ের সামনে দণ্ডবৎ হয়ে দাঁড়াল এক ব্রাহ্মণ। শুচিভাস্বর মূর্তি।

'কে ?'

'আমি তপন মিশ্র।'

'কী চাই ?' দৃষ্টি আয়ত করল নিমাই।

'সাধ্য-সাধন বুঝতে চাই। বহু শাস্ত্রে বহু বাক্যে চিত্তের বিভ্রম ঘটেছে।' দুই হাত যুক্ত করল তপন: 'তাই আপনার কাছে এসেছি।'

'আমি সাধ্য-সাধনের কী জানি ?

'প্রভু, আপনি জানেন না তো আর কে জানে ? কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি, এক ব্রাহ্মণ এসে আমাকে বলছে, তপন, নিমাই পণ্ডিত

এসেছে, যদি সাধ্যসাধন জানতে চাও তো তার কাছে গিয়ে প্রার্থনা করো। জানবে সেই নরনারায়ণ, সেই পূর্ণব্রহ্ম। তার কাছ থেকে জেনে নাও রহস্য। আর এ ঈশ্বরতত্ত্বের কথা কোথাও যেন আর প্রকাশ কোরো না।'

'শুন শুন ওহে দ্বিজ পরমসুধীর।
চিন্তা না করিহ আর মন কর স্থির॥
নিমাই পণ্ডিত-পাশ করহ গমন।
তিহোঁ কহিবেন তোমা সাধ্য-সাধন॥
মনুষ্য নহেন তিহোঁ—নরনারায়ণ।
নররূপে লীলা তাঁর জগত-কারণ॥
বেদগোপ্য এসকল না কহিবে কারে।
কহিলে পাইবে দুঃখ জন্মজন্মান্তরে॥'

যা পাবার জন্যে লোকে ভজনা করে তার নাম সাধ্য। আর সাধ্যবস্তুকে পাবার জন্যে যে অনুষ্ঠান বা আচরণ তার নাম সাধন।

তোমার সাধ্য যদি স্বর্গপ্রাপ্তি, তাহলে সাধন তোমার বেদ-বিহিত কর্মের উদ্‌যাপন। তোমার সাধ্য যদি পরমাত্মায় মিলন, তাহলে সাধন তোমার যোগ। তোমার সাধ্য যদি ব্রহ্মসাযুজ্য, তাহলে সাধন তোমার জ্ঞান। তোমার সাধ্য যদি ভগবৎসেবা, তাহলে সাধন তোমার ভক্তি, ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান।

এখন বলো সাধ্য-সাধনের শ্রেষ্ঠ কী? কর্মযোগ, জ্ঞান, ভক্তি—কোনটা? তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, তুমি না বললে আর কে বলবে?

'না, এসব কথা বলবে না। জীবে ভগবৎবুদ্ধি মহা পাপ।' নিমাই পাশ কাটাতে চাইল।

'ওসব কথা শুনছি না। তুমি যদি গোবিন্দ না হবে, মাধব না হবে, তবে এই অখ্যাত দেশে আসবে কেন? কেন দেখা দেবে এই অবজ্ঞাতকে?'

'তুমি কী ভাগ্যবান!' বললে নিমাই, 'কৃষ্ণভজনে তোমার রুচি হয়েছে।'

'কৃষ্ণভজন?'

'হাঁ, কৃষ্ণই সাধ্য, ভজনই সাধন।'

ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবাই সাধ্য, একমাত্র কাম্যবস্তু। আর, সাধন এককথায় নামকীর্তন। মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং সকলনিগমবল্লীসৎফলং চিৎস্বরূপম্। ভগবানের নাম সকল মধুরের মধুর, সকল মঙ্গলের মঙ্গল, সকল নিগমলতার সৎফল এবং অপ্রাকৃত চৈতন্যস্বরূপ।

শিষ্য গুরুকে বললে, আপনি সাধনের যে উপদেশ দিয়েছেন, তা আমার পক্ষে অশক্য। যদি শরীরের দ্বারা নিষ্পাদ্য কোনো সাধন থাকে তাই আমাকে বলুন। মনের দ্বারা নিষ্পাদ্য কোনো কিছুই করতে পারব না, কেন না মন বড় চঞ্চল।

গুরু বললে, বেশ, তোমাকে একটি স্বল্প সাধনের কথা বলছি। তা আর কিছু নয়, গোবিন্দকীর্তন। উঠতে-বসতে চলতে-ফিরতে ক্ষুধায়-তৃষ্ণায়, ঘুমুতে যাবার আগে, ঘুম থেকে চোখ মেলে এমন কি পতনকালেও গোবিন্দ-গোবিন্দ বলবে। নামকীর্তন চিত্তচাঞ্চল্যেরও অপেক্ষা রাখে না। চিত্তচাঞ্চল্যেও চলে নামকীর্তন।

নামকীর্তনই শ্রেষ্ঠ আলম্বন।

'কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ সে জীবন।
হেন কৃষ্ণ বোল ভাই হই এক মন॥
ভজ কৃষ্ণ স্মর কৃষ্ণ শুন কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ হউক সবার জীবনধনপ্রাণ॥'

'কী ভাবে ভজন হবে?' জিগগেস করল তপন।

'শুধু কেশবের নাম করবে। কলির যুগধর্মই নামকীর্তন।' বললে নিমাই। 'সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে অর্চনা আর কলিতে শুধু হরিকীর্তন।'

'শুন মিশ্র! কলিযুগে নাহি তপযজ্ঞ।
যেই জন ভজে কৃষ্ণ তার মহাভাগ্য॥
অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া।
কুটিনাটি পরিহরি একান্ত হইয়া॥'

'শুধুই নাম?'

'হ্যাঁ, শুধুই নাম।'

'এই সাধ্য-সাধন?'

'হ্যাঁ, এই সাধ্যসাধন। সমস্ত তত্ত্ব এই হরিনামসঙ্কীর্তনে।'

'কিন্তু মন্ত্র কী?'

'মন্ত্র ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর।' নিমাই তদ্গত-তন্ময় হয়ে বললে, 'কলিকল্মষনাশক তারকব্রহ্ম নাম। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥ কলিতে অশেষ দোষ, তবু তার একটি মাত্র গুণ আছে। সে হচ্ছে কৃষ্ণ-কীর্তনের আরাম। একমাত্র কৃষ্ণকীর্তনের ফলেই সংসারাসক্তি থেকে মুক্তি ঘটে। যাওয়া যায় পরমধামে।'

আদিপুরুষ নারায়ণের নামেই কলির সর্বদোষের নিবারণ। কলিদোষাপহারক কৃষ্ণনাম। সর্বচিত্তহর বলে হরি, সর্বচিত্তাকর্ষক বলে কৃষ্ণ, সর্বচিত্তাভিরাম বলে রাম।

'তন্নাম কিমিতি।' নারদের জিজ্ঞাসা ব্রহ্মাকে। সেই নামটি কী?

সেই নাম ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর। ব্রহ্মা বললে, সমস্ত বেদে এর চেয়ে পরতর আর কিছু নেই।

সেই নামকীর্তনের বিধি কী?

এর কোনো বিধি নেই। আসন নেই বাসন নেই, রীতি নেই নীতি নেই, নেই বা সংখ্যাপূরণের দায়িত্ব। গোপন-গোচর নেই। সজন-বিজন নেই। শুনতে হলে লোকে শুনুক, না শুনলেও বা কী এসে গেল। সর্বত্র পূর্তি, সর্বত্র স্ফূর্তি, সর্বত্র স্বতন্ত্র।

'প্রভু বলে কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা সভে জপ গিয়া করিয়া নির্বন্ধ॥
ইহা হৈতে সর্বসিদ্ধি হইব সভার।
সর্বক্ষণ বোল, ইথে বিধি নাহি আর॥
দশে পাঁচে মিলি নিজ দুয়ারে বসিয়া।
কীর্তন করিহ সভে হাথে তালি দিয়া॥
রাত্রিদিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে॥'

সমস্ত মন্ত্রের শ্রেষ্ঠ হরিনাম। আর কিছু নয়, শুধু নামৈকশরণ হয়ে থাকো।

'কিন্তু মনের মধ্যে যে অনেক মল, অনেক কুটিলতা।' করুণ নেত্রে তাকাল মিশ্র।

'নাম করতে করতে দেখবে মন স্থির হয়েছে, স্বচ্ছ হয়েছে, স্বাদু হয়েছে। জানো তো, যার পিত্ত বেশি তার মিছরিও তিক্ত লাগে। ঐ তিক্ততার ওষুধই আবার মিছরি।' নিমাই বললে, 'মিছরি আগে তিক্ততা কাটাবে পরে প্রতিষ্ঠিত করবে তার মিষ্টত্ব। তাই নাম আগে চিত্তকে শুদ্ধ করবে, পরে জাগবে কৃষ্ণরতির মাধুর্য। অভ্যাস থেকে চলে আসবে অনুরাগে। আর তখনই বুঝবে কোন সাধ্যের জন্যে কী সাধন। কৃষ্ণপ্রেম পাবার জন্যেই কৃষ্ণকীর্তন। 'সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে। সাধ্য সাধন তত্ত্ব জানিবা সে তবে।'

বারে বারে প্রণাম করতে লাগল তপন। বললে, 'যদি অনুমতি করেন তো আপনার সঙ্গে যাই নবদ্বীপ।'

নিমাই উঠে দাঁড়াল। আলিঙ্গন করল তপনকে। বললে, 'না, নবদ্বীপ নয়, তুমি কাশী চলে যাও।'

'কাশী? আপনার সঙ্গ ছেড়ে কাশী?' প্রেমপুলকিত অঙ্গে বিভোর তপন মিশ্র।

'হ্যাঁ, আমিও শিগগির যাচ্ছি সেখানে। মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের উদ্ধার করতে হবে। সেখানে তোমার সঙ্গে আমি মিলব, সেখানে তুমি আমার সহচর।'

প্রভুর অতর্ক্য লীলা নির্ণয় করি কী করে ? যাত্রার উদ্যোগ করতে লাগল তপন।

কয়েক মাস পরে বহু ধন-জন নিয়ে নিমাই বাড়ি ফিরল। কিন্তু বাড়িতে আনন্দ নেই কেন ? মা এসে দাঁড়ালেন, কিন্তু মুখে হাসি কই ?

'এ কি মা, কী হয়েছে ?'

অঝোরে কেঁদে ফেলল শচী। 'ঘর লক্ষ্মী শূন্য। লক্ষ্মী চলে গেছে বৈকুণ্ঠে।'

এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল নিমাই। কান্নভরা চোখে জিগগেস করল, 'কী হয়েছিল ?'

নিজের মনে শান্তি নেই, স্বাস্থ্য নেই, তবু নিরবধি শাশুড়ির সেবা করে চলেছে। নামমাত্র খায় আর একলা ঈশ্বরবিরহে সমস্ত রাত কাঁদে। ভোর হলে বিষাদের প্রতিমার মত সংসারসীমায় এসে দাঁড়ায়। প্রভুর বিরহই বুঝি একদিন সাপ হয়ে দেখা দিল ঘরের মধ্যে। লক্ষ্মীর পায়ে এসে দংশন করল। কত ওঝা ডাকল শচী, কত বিষবৈদ্য, কিছুতেই কিছু হল না। প্রভুর পাদপদ্ম হৃদয়ে নিয়ে লক্ষ্মী চোখ বুজল।

'প্রভুর বিরহসর্প লক্ষ্মীরে দংশিল।
বিরহসর্প বিষে তাঁর পরলোক হৈল॥'

তারপর ?

তুলসীদামে সাজিয়ে তাকে আনা হল গঙ্গাতীরে। উঠল হরিনাম-কীর্তনের তুফান। ধ্বনিত হল লক্ষ্মীর বিজয়-যাত্রার রথধ্বনি।

শচী শোকে একেবারে ভেঙে পড়ল।

লোকানুকরণ দুঃখ নিমাইকেও পেয়ে বসল ক্ষণকাল। পরে

আত্মস্থ হয়ে বললে, 'মা, কার কে পতি? কার কে পুত্র? শুধু মোহই পতি-পুত্র-প্রতীতির কারণ। সমস্ত সংসার ঈশ্বরের অধীন, ঈশ্বরের অনুবর্তী। যত সংযোগ-বিয়োগ সব ঈশ্বর-ইচ্ছায়। সুতরাং যা ঈশ্বর-ইচ্ছায় ঘটছে তার জন্যে দুঃখ কিসের?'

চোখ মুছলেও জল থেকে যায় শচীর চোখে।

নিমাই বললে, 'তার কত বড় সুকৃতি বলো তো। সে স্বামীর আগে গিয়েছে, স্ত্রীর এর চেয়ে আর বড় কী আকাঙ্ক্ষার থাকতে পারে?' 'স্বামীর অগ্রেতে গঙ্গা পায় যে সুকৃতি। তার বড় আর কেবা আছে ভাগ্যবতী?' মৃত্যু কোথায়? সমস্ত শোকের পরপারে আনন্দস্বরূপের অবস্থান। তাকে দেখ।'

'একলে ঈশ্বর তত্ত্ব—চৈতন্য ঈশ্বর।
ভক্ত ভাবময় তাঁর শুদ্ধ কলেবর॥
কৃষ্ণমাধুর্যের এক অদ্ভুত স্বভাব।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করে ভক্তভাব॥'

অন্যনিরপেক্ষ ভগবান ভক্তভাব ধরেছেন অভাববশে নয় স্বভাব-বশে। রসিকশেখর কৃষ্ণ ভক্তভাব অঙ্গীকার করে চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। কৃষ্ণ নিজের বিগ্রহ বা শরীরের চেয়েও ভক্তকে প্রিয়তর বলে মানে। ভক্ত শুধু কৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদন করে না, কৃষ্ণমাধুর্য চর্বণ করে।

তুমি আমার প্রিয়তম। উদ্ধবকে বলছেন শ্রীকৃষ্ণ। তুমি যত প্রিয় আত্মযোনি ব্রহ্মা তত নয়, নয় শঙ্কর, নয় বা সঙ্কর্ষণ। অন্যে কা কথা, লক্ষ্মীও তত প্রিয় নয়। তোমাকে বলব কি উদ্ধব, আমি নিজেও আমার কাছে তত প্রিয় নই।

১৬
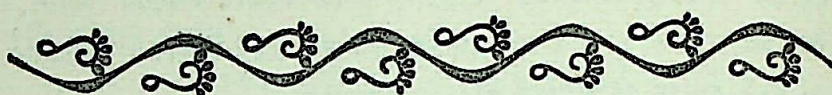
জীবনের সুখবাসনা আগন্তুকী নয়, স্বাভাবিকী। কিন্তু তার সুখ কিসে? একমাত্র রসস্বরূপকে পেয়ে। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। জীব আনন্দী শুধু রসবস্তুকে পেয়ে। আর, সেই আনন্দকে একবার জানলে আর ভয় নেই। ন বিভেতি কুতশ্চন।

সেই আনন্দকে জানি কী করে? পাই কী করে? অনুভবে। আস্বাদনে। আস্বাদনের উপায় কী? সান্নিধ্য। আর সান্নিধ্যের তপ্তুতা ও গাঢ়তা সেবায়। আর, প্রেমভক্তি ছাড়া কি সেবা সম্ভব? সুতরাং প্রেমভক্তিই সাধ্যবস্তু।

দ্বাপরে কৃষ্ণ, কলিতে গৌরাঙ্গ। ব্রজেন্দ্রনন্দন আর শচীনন্দন। উভয় লীলার সেবাতেই আস্বাদনের পূর্ণতা। 'এথা গৌরচন্দ্র পাব সেথা রাধাকৃষ্ণ।'

কৃষ্ণসেবার চার ভাব। দাস্য সখ্য বাৎসল্য আর মধুর। মধুরই সব ভাবের শ্রেষ্ঠ, মধুরই সাধ্য-শিরোমণি। মধুরেরই আরেক নাম কান্তা প্রেম। 'পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে।' আরেক নাম শৃঙ্গার। 'সব রস হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী।' কিন্তু সঙ্গম-সুখ থেকেও সেবা-সুখ বেশি মধুর। 'কান্তসেবা সুখপুর, সঙ্গম হইতে সুমধুর, তাতে সাথী লক্ষ্মী ঠাকুরাণী। নারায়ণের হৃদে স্থিতি, তবু পাদসেবায় মতি, সেবা করে দাসী অভিমানী।'

শ্রদ্ধাই সাধনের মূল। শ্রদ্ধা কাকে বলে? শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসই শ্রদ্ধা। কৃষ্ণভক্তি করলেই সমস্ত কর্ম করা হল, আলাদা করে আর কিছু করতে হবে না—এই শাস্ত্রকথায় নির্বিচল বিশ্বাসের নামই শ্রদ্ধা। 'শ্রদ্ধাশব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়। কৃষ্ণভক্তি কৈলে

সর্ব কর্ম কৃত হয়।' আর এই শ্রদ্ধার মূল সাধুসঙ্গে। 'সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়॥' আর, কৃষ্ণরতিই সর্বসিদ্ধি। 'কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়। সাধুসঙ্গে তার কৃষ্ণে রতি উপজয়॥' আর, কৃষ্ণরতি কৃষ্ণভক্তিই সাধন। আর, সেই সাধনের উপচার হরিনাম। নামকীর্তন।

এ কে এল নবদ্বীপে?

একে চেন না? বিদ্যায় বাকি দেশ জয় করে এসেছে। নবদ্বীপ জয় করতে পারলেই অদ্বিতীয় হতে পারবে। নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা গেল কোথায়? ঘরের কোণে মুখ লুকোল নাকি?

বিস্তর হাতি-ঘোড়া-দোলা লোকজন নিয়ে এসেছে। চালচলন দেখে মনে হয় যেন অঢেল পয়সা। বিদ্যার ঔজ্জ্বল্য নিয়ে এসেছে কিন্তু বিনয় নেই একবিন্দু। আটোপটঙ্কারে কথা কইছে। কে আছ নবদ্বীপে, যদি সাহস না থাকে, আমাকে লিখে দাও জয়পত্র।

কে এ পণ্ডিত? এর নাম কী?

কেশব পণ্ডিত।

দেশ কোথায়?

কাশ্মীর।

কী এর বৈশিষ্ট্য?

ইনি সরস্বতীমন্ত্রের উপাসক। সরস্বতীর বরপুত্র। তাঁর নখাগ্রে সর্বশাস্ত্রের অধিষ্ঠান। শুধু তাই নয়, তার জিহ্বায় স্বয়ং সরস্বতী প্রবক্তা। সরস্বতীর বরে দিগ্বিজয়ী।

নবদ্বীপের পণ্ডিতের দল ভড়কে গেল। স্বয়ং সরস্বতীর সঙ্গে কে বিচার করবে?

তাহলে ধূলিসাৎ হল নবদ্বীপের মান। সকলে দস্তখৎ করে জয়পত্র তবে লিখে দাও কেশবকে।

জ্যোৎস্নাভরা সন্ধ্যা। গঙ্গার ঘাটে পড়ুয়াদের নিয়ে বসে আছে

নিমাই। পুরোনো পড়া আলোচনা করছে। বেড়াতে বেড়াতে সেখানে হাজির হল কেশব।

যোগপট্ট ছন্দে বপু বাঁধা, বাম উরুর উপর দক্ষিণ চরণ রেখে শাস্ত্রব্যাখ্যা করছে, কে এই পণ্ডিত—থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল দিগ্বিজয়ী।

সঙ্গের লোক বললে, 'ইনিই নিমাই পণ্ডিত।'

'কী পড়ায় ?'

'ব্যাকরণ। আর ব্যাকরণের মধ্যে সবচেয়ে যা সোজা সেই কলাপ।'

অবজ্ঞার হাসি হাসল কেশব। যে সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ তাকেই লোকে পণ্ডিত বলে। যার শুধু ব্যাকরণে জ্ঞান সে পণ্ডিত হয় কী করে ? তাকাল আরেকবার নিমাইয়ের দিকে। কী অপূর্ব সুন্দর দেখতে। সিংহগ্রীব, গজস্কন্ধ, সুবলিত মস্তকে চাঁচর কেশ, প্রদীপ্ত চোখ, সমস্ত মাঠঘাট আলো করে বসেছে। কিন্তু সামান্য বৈয়াকরণিককে আমার ভয় কী। দিগ্বিজয়ীর প্রতিদ্বন্দ্বী হয় এমন কী আছে তার প্রতিষ্ঠা ! যাই একবার দেখি বাজিয়ে।

গঙ্গার বন্দনা করে নিয়ে দিগ্বিজয়ী এগুলো নিমাইয়ের দিকে।

তার সঙ্গের লোক পরিচয় করিয়ে দিল।

সশিষ্য উঠে দাঁড়াল নিমাই। সাদরে অভ্যর্থনা করল। বললে, 'বসুন।'

'তুমিই বুঝি নিমাই পণ্ডিত ? দেখতে তো প্রায় বালকের মত। কী পড়াও ? ব্যাকরণ ?' কেশবের প্রশ্নে প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞা : 'বাল্যশাস্ত্র ? আর তাও নাকি শুনতে পাই, কলাপ ? যা সবচেয়ে সরল, শিশুবোধ্য।'

'তাও পড়াতে পারি এমন অভিমান করতে পারিনা।' নিমাই বললে সবিনয়ে, 'আমি নিজেও কিছু বুঝিনা, শিষ্যদেরও পারিনা কিছু বোঝাতে।'

'পারোনা ? কলাপ তো জলের মত তরল।'

'কোথায় আপনি সর্বশাস্ত্রে সর্বকবিত্বে প্রবীণ, আর কোথায়

আমি নবীন বিদ্যার্থী। আপনার সঙ্গে কি আমার তুলনা!' নিমাই তৃণের মত হয়ে বললে। 'আপনার কবিত্ব শুনতে বড় ইচ্ছা হয়। কৃপা করে গঙ্গার মহিমা কিছু বর্ণনা করুন। কাব্য আস্বাদ করা যাবে। সঙ্গে সঙ্গে ঘটবে পাপমোচন।'

সগর্বে দিগ্বিজয়ী মনে মনে শ্লোক রচনা করে মুখে আওড়ে যেতে লাগল অনর্গল। একাদিক্রমে একশো শ্লোক। আর, আবৃত্তি করে যাচ্ছে উদ্দাম ঝড়ের মত, চিন্তা করবার জন্যেও কোনো ছত্রে বিন্দুমাত্র ছেদ টানছে না। সন্দেহ কি, জিহ্বাগ্রে স্বয়ং সরস্বতী বসেছে, নইলে এই শক্তি মানুষে সম্ভব হয়? শ্রোতারা সবাই উল্লাসে হরি-হরি করে উঠল। যত শব্দ ছন্দ অলঙ্কার সব যেন হাত ধরাধরি করে মেতেছে আনন্দনৃত্যে। এ অদ্ভুতশক্তি লোকের সঙ্গে নিমাই আঁটবে কি করে? নিমাইয়ের জন্যে সকলের কষ্ট হতে লাগল।

কিন্তু নিমাই নিঃসঙ্কোচ। নিরুদ্বেগে বললে, 'সত্যি আপনার মত কবি নেই আর পৃথিবীতে। কার সাধ্য প্রাক্‌ভাবনা না করে এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন কবিত্বময় শ্লোক রচনা করতে পারে। কার বা সাধ্য আদ্যোপান্ত অর্থ বোঝে। আসল বোদ্ধা আপনি আর আপনার বরদাত্রী সরস্বতী। ইচ্ছে করে এই শ্লোকগুলির মধ্য থেকে যে কোনো একটা বেছে নিয়ে তার ব্যাখ্যা করেন নিজমুখে!'

'বেশ তো বলো কোন শ্লোকটার ব্যাখ্যা চাও।' গর্বভরে তাকাল কেশব।

'আমি বলব? আপনার রচনা, আমার কি মনে আছে?'

'তা তো ঠিকই। তবু আভাস দাও, ভাবার্থ দিয়ে বোঝাও কোনটার ব্যাখ্যা প্রয়োজন।'

'আচ্ছা, বলি।' বলে গোটা একটা শ্লোকই আবৃত্তি করল নিমাই। উচ্চঘোষে বললে,

'মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তি সুভগা।

দ্বিতীয়শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্যচরণা
ভবানীভর্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা ॥'

কেশবের চক্ষুস্থির। বললে, 'সে কী কথা? ঝঞ্ঝাবাতের মত একশোটা শ্লোক হু-হু করে বলে গেলাম, তার মধ্যে থেকে এটাকে বেছে নিয়ে কণ্ঠস্থ করলে কী করে? তুমি কি শ্রুতিধর?'

নিমাই নম্রমুখে বললে, 'সরস্বতীর বরে তুমি যেমন কবি হয়েছ, তেমনি কেউ শ্রুতিধরও তো হতে পারে।'

সবিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল কেশব। এমন অসম্ভব শ্রুতিধর কে কোথায় দেখেছে!

'শ্লোকটার ব্যাখা করুন।'

'ব্যাখ্যা তো সোজা।' উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ করে বলতে লাগল কেশব: 'যে শ্রীবিষ্ণুর চরণকমল থেকে উৎপন্ন হয়েছে বলে সৌভাগ্যবতী, সুরনরগণ যার চরণ দ্বিতীয় লক্ষ্মীর চরণের মত পূজা করে, যে ভবানীভর্তার মাথায় বিরাজিত বলে অদ্ভুতগুণান্বিতা, সেই গঙ্গার এ মহিমা নিশ্চিতরূপে নিরন্তর দীপ্তি পাচ্ছে।'

নিমাই বললে, 'ভালো কথা, এবার তবে শ্লোকের দোষ-গুণ বিচার করুন।'

কেশব ক্রুদ্ধ হল। বললে, 'এ শ্লোকে দোষের লেশস্পর্শ নেই। সমস্তই এর গুণ। দুটো অলঙ্কার দেখতে পাচ্ছ না? একটা উপমা, আরেকটা অনুপ্রাস—'

'কিন্তু দোষ?'

'দোষ?' ক্রোধের মাত্রা আরও বেড়ে গেল কেশবের: 'তুমি তো বৈয়াকরণ, শিশুপাঠ্য কলাপের শিক্ষক, তুমি অলঙ্কার কী বুঝবে? তুমি তো আর অলঙ্কার পড়নি। আমার শ্লোকে কবিত্বের যে সার নিহিত আছে তা বোঝ তোমার বিদ্যা কই?'

'অলঙ্কার পড়িনি বটে,' নিমাই বললে শান্তস্বরে, 'কিন্তু লোকমুখে শুনেছি কিছু কিছু। যা শুনেছি তার থেকে বলতে

পারি, আপনি রুষ্ট হবেন না, আপনার এই শ্লোকে পাঁচটি দোষ আছে—'

'মিথ্যে কথা।' হুঙ্কার ছাড়ল দিগ্বিজয়ী।

'ব্যস্ত হবেন না, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি।' নিমাই বলতে লাগল : 'যে বস্তু অজ্ঞাত তাকে বলে বিধেয়, আর যে বস্তু জ্ঞাত তাকে বলে অনুবাদ। অলঙ্কারশাস্ত্রের নিয়ম কী? তার নিয়ম আগে অনুবাদ বসবে, পরে বিধেয়। এ নিয়মের ব্যতিক্রম হলে অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ দোষ হয়। এখন দেখুন, আপনার শ্লোকের প্রথম ছত্রের এই কথাটা : মহত্বং গঙ্গায়াঃ ইদং। এখানে, গঙ্গার কী মহত্ব, প্রারম্ভেই জানা যায় না। সুতরাং মহত্ব কথাটা বিধেয়। আর ইদং—জ্ঞাতবস্তুকে জানাবার শব্দ, সুতরাং এটা অনুবাদ। মহত্বং গঙ্গায়াঃ ইদং না বলে বলা উচিত ছিল ইদং গঙ্গায়াঃ মহত্বং। সুতরাং বাক্যের বিন্যাসে পরিস্ফুট অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ দোষ ঘটেছে।'

বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল কেশব।

'ও রকম দোষ আরো একটা ঘটেছে। ধরুন দ্বিতীয়শ্রীলক্ষ্মীরিব কথাটা। এখানে লক্ষ্মী জ্ঞাত, তাই সে অনুবাদ। কিন্তু দ্বিতীয় লক্ষ্মী বলতে কী কোথায় কাকে বোঝায়, তা অজ্ঞাত। সুতরাং দ্বিতীয় শব্দ বিধেয়, লক্ষ্মী শব্দ অনুবাদ। দ্বিতীয়শ্রীলক্ষ্মীরিব বলাতে অনুবাদ আগে না বলে আগে বিধেয় বলাতে, এখানেও অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ দোষ হয়েছে। অন্য দোষও দেখাচ্ছি।'

বলে কী বালক! হতচেতনের মত তাকিয়ে রইল দিগ্বিজয়ী।

'হ্যাঁ, বিরুদ্ধমতিকৃৎ দোষ।'

'সে আবার কোথায়?'

'ধরুন ভবানীভর্তৃ কথাটা। কথাটার মানে কী? মানে হচ্ছে, ভবানীর স্বামী। ভব বা মহাদেবের যে পত্নী অর্থাৎ দুর্গা—সেই ভবানী। এখন ভবানীর স্বামী বললে মহাদেবকেও বোঝানো যায়, আবার মহাদেব ছাড়া ভবানীর অন্য স্বামী আছে—এ ভাবনাও

অসম্ভব হয় না। প্রকৃত অর্থের প্রতিকূল ইঙ্গিত যদি এসে পড়ে তাকেই বিরুদ্ধমতিকৃৎ দোষ বলে। যদি ব্রাহ্মণ-পত্নীর ভর্তা বলা হয়, তা হলে সেটা খোদ ব্রাহ্মণও হতে পারে, আবার ব্রাহ্মণপত্নীর দ্বিতীয় স্বামীও বাতিল হয়ে যায় না।'

'আর নেই ?' দিগ্বিজয়ী বুকের মধ্যে কাঁপতে লাগল।

'আরো দুটো আছে। একটা পুনরাত্ত, আরেকটা ভগ্নক্রম।' নিমাই বলল স্বচ্ছন্দে।

'আমাদের সবাইকে বলুন বুঝিয়ে।' শ্রোতার দল চঞ্চল হয়ে উঠল।

'ক্রিয়াপদের ব্যবহারের পরেই বাক্যের সমাপ্তি ঘটা সমীচীন। বিভবতি—এই ক্রিয়াপদেই বাক্যের শেষ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু, না, ক্রিয়াপদের পরে 'অদ্ভুতগুণা' এই বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে। তাই এখানে ঘটেছে পুনরাত্ত।'

'কিন্তু ভগ্নক্রম !' শ্রোতাদের মধ্য থেকে কে বলে উঠল।

'বলছি। এই শ্লোকে চারটি চরণ বা ছত্র আছে। প্রথম চরণে "ত"-এর অনুপ্রাস, তৃতীয় চরণে "র"-এর অনুপ্রাস, চতুর্থ চরণে "ভ"-এর অনুপ্রাস, কিন্তু দ্বিতীয় চরণে দেখছ কোনোই অনুপ্রাস নেই। আদ্যোপান্ত একই নীতি মানা হলনা বলে ভগ্নক্রম দোষ হয়েছে। যদি দ্বিতীয় চরণে অনুপ্রাস থাকত, কিংবা প্রত্যেক চরণই অনুপ্রাসমুক্ত থাকত, তা হলে ঘটত না ভগ্নক্রম।'

'কিন্তু গুণ ?'

'বলেছি তো পাঁচটা গুণও আছে, কিন্তু যা দেখলাম, ঐ পাঁচ দোষেই সমস্ত গুণ ছারখার হয়ে গেছে। সুন্দর শরীরে যদি একটিও ধবল কুষ্ঠের দাগ থাকে, যত ভূষণেই তাকে সাজাও না, সেই এক দাগের দোষে সমস্ত অলঙ্কার মূল্যহীন।' নিমাই তাকাল দিগ্বিজয়ীর দিকে। বললে, 'দেবতার প্রসাদে আপনি লোকোত্তর প্রতিভা পেয়েছেন, যার বলে নির্বিচারে কবিতা তৈরি করলেন অনর্গল, কিন্তু

রচনার বিচার না থাকলে দোষ এসে পড়ে অলক্ষ্যে।' 'বিচারি কবিত্ব কৈলে হয় সুনির্মল। সালঙ্কার হৈলে অর্থ করে ঝলমল॥'

নিমাইয়ের কথা শুনে, কাণ্ড দেখে, দিগ্বিজয়ী স্তম্ভিত হয়ে গেল। পরাভবের লজ্জায় মুখ তুলতে পারছে না, কথা আসছে না কণ্ঠে। প্রতিবাদ তো দূরস্থান। শেষকালে একটা 'পড়ুয়া বালকের' কাছে অপমানিত হতে হল। কিন্তু যে ব্যাখ্যা করল সে তো সাধারণের সাধ্য নয়। তার জিহ্বার সরস্বতী কি স্থান বদলে বসল গিয়ে নিমাইয়ের রসনায়? কে এই বালক?

'তোমার ব্যাখ্যা শুনে আশ্চর্য লাগছে। অলঙ্কার পড়নি, কোনো শাস্ত্রাভ্যাস নেই। অথচ এ সব অর্থ প্রকাশ করলে কী করে?'

'আমি কী জানি! সরস্বতী যা বলতে বলল তাই বললাম।'

'আর আমি সরস্বতীর বরপুত্র, আমাকে তিনি নির্জিত করলেন 'শিশুদ্বারে'।' ক্ষোভে-লজ্জায় পুড়ে যেতে লাগল কেশব: 'আমার বিচার বুদ্ধি আচ্ছন্ন করে রেখে আমাকে দিয়ে অশুদ্ধ শ্লোক রচনা করালেন। একটা সিদ্ধান্ত স্ফুরণও হল না আমার! কেন? কেন?'

নিমাইয়ের শিষ্য ছাত্রেরা এতক্ষণ চুপ করে ছিল, এখন দিগ্বিজয়ীর এই নিশ্চিত পরাজয়ে তারা উল্লাস করে উঠল। কী অভ্রংলিহ অহঙ্কার! নিমাইকে কত উপেক্ষা, কত অবজ্ঞা। শুধু বাল্যশাস্ত্র ব্যাকরণ পড়াও, তাও আবার সরলতম কলাপ। তুমি কাব্য বিচারের কী বুঝবে! যে অলঙ্কারশাস্ত্র পড়েনি তার আবার কাব্য জিজ্ঞাসা কিসের। কত আস্ফোট, কত বাগাড়ম্বর। কিন্তু আমাদের নিমাইকে দেখ তো। কী অগাধ বিদ্যা অথচ কী সুন্দর বিনয়। যেমন নির্ভয় তেমনি নিরভিমান। দিগ্বিজয়ীর এমনি হেরে যাওয়া নয়, যাকে হেয় জ্ঞান করেছে তার কাছে হেরে যাওয়া। তাই নিমাইয়ের দলের ছেলেরা দিগ্বিজয়ীকে পরিহাস করে উঠবে তা আর বিচিত্র কি।

কিন্তু নিমাই শাসন করল। নিবৃত্ত করল শিষ্যদের।

বরং প্রশংসা করল দিগ্বিজয়ীর। বললে, 'কাব্যের দোষগুণের বিচার সামান্য ব্যাপার। আসল বিষয় কবিত্বশক্তি, কবিতারচনার ক্ষমতা। আপনি সে শক্তিতে অতুলন। সূক্ষ্ম চোখে দেখতে গেলে কবিত্বে দোষ কার বা নেই বলুন, কালিদাস ভবভূতিতেও আছে। আপনার কবিতা গঙ্গাজলধারার মত পবিত্র আর অচ্ছিন্নস্রোত। যার মুখ দিয়ে অমন কাব্যবাক্য বেরোয় সে মহাকবি-শিরোমণি।' বিনয়ে আরও স্নিগ্ধ হল নিমাই: 'আমার শৈশবচাপল্য মার্জনা করবেন। আপনার কবিত্বের সত্যিকার দোষগুণ বিচার করি, আমার এমন যোগ্যতা নেই। আপনি শ্রান্ত হয়েছেন, রাতও অনেক হল, বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম করুন। কাল আবার না হয় বিচার করা যাবে।'

'এইমত প্রভুর কোমল ব্যবসায়।
যাহারে জিনেন সেহো দুঃখ নাহি পায়॥'

শিষ্যেরা ঘিরে ধরল নিমাইকে: 'কেন, কেন, দিগ্বিজয়ীর পতন হল?'

'আর কেন! শুধু অহঙ্কার। এই বিপ্রের অহঙ্কার হয়েছিল—জগৎসংসারে তার কেউ প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। যেই আসবে সেই পরাস্ত হবে।' হাসল নিমাই: 'সরস্বতী তা সইবে কেন?'

'শুন ভাই সব! এই কহি সত্য কথা।
অহঙ্কার না সহেন ঈশ্বর সর্বথা॥
যে যে গুণে মত্ত হই করে অহঙ্কার।
অবশ্য ঈশ্বর তাহা করেন সংহার॥
ফলবন্ত বৃক্ষ আর গুণবন্ত জন।
নম্রতা সে তাহার স্বভাব অনুক্ষণ॥'

'দিগ্বিজয়ীকে সভামধ্যে জয় করলে আরো ভালো হত।' বললে শিষ্যদের কেউ-কেউ, 'তা হলেই ওর শিক্ষা হত সমুচিত।'

'না, সেটা উচিত হত না। সে অপমান ওর মৃত্যুতুল্য হত। ওর

সর্বস্ব লুট করে নিত সকলে। বিরলে জয় করলাম ওকে, যাতে ওর গর্বক্ষয় হয় অথচ মনে ও দুঃখ না পায়।'

দিগ্বিজয়ী বাড়িতে ফিরল বটে কিন্তু ঘুমুতে পেল না। সারারাত সরস্বতীর আরাধনা করল। কী দোষ করেছি যাতে আমার প্রতিভার সঙ্কোচ ঘটল। লোপ পেল বিচারবুদ্ধি।

সরস্বতী দেখা দিলেন। বললেন, 'যার কাছে তোমার পরাজয় হয়েছে, তিনিই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর। আর জেনো আমিই তাঁর পাদপদ্মের দাসী।'

'তুমি তাঁর দাসী?' দিগ্বিজয়ী নিস্পন্দ-আড়ষ্ট।

'হ্যাঁ, তিনি আমার কান্ত, আমার প্রভু। তাঁর কাছে আমার স্ফূর্তি নেই, বরং অগাধ লজ্জা। তুমি যাও, ওঁর কাছে গিয়ে আত্ম-সমর্পণ করো, চরম কবিত্ব লাভ করবে।'

প্রভাত হতেই দিগ্বিজয়ী নিমাইয়ের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত। ডাক শুনে নিমাই বাইরে আসতেই দিগ্বিজয়ী তার পায়ে লুটিয়ে পড়ল।

নিমাই ব্যগ্র হাতে তুলল তাকে মাটি থেকে। বললে, 'সে কী! তুমি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, আর আমি এক অপোগণ্ড বালক। তোমার এ কী দৈন্য।'

দিগ্বিজয়ী কাতর কণ্ঠে বললে, 'আমি জেনেছি তুমি কে। তুমি সরস্বতীপতি নারায়ণ, তুমিই সমস্ত বিদ্যার রাজাধিরাজ। কী শুভক্ষণে এলাম আমি নবদ্বীপ। প্রভু, আমার সমস্ত অবিদ্যা-বাসনার বন্ধন দূর করে দাও। কী করে যাবে দুর্বাসনা। দাও তার উপদেশ।' কাঁদতে বসল দিগ্বিজয়ী।

নিমাই বললে, 'কী আর উপদেশ দেব। সমস্ত জঞ্জাল ছেড়ে, আর সব চেয়ে বড় জঞ্জাল অহঙ্কার, কৃষ্ণ-চরণ ভজনা করো। এই অনর্থ সংসারে যদি কিছু সত্য বস্তু থেকে থাকে তা কৃষ্ণভক্তি। তাই সর্বভূতে দয়া করে কৃষ্ণভক্তি করো।'

'দিগ্বিজয় করিব বিছ্যার কার্য নহে।
ঈশ্বরে ভজিলে, সে বিছ্যায় সভে কহে॥
সেই সে বিছ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবৃত্তি হয়॥'

কেশবকে আলিঙ্গন করল নিমাই। দেখতে-দেখতে কেশবের দেহে ভক্তি, বিরক্তি আর বিজ্ঞান দেখা দিল। তৃণের চেয়ে অধিক এল কোমল নম্রতা, দম্ভের বাষ্পমাত্র রইল না। বাড়ি ফিরে গিয়ে হাতি ঘোড়া দোলা—যা কিছু স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ছিল—সব জনে-জনে বিলিয়ে দিল। কৌপীন পরল, দণ্ডকমণ্ডলু হাতে নিল। সংসার ছেড়ে চলে গেল অসঙ্গ হয়ে।

কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম? কৃষ্ণ ছাড়া এমন দয়ালু কে আছে যে তার ভজনা করব? স্তনলিপ্ত কালকূট পান করিয়ে বালকৃষ্ণের প্রাণনাশ করতে চেয়েছিল পুতনা, তবু বদান্য কৃষ্ণ সেই পুতনাকে ধাত্রীগতি দিলেন, মৃত্যুর পরে সিদ্ধদেহে দিলেন তাকে কৃষ্ণসেবার অধিকার। এত মহৎ করুণা আছে কোথায়? কিন্তু কেন এই করুণা? কাপট্যের অভিনয় হলেও ক্ষণকাল পুতনার মধ্যে ভক্তির আভাস জেগেছিল, জেগেছিল বাৎসল্যের আভাস, যখন সে কৃষ্ণকে কোলে টেনে নিয়েছিল, স্তন্যদানে দেখিয়েছিল উন্মুখতা। যদিও তার অন্তরে জিঘাংসা, যদিও আসলে সে পাপীয়সী, তবু কৃষ্ণের জন্যে ঐটুকু সে করেছিল বলে, কোলে টেনে নিয়েছিল বলে, স্তন্যপান করাতে চেয়েছিল বলে, কৃতজ্ঞ কৃষ্ণ তার দেহান্তরে দিলেন তাকে প্রেমসেবার অধিকার। পুতনা যদি করুণা পায়, আমিও পাব। আমি যে ধরেছি কৃষ্ণভক্তি। জানি আমার গাঢ়তা নেই, একান্ত-চিত্ততা নেই, জানি আমি কাপট্যশেলশূন্য নই, জানি বিষয়ে-বিলাসে আমার চিত্ত বিক্ষিপ্ত—তবু যেহেতু কৃষ্ণকে একটু ভালোবাসার ভাব করেছি, ডেকেছি কৃষ্ণ-কৃষ্ণ, তাতেই তিনি অস্থির হয়ে উঠবেন। তিনি কৃপণ নন, অকৃতজ্ঞ নন, ক্ষুদ্রাত্মা নন। তিনি দাতার রাজরাজেশ্বর।

এই যে নরদেহ পেয়েছি, এই তো তাঁর অনন্ত কৃপা। 'নরতনু ভজনের মূল।' দেবতার দেহে জ্ঞান-ভক্তির সাধন নেই, সে সাধনের সুযোগ শুধু নরদেহে। তাই স্বর্গবাসীরাও এই মর্তদেহের অভিলাষী। কিছু করতে হবেনা, শুধু গুরুকে কর্ণধার করে দেহতরীকে ভবসাগরে ভাসিয়ে দাও। কৃপার বাতাস বইছে, অনুকূল তরঙ্গে নিয়ে যাবে গন্তব্যে, মনোহরের বন্দরে।

শুধু চলো, চলো আর চলো।
অর্থান্তরে, ব্রজ, ব্রজ, ব্রজ।

১২

তড়িতের প্রতিমা ঝলমল করছে, এ মেয়েটি কে? না, বিয়ে হয়নি তো! কার মেয়ে? আমার নিমাইয়ের সঙ্গে মানাবে?

'তোমার বাবার নাম কী?' জিগগেস করল শচী দেবী।

'সনাতন মিশ্র।'

'আর তোমার নাম?'

লজ্জায় গলে গেল মেয়েটি। বললে, 'বিষ্ণুপ্রিয়া।'

'বা, বেশ নাম। কী আর আশীর্বাদ করব! সুন্দর বর হোক তোমার। বিষ্ণুর মত বর।'

লজ্জায় আরো মধুর হয়ে উঠল মেয়েটি।

তাকে আশীর্বাদ না করে কি থাকা যায়? যখনই শচী যায় গঙ্গাস্নানে, দেখে মেয়েটিও এসেছে। রোজ রোজ তারও স্নান করা চাই। শচীর সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্রই মেয়েটি এগিয়ে আসে, প্রণাম করে নম্র হয়ে। মামুলি বিধিতে নয়, হৃদয়ের ডাক শুনে। কেমন ইচ্ছে করে শচী দেবীর কাছ ঘেঁসে দাঁড়ায়, দুটো মিষ্টি কথা শোনে,

একটু বা আদর কুড়োয়। যদি বলেন একটু বা সেবা করে। বড় ভালো লাগে শচী দেবীকে।

আর এগারো বছরের মেয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া যেমনি সুষমার লতিকা তেমনি লজ্জার নবমঞ্জরী। সব চেয়ে বড় কথা, ভক্তিতে ভরপুর। দিনে তিন বার গঙ্গাস্নান করে বালিকা, প্রতিবারই স্নানান্তে পূজা করে তীরে বসে।

ভগবানকে বলা হয়েছে অপবর্গ-বর্ত্ম। তার মানে তাঁর দিকে অগ্রসর হলে পথেই অপবর্গ বা মোক্ষের সঙ্গে দেখা হয়। কিন্তু যে ভক্তি করে সে এড়িয়ে যায় মুক্তিকে। মুক্তিতে তার রুচি নেই, স্পৃহা নেই। তার স্পৃহা প্রেমে, তার রুচি সেবায়। ভগবান তাকে মোক্ষ দিতে চাইলেও সে নেবেনা। 'দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।' তুমি যদি আমাকে মোক্ষ দিয়েই উড়িয়ে দিতে চাও তা হলে আমি দাঁড়াই কোথায়, তোমার সেবা করি কি করে?

এই মেয়েকে ঘরে নিয়ে গেলে কেমন হয়? নিমাইয়ের বউ করে?

'এ কন্যা আমার পুত্রে হউক ঘটনা।'

ঘটক কাশী মিশ্রকে ডেকে পাঠাল শচী। এলে জিগগেস করল, 'সনাতন মিশ্রকে চেন?'

'চিনি বৈ কি। বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। পদবী রাজপণ্ডিত।'

আদান-প্রদানের ঘর। মুখচোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল শচীর।

'সম্পন্ন গৃহস্থ। চরিত্রে লোককান্ত। উদার, অকৈতব, সত্যবাদী।' কাশী মিশ্র গুণের ফিরিস্তি খুলে ধরল।

মুখ ম্লান হয়ে গেল শচীর। এত বড় কুলীন, সঙ্গতিমান, সে কি আর আমার মত কাঙালের ঘরে মেয়ে দেবে? পিতৃহীন বালককে কি সে পছন্দ করবে?

তবু মনের কথা ব্যক্ত করল শচী। বললে, 'সনাতনের একটি বিবাহযোগ্যা মেয়ে আছে। সুচরিতা, সুশ্রী মেয়ে। তাকে নিমাইয়ের জন্যে এনে দেবে?'

কাশী মিশ্র মুঢ়ের মত তাকিয়ে রইল।

'বড় ইচ্ছে তাকে বউ করে নিয়ে আসি।' শচী দেবী বলল আকুল হয়ে, 'গঙ্গার ঘাটে ওকে দেখে দেখে ওর উপর ভারি মায়া পড়ে গেছে। দেখলেই ইচ্ছে করে কোলের কাছে টেনে নিই। আদর করি।'

'বড় কঠিন কাজ দিলেন।' কাশী মিশ্র মাথা চুলকোতে লাগল: 'এক নিঃস্ব পরিবারের সঙ্গে কি সনাতন ঘনিষ্ঠ হতে চাইবেন?'

'তবু তুমি দেখো চেষ্টা করে। আমার নিমাই কি তুচ্ছ, অকিঞ্চন?'

দুর্গা বলে রওনা হল কাশী। তাকে দেখে সনাতন ব্যস্ত হয়ে উঠল। বললে, 'আসুন, আসুন। কী মনে করে?'

আসন গ্রহণ করে কাশী মিশ্র বললে, 'আপনি বিশ্বম্ভর পণ্ডিতকে চেনেন?'

'সে আবার কে?'

'বা, আমাদের নিমাই পণ্ডিত। তার নাম শোনেন নি?' চমকে ওঠবার ভাব করল কাশী।

'না, না, নাম শুনেছি। কোন এক কাশ্মীরী পণ্ডিতকে তর্কে হারিয়ে দেবার পর তার নাম খুব ছড়িয়ে পড়েছে। আমার কানেও এসেছে সেকথা।'

'দেখেন নি তাকে?'

'নবদ্বীপে কত লোকের বাস, সবাইকে কি আমি দেখেছি?' সনাতন উৎসুক হয়ে বললে, 'কেন, দেখতে কি খুব সুন্দর?'

'সে বর্ণনার নয়। বেড়াতে বেড়াতে যাবেন একদিন গঙ্গার ঘাটে, স্বচক্ষে দেখে আসবেন। দেখবার পর কয়েক পা ফিরে এসে আবার যাবেন। ফিরবেন ঘুরবেন আবার যাবেন। শেষে আর সরতে ইচ্ছে করবে না। ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবেন।'

'যাব একদিন।' বললেন সনাতন।

'কী চোখে দেখবেন তা আপনিই জানেন।' কাশী মিশ্র উঠে পড়ল : 'কিন্তু একটা কথা আপনাকে বলে যাই। নিমাইয়ের মতন দ্বিতীয় পাত্র নেই নবদ্বীপে।'

কয়েক দিন পরে খবর দেবেন জানালেন সনাতন।

শচী ভাবল নিশ্চয়ই সনাতন মত করবে না। নিমাই সহায়-সম্বলহীন এক টোলের পণ্ডিত, তাকে কি সনাতনের মত লোক মেয়ে দেয়?

সনাতন দেখলেন নিমাইকে। স্তম্ভিত হয়ে রইলেন। এ কি মানুষ না দেবতা? দেখেই মনে হয় সমস্ত রূপই তার কৃষ্ণবিলাস, সমস্ত বিদ্যাই তার কৃষ্ণভক্তি।

শুভ ও অশুভ দুই কর্মই কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল। শুভকর্ম মানে পুণ্য, অশুভকর্ম পাপ। সে কি, পুণ্যও ভক্তির প্রতিকূল? হ্যাঁ, পুণ্য আর পাপ দুইই ভক্তির বিসংবাদী। কেন, পুণ্য কেন? পুণ্য লোকে করে কী আশায়? নিজের সুখের আশায়। পুণ্যের পিছনে শুধু আত্মেন্দ্রিয়প্রীতির বাসনা। তাই পুণ্য শুধু ছলনা মাত্র। তাই পুণ্য কৃষ্ণভক্তির বাধক। পুণ্যের ফলে যখন সুখভোগ হয় তখন তাতে মত্ত হয়ে পুণ্যবান কৃষ্ণভজনের কথা আর মনে করে না। আর পাপের উদ্দেশ্য তো শুধু ইন্দ্রিয়তর্পণ। আর, কিছুতেই তৃপ্তি হয়না বলেই তো পাপীর যন্ত্রণা। কি করে এই যন্ত্রণার হাত থেকে নিস্তার পাবে তারই জন্যে পাপী থাকে চঞ্চল হয়ে, কৃষ্ণভজনের কথা ভুলে যায়। তাই শুভ ও অশুভ দু রকম কর্মই কৃষ্ণভক্তির বিরুদ্ধ।

নিমাইয়ের সমস্ত দেহ থেকে জ্যোতি গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু এ যেন প্রাকৃত জ্যোতি নয়, চিন্ময় জ্যোতি। যেমন জ্যোতিষ্মান বস্তু তেমনি তার জ্যোতি। সূর্য প্রাকৃত বলে তার জ্যোতিও প্রাকৃত। কিন্তু নিমাই যেন অপ্রাকৃত চিদ্‌বস্তু আর তার জ্যোতিও অপ্রাকৃত চিন্ময়। এ যেন এক মায়াতীত অবস্থান।

সনাতনের মনে হল এ-হেন অসামান্য কি আমার মেয়েকে মনোনীত করবে?

বাড়িতে এসে গৃহিণীকে বললে। বললে, 'মেয়েকে পাত্রস্থ করবার জন্যে পালটা ঘর পেয়েছি।'

'পাত্র কে?'

'জগন্নাথ মিশ্রের ছেলে নিমাই।'

'করে কী?'

'প্রকাণ্ড পণ্ডিত।'

'পণ্ডিত? আহা, খুব ভালো। কিন্তু সে কি আমার মেয়েকে পছন্দ করবে?'

তখনকার দিনে ধনবানের চেয়ে বিদ্বানের মান বেশি। কৌলীন্য কাঞ্চনে নয়, কৌলীন্য পাণ্ডিত্যে। তাই সেদিন, ধনী হয়তো দোলা করে যাচ্ছে, পথে দেখা হল এক পণ্ডিতের সঙ্গে, তক্ষুনি দোলা থেকে নামল ধনী, পণ্ডিতকে বহুমানে নমস্কার করল। তখনকার দিনে বরাসন পণ্ডিতকে, বিত্তশালীকে নয়। পণ্ডিতই অভিজাত। পণ্ডিতই সর্বজয়ী, অভিজিৎ।

কাশী মিশ্রকে খবর দিলেন সনাতন। বললেন, 'বহু পুণ্যে নিমাইয়ের মতন জামাই মেলে। আপনি শচী দেবীকে গিয়ে বলুন আমরা মেয়ে দিতে রাজি আছি। এখন তিনি যদি নেন কৃপা করে তবে আমাদের নদীয়াবসতি সার্থক হয়।'

বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয়ে নবদ্বীপচন্দ্রের উদয় হল। নবানুরাগে পাগলিনী হল কিশোরী। চতুর্দিকে শ্যামলকে দেখবার জন্যে নবীন মেঘের নীল অঞ্জন চোখে লাগল শ্রীমতীর। কিন্তু দুই চোখে তাকে ধরে রাখতে পারছি কই? মাধুর্যামৃতের সমুদ্র দৃষ্টির কূল ছাপিয়ে উছলে উছলে পড়ছে।

অবিদগ্ধ বিধাতাকে নিন্দা করছে শ্রীমতী। 'অতৃপ্ত হইয়া করে বিধির নিন্দন, অবিদগ্ধ বিধি ভাল না জানে সৃজন।' কোনো কিছুই

ভালো করে বুদ্ধি খরচ করে সৃষ্টি করেনি ভগবান। যাকে দেখব সে অন্তহীন সৌন্দর্যের সিন্ধু জেনেও তাকে দেখবার জন্যে মাত্র দুটি নেত্র দিয়েছেন। কোথায় কোটি-কোটি চোখ দেবেন, তা নয়, কৃপণের মত দুটি শুধু চোখ। কৃষ্ণমুখ দর্শন করতে বলে, হায়, দুটি শুধু চোখ দেওয়া। আর এমনই বিধাতা অকুশল, এমনই অনিপুণ, চোখকে আচ্ছাদন করবার জন্যে দিলেন আবার পক্ষ্ম। চোখের পক্ষ্ম যদি না থাকত, যদি পলক না পড়তে পেত, তবে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে দেখতে পারতাম কৃষ্ণকে। বিধাতা নিশ্চয়ই জড়বুদ্ধি, নিতান্তই রসবোধশূন্য। নইলে যে রূপ প্রতিক্ষণে নতুন হচ্ছে তাকে দেখবার জন্যে কিনা এই বিশীর্ণ ব্যবস্থা! কিন্তু কে না জানে কৃষ্ণদর্শন ছাড়া দৃষ্টির তৃপ্তি নেই, নেই বা একবিন্দু সার্থকতা।

'না দিলেক লক্ষ কোটি সবে দিল আঁখি দুটি
তাতে দিল নিমেষ আচ্ছাদন।
বিধি জড় তপোধন রসশূন্য তার মন
নাহি জানে যোগ্য সে সৃজন॥'

শ্রীমতী বৃন্দাকে বললে, প্রিয়সখি, কোত্থেকে আসছ? বৃন্দা বললে, শ্রীকৃষ্ণের পাদমূল থেকে। অসৌ কুতঃ? তিনি কোথায়? শ্রীমতী ব্যাকুল হয়ে তাকাতে লাগল চারদিকে। বৃন্দা বললে, রাধাকুণ্ডের কাছে নির্জন বনে আছেন। তিনি সেখানে কী করছেন? নাচ শিখছেন। বলো কী! তাঁর নৃত্যশিক্ষার গুরু কে? বৃন্দা বললে, তুমি। তুমিই তাঁকে নাচাচ্ছ। সে কী কথা? আমি কোথায়? তুমিই তো, তোমার মূর্তিই তো অরণ্যের সমস্ত তরুলতায় পরিস্ফুট। তোমার মূর্তিই তো উত্তম নটীর মতো শ্রীকৃষ্ণকে নিজের পিছে-পিছে নাচিয়ে-নাচিয়ে ঘুরিয়ে মারছে।

শ্রীকৃষ্ণ যেদিকে তাকায় সেদিকেই রাধাস্ফুর্তি। হাওয়ায় গাছের শাখা দুলছে, লতা দুলছে, শাখা-লতার ছায়া দুলছে, আর শ্রীকৃষ্ণ ভাবছে—সদানন্দবিধায়িনী রাধিকাই বুঝি নৃত্যপরা। নৃত্যগুরুর

অনুকরণে শিক্ষার্থী নট যেমন নাচে তেমনি শ্রীকৃষ্ণও নাচছে তালে-তালে। বাজিকরের ইঙ্গিতে পুতুলের মত।

'রাধিকার প্রেম গুরু, আমি শিষ্য নট।
সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট ॥'

আমি পূর্ণতত্ত্ব, পূর্ণানন্দ। সমস্তরসাশ্রয়। আমি চিন্ময়, স্বপ্রকাশ। আমাতে কোনো অভাব নেই, অভাব পূরণের জন্যে চাঞ্চল্যের অবকাশও নেই, অথচ দেখ, রাধাপ্রেমের কী অচিন্ত্য শক্তি, আমাকে বিহ্বল করছে, উন্মত্ত করছে, কত অদ্ভুতরূপে নাচিয়ে বেড়াচ্ছে। আমি সর্বনিয়ন্তা হয়েও প্রেমে নিয়ন্ত্রিত। আমি সর্বেশ্বর হয়েও আভীরবালিকার পদপ্রান্তে পড়ে বলি, দেহি পদপল্লবমুদারম্। তার চরণযুগল অলক্তরাগে রঞ্জিত করি। সকল ভয়ের ভয়স্বরূপ হয়েও জটিলা-কুটিলার ভয়ে মরি। সত্যস্বরূপ হয়েও ছদ্মবেশ ধরি। গোপপল্লীতে দেয়াশিনী নাপিতানী সেজে কৃপাকটাক্ষ ভিক্ষে করে বেড়াই।

আর কিছু নয়, একমাত্র প্রেমই আমার পরিচালক। 'কৃষ্ণেরে নাচায় প্রেম, ভক্তেরে নাচায়।'

বারে বারে গঙ্গাস্নান করতে আসে বিষ্ণুপ্রিয়া, যদি একবার স্থূল চোখে দেখতে পায় তার বরকে, তার গৌরাঙ্গসুন্দরকে। শচীকে দেখতে পেলেই ছুটে আসে কাছটিতে। প্রণাম করে। প্রণাম সারবার পরেও সরে যায় না। অধোমুখে দাঁড়িয়ে থাকে। ঐ স্নেহাঞ্চলচ্ছায়া ছেড়ে যাব কোথায়? যেন বলে, আমাকে তোমার ঘরে নিয়ে চলো, নিয়ে চলো আমার আরাধনার মন্দিরে। আমার চিরজীবনের নিবেদনে।

গণক ঠাকুর চলেছে সনাতনের বাড়ি। পথে নিমাইয়ের সঙ্গে দেখা।

'এ কি, এত হনহন করে চলেছেন কোথায়?'

'বলো তো কোথায়?' গণক ঠাকুর মিটি-মিটি হাসতে লাগল।

'তা আমি কী করে জানব !'

'তা তো ঠিকই। যাচ্ছি সনাতন মিশ্রের বাড়ি।'

'সেখানে কেন ?'

'তার মেয়ের বিয়ে হবে। বিয়ের দিনক্ষণ লগ্ন ঠিক করতে যাচ্ছি।'

'ভালো কথা।'

নিমাইয়ের কথার সুরটা যেন কেমন লাগল। চলে যাচ্ছিল, ডাকল তাকে গণক ঠাকুর। বললে, 'মেয়ের বিয়ে কার সঙ্গে হচ্ছে জানো না ?'

'কী করে জানব ?' নিমাই অবাক মানল।

'সে কি ! তোমার বিয়ে আর তুমিই কিছু জানো না ?'

'আমার বিয়ে ?' হাসতে লাগল নিমাই : 'আমার বিয়ে অথচ, কি আশ্চর্য, আমি কিছুই জানিনা !' চলে গেল হাসতে হাসতে।

গণকের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। সনাতনের বাড়িতে পৌঁছে নিরুদ্যমের মত বসে রইল চুপচাপ।

সনাতন বললেন, 'পাঁজি-পুঁথি দেখুন। লগ্ন স্থির করুন।'

ম্লানমুখে গণক বললে, 'এই খানিক আগে পথে নিমাই পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা হল—'

'সত্যি ?' উৎসাহিত হলেন সনাতন : 'কথা হল ?'

'হল।'

'কী বললে নিমাই ?'

'যা বললে তাতে মনে হল এ বিয়েতে তার মত নেই। বিয়ের কোনো খবরই সে রাখে না। আকাশ থেকে পড়ল বিয়ের কথা শুনে। তার মানেই এ মেয়েতে মন উঠছে না।' গণক আরো ব্যাখ্যা জুড়ল : 'বিয়েতে যে মত নেই এ ভাবে পরোক্ষ ব্যক্ত করাটাই বোধহয় সম্ভ্রান্ত।'

মাথায় হাত দিয়ে মুখ নামিয়ে বসলেন সনাতন। নিমাই এখন বড় হয়েছে, তার নিজের স্বাধীন মত থাকাটাই তো স্বাভাবিক।

শচী দেবীর প্রতিশ্রুতির দাম কী! ছেলের মতই প্রবল হবে। আর, ছেলের যখন মত নেই তখন এ বিয়ে আর হল না।

অন্তঃপুরে খবর পাঠালেন সনাতন। গৃহিণী কাঁদতে বসল। আর বিষ্ণুপ্রিয়া? মলিন মৌনে নিমগ্ন হয়ে গেল। কী হবে আর গঙ্গাস্নানে, কী হবে ঠাকুরঘরে দিন কাটিয়ে? কী হবে বা দেখা দিয়ে শচী দেবীকে? তার দিকে চাইবার আর চোখ কোথায়! হায়, বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে গিয়েছিলাম, বালি ছুঁড়ে ছুঁড়ে চেয়েছিলাম সমুদ্র বাঁধতে!

এর প্রতিকার কী? সনাতন পথ খুঁজে পেলেননা। আত্মীয়বন্ধুরা বললে, এর কোনো প্রতিকার নেই। শচী দেবীকে মোকাবিলা করেও লাভ হবে না। নিমাই তেজীয়ান পুরুষ, তার মতের স্বাতন্ত্র্য আছে, আর সে স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবার নয়।

সনাতনের সমস্ত সংসার শোকশয্যা নিল।

কে একজন অতিথি এল সনাতনের ঘরে। বললে, 'আমি নিমাইয়ের কাছ থেকে আসছি। আমাকে নিমাই পাঠিয়েছে।'

'কেন? কী খবর?' উঠে বসলেন সনাতন।

'সে বলে পাঠিয়েছে বিয়ের উদ্যোগ করুন।'

'সত্যি?' সনাতন দাঁড়িয়ে পড়লেন: 'তবে যে শুনেছিলাম—'

'ভুল শুনেছিলেন। শচী দেবী যে নিমাইয়ের সম্বন্ধ স্থির করেছেন তা তখনো নিমাইকে জানান নি শচী দেবী। তাই গণক ঠাকুরকে অমনি করে বলেছিল নিমাই।'

'এখন বুঝি জানতে পেরেছে?' ঢোঁক গিলল সনাতন: 'কিন্তু 'তার তো একটা স্বতন্ত্র মত আছে?'

'না, নেই।' আগন্তুক বললে, 'তার মায়ের মতই তার মত। নিমাই তার মায়ের আজ্ঞাবহ। তার মা যা স্থির করেছেন তাই সে আনন্দে নেবে মাথা পেতে। সুতরাং আবার ডাকুন গণক ঠাকুরকে। দিনক্ষণ ঠিক করুন।'

সনাতনের গৃহিণী উলু দিয়ে উঠল।

আর বিষ্ণুপ্রিয়া? সে শুধু বাঁশি শুনছে, আর কিছুই তার কানের মধ্যে ঢুকছে না। 'আন কথা নাহি শোনে কান।' সে বাঁশির শব্দ একবার যার কানে ঢুকেছে আর কোনো শব্দই পথ পায় না সেখানে। অবিচ্ছিন্ন সেই বাঁশির স্বরেই কান ভরে থাকে। যদি বাঁশি স্তব্ধ হয় ধ্বনি স্তব্ধ হয় না। যদি অন্য শব্দ হয়, তবুও সেই শব্দে সেই বংশীধ্বনিই বেজে চলে। শব্দে-অশব্দে শুধু এক নাম, শ্রীগৌরাঙ্গ।

শুনেছেও গৌর বলছেও গৌর। গৌর ছাড়া মুখে কথা নেই। মনে ভাবনা নেই। চোখে স্বপ্ন নেই। বুকে নিশ্বাস নেই।

আমি গৌরগতচিত্ত। গৌরপাদপদ্মই আমার প্রাণধন। নিমাইয়ের সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়ার বিয়ে ঠিক হয়েছে এ খবর রাষ্ট্র হতেই সমস্ত নবদ্বীপ মেতে উঠল। কায়স্থ জমিদার বুদ্ধিমন্ত খাঁ বললে, 'এ বিয়েতে যত খরচ লাগে, আমি দেব।

মুকুন্দসঞ্জয়, যার বাড়িতে নিমাইয়ের টোল, বললে, 'না, সব আপনি দেবেন কেন? ব্যয়ভারের কিছু অংশ আমি নেব।'

নিমাইয়ের পড়ুয়ারা বললে, 'আমরাও হাত গুটিয়ে থাকব না।'

১৮

গোধূলি লগ্নে নিমাইয়ের বিয়ে।

বয়স্যেরা এসে তাকে সাজাতে লাগল। তার আগে এয়োরা তাকে স্নান করিয়ে দিয়েছে। সর্বাঙ্গ মার্জনা করে মাখিয়ে দিয়েছে হলুদ আর আমলকি। গৌরাঙ্গ-অঙ্গ মার্জিত করতে গিয়ে নিজেরা মার্জিত হয়েছে। গৌরাঙ্গ-অঙ্গ নির্মল করতে গিয়ে নিজেরা নির্মলীকৃত।

ললাটে অর্ধচন্দ্রাঙ্কিত চন্দনের ফোঁটা, মধ্যস্থলে মৃগমদের তিলক। নয়নে কাজল, শ্রীঅঙ্গে সুগন্ধের প্রলেপ। বাহুতে রত্নবাজু, শ্রুতিমূলে সোনার কুণ্ডল। গলায় ফুলের মালার সঙ্গে মতির মালা। ত্রিকচ্ছ করে সূক্ষ্ম পীতবস্ত্র পরা, মাথায় মুকুট, ধান দুর্বা দিয়ে হাত বাঁধা, সেই হাতে দর্পণ। গায়ে পট্ট চাদর।

ব্রাহ্মণ করতে লাগল বেদধ্বনি, ভাট পড়তে লাগল রায়বার। বুদ্ধিমন্ত দোলা সাজিয়ে নিয়ে এল। সত্যিই বুদ্ধিমন্ত। কমলার সঙ্গে নারায়ণের বিয়েতে তার সমস্ত ধন নিয়োগ করল। 'কনকের দ্বারা করি মাধবের সেবা।' যোগাড় করে আনল নানা ছাঁদের নানা শব্দের বাদ্যভাণ্ড। শঙ্খ বংশী করতাল মৃদঙ্গ মাদল তো আছেই, সঙ্গে পটহ দগড় শিঙ্গা—জয়ঢাক, বীরঢাক। নাচ-কাচের লোক, নর্তক আর বিদূষকও জমেছে অনেক। দীপ জ্বলছে হাজার হাজার।

মাকে প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করে গৌরহরি দোলায় এসে উঠল। আগে গঙ্গাতীরে চলো। গঙ্গাপ্রণাম সেরে সর্ব নবদ্বীপ ঘুরে পরে কন্যাঘরে উপস্থিত হব। পদাতিকেরা দুই সারি হও। তুলে নাও নানাবর্ণের পতাকা।

'অনেক বড়-বড় বিয়ে দেখেছি, এমনটি আর হয় না।' বললে জনে-জনে। আবার তারাই ব্যাখ্যা করলে : এ কি মানুষের বিয়ে? মানুষের মূর্তি?

'ঈশ্বরের মূর্তি দেখি যত নরনারী।
মুগ্ধ হইলেন সবে আপনা পাসরি॥
লক্ষ লক্ষ শিশু বাদ্যভাণ্ডের ভিতরে।
রঙ্গে নাচি যায়, দেখি হাসেন ঈশ্বরে॥'

এই সেই বৃন্দাবনের 'অপ্রাকৃত নবীন মদন।' শত পেলেও যাকে আরো আরো পেতে ইচ্ছে করে, শত স্বাদনেও যার সাধন ফুরোয় না কোনো দিন। 'এ মাধুর্যামৃত পান সদা যেই করে, তৃষ্ণা শান্তি নহে তৃষ্ণা বাঢ়ে নিরন্তরে।' প্রাপ্তির কামনাকে প্রতি মুহূর্তে যে নতুন করে,

প্রতি মুহূর্তে যে নতুন উদ্দামতা দেয় শক্তিতে, আর প্রতি মুহূর্তে চিত্তে আনে নতুন উন্মত্ততা, সেই তো চিন্ময় কামদেব। সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথ। ব্রজাঙ্গনার কাছে নটবর নবকিশোর, মাধুর্যঘনবিগ্রহ। মহাভাববতী রাধিকার মধ্যে প্রেমের সর্বাতিশায়ী বিকাশ, সেই কারণে মাধুর্যের সর্বাতিশায়ী বিকাশ মহাভাবময় শ্রীকৃষ্ণে। তাই শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত নবীন মদন।

শুধু পুরুষ যোষিৎ নয়, স্থাবর জঙ্গম নয়, সেই সর্বচিত্তাকর্ষককে দেখে স্বয়ং মদন বিমোহিত। শিব মদনদহন, কিন্তু কৃষ্ণ মদনমোহন। 'রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ।' শৃঙ্গার বা মধুররসই সমস্ত রসের রাজা, তাই শৃঙ্গারের নাম রসরাজ। রসরাজময় যে মূর্তি তাই শ্রীকৃষ্ণ। সচ্চিদানন্দতনু। সর্বচিত্ত তো বটেই, আত্মচিত্ত পর্যন্ত মুগ্ধ করে বসে আছে। 'আত্ম পর্যন্ত সর্বচিত্তহর।'

বৈকুণ্ঠের নারায়ণ আর লক্ষ্মীও কৃষ্ণভিক্ষু। দুজনের কাছেই কৃষ্ণ মধুমত্তম।

কৃষ্ণরূপে লুব্ধ হয়ে ধৃতব্রত হয়ে লক্ষ্মী তপস্যায় বসল।

কৃষ্ণ জিগগেস করলে, এ তপস্যার হেতু কী ?

লক্ষ্মী বললে, গোপী হয়ে গোষ্ঠে বিহার করব, এই আমার বাসনা। সেই বাসনার পূর্তির জন্যেই এই তপস্যা।

কৃষ্ণ বললে, এ দুর্লভ, এ তোমার হবার নয়।

তাহলে এক কাজ করো। বললে লক্ষ্মী, তোমার বুকে সোনার রেখা করে আমাকে রেখে দাও।

কৃষ্ণ বললে, তাই হোক।

সেই থেকে লক্ষ্মী স্বর্ণরেখারূপে কৃষ্ণবক্ষে বিরাজিতা।

দ্বারবতীতে এক ব্রাহ্মণ ছিল, তার নয় পুত্র মারা গেল পর-পর। এক-একটি পুত্র মরে, রাজদ্বারে এসে অভিযোগ করে যায় ব্রাহ্মণ। রাজাকে বলে, তোমার দোষেই আমার এ পুত্রশোক। রাজাকে নিরুপায় দেখে ব্রাহ্মণ অর্জুনের কাছে সাহায্য চাইল। কৃষ্ণঘনিষ্ঠ

অর্জুন অভয় দিল ব্রাহ্মণকে। বললে, আমি তোমার পুত্রকে রক্ষা করব। দেখি কি করে যম তাকে স্পর্শ করে!

পারবে বাঁচাতে? ব্রাহ্মণ উৎসাহিত হয়ে আকুলকণ্ঠে প্রশ্ন করলে।

যদি না পারি—অগ্নিতে প্রবেশ করে প্রাণত্যাগ করব। অর্জুন প্রতিজ্ঞাবাণী উচ্চারণ করল।

ব্রাহ্মণীর পুনর্বার গর্ভসঞ্চার হলে ব্রাহ্মণ সংবাদ দিল অর্জুনকে। অর্জুন শরজালে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করল; নিবিড় করে আবৃত করল সূতিকাগৃহ। কার সাধ্য এই শরবেষ্টনী ভেদ করে!

যথাকালে ব্রাহ্মণীর পুত্র হল। কিন্তু কয়েকবার কেঁদে উঠেই শিশু স্তব্ধ হয়ে গেল। শরজাল মৃত্যুকে অবরোধ করতে পারেনি।

ক্ষিপ্র হয়ে ব্রাহ্মণ অর্জুনকে তিরস্কার করতে লাগল মিথ্যাবাদী, কপট, উদ্ধত!

অর্জুন বললে, লোকান্তর থেকে উদ্ধার করে আনব তোমার ছেলেদের। শুধু কনিষ্ঠকে নয়, এক থেকে দশ, সবগুলিকে।

যমালয়ে এসে উপস্থিত হল অর্জুন। কিন্তু, কই, সেখানে নেই ছেলেরা। যত লোক আর পুরী আছে সব খুঁজল একে-একে, কোথাও কাউকে মিলল না।

এবার তবে অগ্নিতে প্রবেশ করি। প্রতিজ্ঞাপালনে প্রস্তুত হল অর্জুন।

কৃষ্ণ বললে, চলো, আমি তোমাকে এক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি। ব্রাহ্মণের ছেলেদের দেখতে পাবে সেখানে। তুমি এখুনি অগ্নিতে প্রবেশ কোরো না।

দিব্যরথে চড়ে অর্জুনকে নিয়ে বেরুল কৃষ্ণ। অনেক গিরিনদী সমুদ্র পার হয়ে মহাকাল-আলয়ে এসে উপস্থিত হল।

সেখানে আছে ভূমাপুরুষ। সে বললে, ব্রাহ্মণের দশ ছেলে আমার কাছেই আছে। তাদের সন্ধানে কৃষ্ণার্জুন আসবে আর এলে

কৃষ্ণকে আমি দেখতে পাব, সেই লোভেই ওদের অন্যত্র রাখিনি। আমার এতদিনের উৎকণ্ঠা আজ নিবৃত্ত হল। চরিতার্থ হল প্রতীক্ষা। কৃষ্ণকে দেখতে পেলাম।

এই ভূমাপুরুষ আর কেউ নয়, স্বয়ং নারায়ণ।

মণিভিত্তিতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পেল কৃষ্ণ। সবিস্ময়ে বলে উঠল, এ তো কখনো দেখিনি। আমি এত মধুর! এত চমৎকারকারী! এ মাধুর্য আমি আস্বাদন করি কি করে? লুব্ধচিত্তা রাধিকা না হয়ে আমার উপায় নেই। রাধিকার ভাব না ধরলে কৃষ্ণমাধুর্য, আত্মমাধুর্যও বোঝা যায় না।

বর সনাতনের বাড়ি এসে পৌঁছুল। সনাতনও কম আয়োজন করেনি। তারও তুমুল বাদ্য, উচ্চণ্ড আলো। ভাট-বিপ্রও কম নয়।

নিমাইকে নামানো হল দোলা থেকে। পুষ্পবৃষ্টি লাজবৃষ্টি হতে লাগল। শঙ্খের রোল উঠল চারদিকে। আর ললিত-কলিত হুলুধ্বনি।

অবগুণ্ঠিতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে সভায় আনা হল। সর্ব অঙ্গে অলঙ্কার, স্বভাবসুন্দরী, বিনোদানন্দগম্ভীরা। কিশোরবয়সোজ্জ্বলা। লজ্জা-লতিকা। সর্বতঃশ্রীর প্রতিমূর্তি।

মুখচন্দ্রিকা হবে। বিষ্ণুপ্রিয়ার পিঁড়ি উঁচু করে তুলে ধরা হল। বর-কন্যার মাথার উপর দেওয়া হল বস্ত্রের আবরণ। নিভৃতে এবার দেখ পরস্পরকে। নিভৃততমকে।

লজ্জায় দু চোখ বুজে আছে বিষ্ণুপ্রিয়ার। পরমপরিচিতকে তা হলে দেখি কি করে!

'ওকি, চোখ চা।' পাশ থেকে এয়োর দল বললে বিষ্ণুপ্রিয়াকে, 'বরের মুখ না দেখলে দোষ হয়। লজ্জা কী! আপনজনকে দেখবি।'

বিষ্ণুপ্রিয়া চোখ চাইল।

মিলন হল চার চোখে। একটিমাত্র নিমেষ কিন্তু অনন্তকালের দর্শন দিয়ে ভরা।

নিমাইয়ের বাঁয়ে এসে দাঁড়াল বিষ্ণুপ্রিয়া। একটু বুঝি বা সাহস বেড়েছে, ঘোমটার আড়াল থেকে আড় চোখে দেখছে বরকে। কখনো বা চোখে চোখ পড়ে যেতে ধরা পড়ার আনন্দে শিউরে উঠছে। তাকাচ্ছে পায়ের দিকে আর সমস্ত হৃদয় জলের মত ঢেলে দিচ্ছে অনর্গল। দুখানি হাত দেখছে আর ভাবছে সমস্ত সুখ বুঝি ঐ হাতের মুঠোয়। কিন্তু অত সুখ কি আমার সইবে? ধরতে পারব দুই হাতে?

এ কি সত্যিই ঘটছে বাস্তবে না কি এ স্বপ্ন দেখছি? এ কার সঙ্গে কার বিয়ে? এ কি মাটিতে আছি না কি গন্ধর্বনগরে।

সর্বগুণখনি রাধিকা। গুণৈরতিবরীয়সী। মহাভাবস্বরূপা, সর্বসাধিকা। সুষ্ঠুকান্তস্বরূপা। কেশদাম সুকুঞ্চিত, দীর্ঘায়ত নয়ন দুটি চঞ্চল, বক্ষ সুশোভন, মধ্যদেশ ক্ষীণ, স্কন্ধদেশ অবনমিত, হাত দুখানি নখরত্নসুন্দর।

রাধিকা মধুরা, নববয়া, চলাপাঙ্গা, উজ্জ্বলস্মিতা। তার হাত-পায়ের রেখা খুব সুন্দর ও সৌভাগ্যের সূচক, তাই সে চারুসৌভাগ্য-রেখাঢ্যা। তার অঙ্গগন্ধে মাধব উন্মাদিত, তাই সে গন্ধোন্মাদিত-মাধবা। সঙ্গীতনিপুণা, রম্যবাচী, নর্মপণ্ডিতা, বিনীতা। শুধু তাই নয়, সে করুণেক্ষণা, বিদগ্ধা, পাটবান্বিতা, লজ্জাশীলা। ধৈর্যগাম্ভীর্য-শালিনী, সুবিলাসা। গুর্বর্পিতগুরুস্নেহা, অর্থাৎ গুরুজনের অতিশয় স্নেহপাত্রী। কৃষ্ণবিষয়ে তৃষ্ণাবতী। সন্ততাশ্রবকেশবা, সর্বদা কেশব তার অনুগত, তার আজ্ঞাধীন।

রাধিকার দ্বাদশ আভরণ। চূড়ায় মণীন্দ্র, কানে কুণ্ডল, নিতম্বে কাঞ্চী, গলদেশে পদক, কর্ণোর্ধ্বে শলাকা, করে বলয়, কণ্ঠে কণ্ঠমালা, আঙুলে অঙ্গুরী, বক্ষে তারকোপম হার, ভুজে অঙ্গদ, চরণে নূপুর, পদাঙ্গুলিতে গুজরিপঞ্চম।

রাধিকার ষোড়শ শৃঙ্গার। রাধিকা স্নাতা, নাসাগ্রে মণিরাজ, পরিধানে নীলবসন, কটিতটে নীবী, মাথায় বদ্ধবেণী, কর্ণে উত্তংস, অঙ্গে চন্দনচর্চা, চিকুরে কুসুম, হাতে পদ্ম, মুখকমলে তাম্বুল, নয়নে কজ্জল, কপোলে রঞ্জন, ললাটে তিলক, গলদেশে মাল্য, অলকে কস্তুরীবিন্দু, চরণে অলক্তরেখা।

রাধিকাই কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি। 'কৃষ্ণপ্রেমভাবিত যার চিত্তেন্দ্রিয় কায়। কৃষ্ণনিজশক্তি রাধা—ক্রীড়ার সহায়॥' ভাবিত কী? সর্বতোভাবে অনুপ্রবিষ্ট হলেই ভাবিত। জলের মধ্যে কর্পূর দিলে কী হয়? জলের অণুতম সূক্ষ্মতম অংশেও কর্পূরের অনুপ্রবেশ ঘটে। জল তখন কী? জল তখন কর্পূরবাসিত। জল তখন কর্পূরভাবিত। লোহাতে যখন আগুন প্রবেশ করে, তখন লোহার কণিকতম অংশেও আগুন। তখন লোহাতে আর আগুনে পার্থক্য নেই। তখন লোহাতে-আগুনে তাদাত্ম্য। তখন লোহা অগ্নিভাবিত। তেমনি রাধিকায় আর কৃষ্ণপ্রেমে ভেদ নেই। রাধিকার কায় মন বাক্য সমস্তই কৃষ্ণপ্রেমের ভাবনা। সমস্ত অস্তিত্বই কৃষ্ণপ্রেমের পরিণতি।

শ্রীকৃষ্ণের লীলায়-খেলায় সহায়কারিণী কে হবে, কে হতে পারে? তাঁর লীলা কী? তাঁর লীলা আস্বাদন, কান্তারসের আস্বাদন। এ খেলায় সেই তাঁর সঙ্গী হবে যে তাঁর নিজের শক্তি, স্বরূপশক্তি। শ্রীকৃষ্ণ তো আত্মারাম, স্বতন্ত্র পুরুষ, তাই তিনি এমন কোনো শক্তির সাহায্য নিতে পারেন না, যা তাঁর থেকে পৃথক। তেমন সাহায্য নিত্য গেলে তাঁর আত্মারামতা থাকে কোথায়? তাই অখিলাত্মভূত শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিজশক্তি, তাঁর আনন্দচিন্ময়রসের প্রতিরূপা রাধিকাকে, হ্লাদিনীকে, ডাক দিয়েছেন। রাধিকা ছাড়া কে আর তাঁর খেলা জমাবে? কে হবে তাঁর আনুকূল্যবিধায়িনী?

বিয়ের পর বর-কনে, গৌরাঙ্গ আর বিষ্ণুপ্রিয়া, চলল বাসরঘরে। ভয়ে-আনন্দে প্রায় অবশ বিষ্ণুপ্রিয়া। চলতে পারছে না পা ফেলে। নিমাই প্রায় তাকে টেনে নিয়ে চলেছে। হঠাৎ ঝনাৎ করে একটা

শব্দ হল। অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল বিষ্ণুপ্রিয়া। ঢলে পড়ল স্বামীর আশ্রয়ে।

কী হল? কী হল? সবাই উৎসুক-উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল।

বিষ্ণুপ্রিয়ার ডান পায়ের অঙ্গুষ্ঠে উছট লেগেছে। এ কি, রক্ত পড়ছে যে আঙুল থেকে। কী হবে?

আঙুলের থেকেও মর্মে বেশি যন্ত্রণা বিষ্ণুপ্রিয়ার। বাসরঘরে যেতে এ কী অমঙ্গল!

কিন্তু, এখন রক্ত থামবে কী করে?

নিমাই তার অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়ার ক্ষতস্থল চেপে ধরল। রক্তক্ষরণ থেমে গেল। ব্যথাবেদনা চলে গেল নিমেষে।

অঙ্গুষ্ঠে অঙ্গুষ্ঠে প্রথম প্রেমালাপ।

কিন্তু ভয় তো যায় না। কেনই বা এই রক্তক্ষরা আঘাত? কিসেরই বা এই মধুক্ষরা উপশম?

তপন মিশ্রকে কাশীবাসের পরামর্শ দিল নিমাই। বললে, যাও, বেশি দেরি নেই, সেখানেই আমার সঙ্গে তোমার দেখা হবে। কেন দেখা হবে? তার অর্থই, ভাবী সন্ন্যাসগ্রহণের কথা তখন নিমাইয়ের মনে ছিল। তাই যদি হবে, তবে নিমাই জেনে-শুনে বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিয়ে করল কেন? এমন তো নয় যে, বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিয়ে করবার পর তার সন্ন্যাসগ্রহণের সঙ্কল্প হয়েছে। আগেই যখন হয়েছে, তখন লক্ষ্মীর তিরোধানের পর, গৃহত্যাগ করলেই হত। কী দরকার ছিল বিষ্ণুপ্রিয়াকে কাঁদাবার? জেনে শুনে তার জীবনে দুর্বহ দুঃখের ভার চাপিয়ে দেবার? নিমাইয়ের কি মায়ামমতা নেই?

সন্ন্যাসের মহনীয় উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যেই বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করবার প্রয়োজন ছিল। বিরাট ত্যাগের উত্তুঙ্গ দৃষ্টান্ত রাখবার জন্যে। সন্ন্যাস না নিলে কুতর্কনিষ্ঠ ভগবদ্‌বিদ্বেষীদের আকৃষ্ট করব কী করে? 'সন্ন্যাস করিয়া প্রভু কৈল আকর্ষণ। যতেক পলাঞা ছিল তার্কিকাদি গণ॥' কী উপায় অবলম্বন করলে ও-সব নিন্দুক

পাষণ্ডীর দল আমাকে প্রণাম করবে? আর প্রণাম না করা পর্যন্ত নির্মল হৃদয়ে ভক্তির উদয় হবে কী করে? প্রণতিতেই পাপক্ষয়। আর মেঘক্ষয়ে যেমন চন্দ্রিকা তেমনি পাপক্ষয়ে ভক্তি।

'অতএব অবশ্য আমি সন্ন্যাস করিব।
সন্ন্যাসীর বুদ্ধ্যে মোরে প্রণত হইব॥
প্রণতিতে হইবে ইহার অপরাধক্ষয়।
নির্মল হৃদয়ে ভক্তি করিব উদয়॥'

লক্ষ্মীর অন্তর্ধানের পরেই যদি নিমাই সংসার ছাড়ত, লোকে বলত, বিপত্নীক হয়েছে, তাই বৈরাগ্য এসেছে। এর মধ্যে বাহাদুরি কী! বড় জোর করুণা করত, কেউ প্রশংসা করত না। ঘটত না চিত্তাকর্ষণ-চমৎকৃতি। আর যে প্রশংসিত নয় সে আকর্ষণ করবে কি করে? তা হলে নিমাইয়ের সন্ন্যাস হত না এমন ফলদায়ী। কত বড় সে যন্ত্রণা, তরুণ বয়সের প্রেমিক স্বামী হয়ে কিশোরী বধূ বিষ্ণুপ্রিয়াকে ত্যাগ করে যাওয়া। বড় দুঃখ না হলে বড় প্রাপ্তি ঘটে কি করে? সাধ্য কী এ ঘটনার পর নিন্দুক-নাস্তিকের দল বিমুখ থাকে! পারবে তারা হৃদয়ের মাংস ছিন্ন করে নিতে? সাধ্য কী মূল্য না দিয়ে চলে যায়? সমস্ত বিরুদ্ধস্রোত নিমাইয়ের পায়ের উপর এনে না ফেলে!

তা ছাড়া দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া ছাড়া আর কে বইবে এই অপার বেদনা? কে জ্বালবে ভক্তিতৃপ্তির জাগপ্রদীপ? প্রভু সন্ন্যাসী বাইরে, বিষ্ণুপ্রিয়া সন্ন্যাসিনী গৃহে। প্রভুর প্রেমভক্তির বিতরণ বাইরে, আর ঘরে বিষ্ণুপ্রিয়ার সাধন কি করে সেই প্রেমভক্তিকে অক্ষয় করে ধরে রাখা যায়। বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গের স্বরূপশক্তি, যেমন রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের। গৌরমুখে হরি হরি, বিষ্ণুপ্রিয়ার মনে গৌর-গৌর।

'আমার কন্যা তোমার দাসী হবার উপযুক্ত নয়।' বিবাহান্তে যুগলে প্রত্যাবর্তনের সময় বললে সনাতন, 'তুমি নিজগুণে একে কৃপা করবে।'

নিমাই মনে মনে হাসল। ও কি আমার দাসী? ও আমার নিত্যকান্তা।

সর্বমান্যগণে নমস্কার করে দোলায় এসে উঠল বরবধূ। হরি-হরি বলে সবাই জয়ধ্বনি করে উঠল।

'স্ত্রীগণ দেখিয়া বোলে, এই ভাগ্যবতী।
কত জন্ম সেবিলেন কমলা পার্বতী।'
কেহ বোলে 'এই হেন বুঝি হর গৌরী।'
কেহ বোলে 'হেন বুঝি কমলা শ্রীহরি॥'
কেহ বোলে 'এই দুই কামদেব রতি।'
কেহ বোলে 'ইন্দ্র-শচী লয় মোর মতি॥'
কেহ বোলে, 'হেন বুঝি রামচন্দ্র সীতা।'
এই মত বোলে সর্ব সুকৃতি-বনিতা॥'

১৯

রাধিকাই জয়শ্রী। জয় মানে উৎকর্ষ আর শ্রী মানে শোভা। জয়হেতু যার শ্রী, অর্থাৎ উৎকর্ষহেতু যার শোভা, সেই জয়শ্রী। দ্যূতক্রীড়া, জলকেলি, নর্মবাক্য—সব কিছুতেই তার বিশেষ উৎকর্ষ। আবার সৌন্দর্যে, সৌভাগ্যে, বৈদগ্ধ্যে, পাতিব্রত্যেও সে অপরাভূতা। সুতরাং সে জয়া। আর লক্ষ্মীরই আরেক নাম শ্রী। লক্ষ্মীশক্তির সারভূতা প্রতিমাই রাধিকা। তার মানে মূলশ্রীই রাধিকা। সুতরাং রাধিকা জয়াও, শ্রীও।

লীলাস্বয়ম্বররস উপভোগ করছে। লজ্জায় কৃষ্ণের সামনে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণের পায়ের নখের অগ্রভাগের দিকে তাকিয়ে আছে অবনতমুখে। তাকিয়ে আছে পাদকল্পতরুপল্লবশেখরের দিকে। আর সেই পদনখ-

শোভা দেখেই রাধিকা বিহ্বল। লজ্জা-শীল ধর্ম-কুল—সমস্ত আর্যপথ বিসর্জন দিয়ে কৃষ্ণচরণে সম্যক তার আত্মসমর্পণ। সে সমর্পণে যে আনন্দ, তার তুলনা শুধু ঐ আনন্দই।

রাধিকাই প্রেমপরাকাষ্ঠারূপিণী। তার রতি সান্দ্রতমা। চমৎকার-করশ্রী। এই রতির চেষ্টা স্বীয়ানুকূল্যতাৎপর্যা নয়, প্রিয়ানুকূল্য-তাৎপর্যা। তার সকল উদ্যম কৃষ্ণসৌখ্যার্থ।

জ্যৈষ্ঠের মধ্যাহ্ন। গোচারণে গিয়েছে শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণকে দেখবার জন্যে রাধিকা আর তার সখীরা বেরিয়ে পড়েছে বাড়ি ছেড়ে। গোবর্ধন পাহাড়ের কাছে এসে চারদিকে তাকাতে লাগল, কোথায় কৃষ্ণ? বুঝল, কৃষ্ণ পাহাড়ের অপর দিকে অবস্থান করছে। ডাকলে কি আর শুনবে, দাঁড়াবে চোখের সামনে? দরকার কী। গোবর্ধনের চূড়ায় গিয়ে আরোহণ করি। সেখানে উঠলেই কৃষ্ণদর্শন সম্ভব হবে। কোন দিকে পালাবে তখন? চূড়ায় উঠলেই দেখা যাবে সর্বদিক।

সখীরা নিরস্ত করতে চাইল। কিন্তু কে শোনে কার কথা? মধ্যাহ্ন-সূর্যের উত্তাপে পাহাড়ের গা আগুন হয়ে উঠেছে, তোমার পায়ের পাতা পাতবে কী করে? তা ছাড়া উঁচু-নিচু টুকরো-টুকরো পাথরের কোণগুলো অসিফলার মত তীক্ষ্ণ। তোমার পায়ের পাতা রাখবে কোথায়?

কিন্তু রৌদ্র বা অসি, তাপ বা তীক্ষ্ণতা, কোনো কিছুতে রাধিকার লক্ষ্য নেই। কৃষ্ণে অর্পিতচিত্ত, অনন্যচিত্ত হয়ে সে পাহাড়ে চড়ছে। চূড়াতে পৌঁছে দেখতে পেয়েছে কৃষ্ণকে। চরণতল দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে, ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাচ্ছে, এ সবে রাধিকার অনুভূতি নেই, অনুসন্ধান নেই। কৃষ্ণকে দেখতে পাওয়ার সুখেই সে নিস্পন্দ-নিমগ্ন। কোথায় বা পাথরের ধারালো কোণ, কোথায় বা সূর্যের প্রাখর্য! রাধিকার মনে হচ্ছে কমলদল-আস্তৃত সুকোমল শয্যায় সে দাঁড়িয়ে আছে। কৃষ্ণকে দেখতে যাওয়ার দুঃখ কৃষ্ণকে দেখতে পাওয়ার সুখ হয়ে গিয়েছে। সূর্য-কিরণ আমাকে কী করবে, আমার দেহ কোটিচন্দ্রের চেয়ে সুশীতল।

ভাদ্র মাসের চতুর্থ তিথির চাঁদ দেখলে মিথ্যে কলঙ্ক জন্মে—এইরূপ কিম্বদন্তী। এক গোপী বহু আরাধনা-উপাসনা করেও পাচ্ছে না কৃষ্ণকে। কৃষ্ণকে না পাই, কৃষ্ণ-সঙ্গের মিথ্যা কলঙ্কের আনন্দটুকু অন্তত দাও। নিজের অযোগ্যতার দৈন্যে ভাদ্রের চতুর্থ তিথির চাঁদের কাছে প্রার্থনা করছে: হে চতুর্থ-নিশা-শশাঙ্ক, হে কামাম্বুরাশি-পরিবর্ধন, সেই যুবকের সঙ্গে আমার অভিমান মিথ্যাপবাদ-বাক্যেও যেন সিদ্ধ হয়। কে সেই যুবক? আর কে! স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। আর কিসের অভিমান? তিনি আমার কান্ত, আমি তাঁর কান্তা—এই অভিমানে কৃষ্ণ-সঙ্গের সম্ভাবনা কোথায়? নাই বা থাক কৃষ্ণ-সঙ্গের সম্ভাবনা, কৃষ্ণ-সঙ্গের আভাস তো আছে। কৃষ্ণ আমাকে না নিক, লোকে যে বলবে আমি কৃষ্ণকে নিয়েছি—এই অপবাদে, এই লজ্জায়, এই দুঃখেও আমার পরম সুখ।

দ্বারকায় কৃষ্ণের অসুখ করেছে। এ রোগের চিকিৎসা কী, জিগগেস করল নারদ। কৃষ্ণ বললে, কোনো ভক্ত যদি তার পায়ের ধুলো আমার মাথায় দেয়, ভালো হতে পারি। যে নারদ এত বড় ভক্ত, সেও পিছু হটল। কৃষ্ণের ষোল হাজার মহিষী, প্রত্যেকের কাছে গিয়ে হাত পাতল। সে কী কথা? স্বামীকে কী করে পায়ের ধুলো দেব? তাতে আমাদের পত্নীধর্ম নষ্ট হবে না? না, পারব না ধুলো দিতে। নারদ তখন ব্রজে গেল। ব্রজাঙ্গনারা চঞ্চল হয়ে উঠল। আমাদের কৃষ্ণের অসুখ? আমরা কি তার ভক্ত? আমাদের ধুলোতে কি কাজ হবে? তবু আমাদের কৃষ্ণ যদি ভালো হয়, দেব আমাদের পায়ের ধুলো! যদি পাপ হয়, অধর্ম হয়, তো আমাদের হবে। আমাদের পাপে, আমাদের অধর্মেও যদি কৃষ্ণ সুখী হয়, আমরা সে পাপ, সে অধর্ম করব হাসিমুখে। জীবনে আর আমাদের ব্রত কী? সেবা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সর্বতোভাবে সুখী করাই আমাদের ব্রত।

প্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের পর বিষ্ণুপ্রিয়ার কী দশা? নয়নে ঘুম নেই। কদাচিৎ যদি ঘুম আসে, মাটিতে শোয়। শরীর ক্ষীণ মলিন

অ—১॥১১

হয়ে গিয়েছে। তণ্ডুল গুনে গুনে হরিনামের সংখ্যা পূরণ করে। সে তণ্ডুল ফুটিয়ে আগে প্রভুকে নিবেদন করে, তারপর তার কিঞ্চিন্মাত্র খায়। জাবন যে কেন রাখছে, কে বলবে!

'প্রভুর বিচ্ছেদে নিদ্রা তেজিল নেত্রেতে।
কদাচিৎ নিদ্রা হৈলে শয়ন ভূমিতে॥
কনক জিনিয়া অঙ্গ সে অতি মলিন।
কৃষ্ণ চতুর্দশীর শরীর প্রায় ক্ষীণ॥
হরিনাম সংখ্যা পূর্ণ তণ্ডুলে করয়।
সে তণ্ডুল পাক করি প্রভুকে অর্পয়॥
তাহার কিঞ্চিৎমাত্র করয়ে ভক্ষণ।
কেহ না জানয়ে কেনে রাখয়ে জীবন॥'

জীবন কেন রাখছে? পতির সুখেই পত্নীর তৃপ্তি, পতির ইষ্টেই পত্নীর ইষ্ট, শুধু এই তত্ত্ব প্রকট করবে বলে, প্রতিষ্ঠিত করবে বলে। তোমার সঙ্কল্পসিদ্ধির কার্যে আমি আনুকূল্যবিধায়িনী—এই প্রমাণ করব বলে। যে প্রেমভক্তিবিতরণে তোমার স্পৃহা, আমি সেই প্রেমভক্তিরই প্রতিমূর্তি। তোমার বিতরণ বাইরে, আমার বিতরণ ঘরে। আমিই মূর্তিমতী ভক্তি, তোমার স্বরূপশক্তি। তোমার সুখচিন্তা, ভক্তিচিন্তা ছাড়া আর সমস্ত বাসনাই অশ্রুর গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়েছি।

বিয়ের পর প্রায় দু বছর কাটল নিশ্চিন্তে। অধ্যাপনা নিয়েই মেতে আছে নিমাই। এদিকে ভক্তিবিরোধী নানা মতবাদের প্রচার হচ্ছে নবদ্বীপে। বাড়ছে অভক্তের দল। 'চতুর্দিগে পাষণ্ড বাঢ়য়ে গুরুতর।' বৈষ্ণব দেখছে আর গাল দিচ্ছে। ভক্তের দল অনুযোগ করছে—এ সময় উনি কিনা বিদ্যাচর্চায় নিবিষ্ট!

নিমাই স্থির করল এবার আত্মপ্রকাশের সময় এসেছে। 'চিত্তে ইচ্ছা হইল আত্মপ্রকাশ করিতে।' কিন্তু তার আগে একবার গয়া থেকে আসি। পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধকার্য শেষ করি।

প্রায় তেইশ বছর বয়েস, সঙ্গে মেসো চন্দ্রশেখর আর বহু ছাত্র-

শিষ্য, নিমাই মার অনুমতি নিয়ে, সব দেশ-গ্রাম তীর্থ করে গয়ায় চলল। আশ্বিন মাস, ১৪৩০ শকাব্দ। চলতে চলতে পৌঁছুল এসে 'চির' নদীর তীরে। সেখানে স্নানাহ্নিক সেরে ভাগলপুর জেলার মন্দারে এল। যেমন মথুরায় কেশব, নীলাচলে পুরুষোত্তম, প্রয়াগে বিন্দুমাধব, কেরলে বাসুদেব, দাক্ষিণাত্যে পদ্মনাভ, তেমনি মন্দারে মধুসূদন। মধুসূদনকে দর্শন করল নিমাই।

মন্দারে নিমাইয়ের জ্বর হল। বেশ কঠিন জ্বর, সঙ্গীরা সব ভাবনায় পড়ল। নিজের চিকিৎসা নিজে করল নিমাই। বললে, এক ব্রাহ্মণের পাদোদক নিয়ে এস। তা খেলেই আমি ভালো হব।

আনা হল বিপ্রপাদোদক! তা খেতেই জ্বর ছেড়ে গেল নিমাইয়ের।

ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য দেখাবার জন্যেই এই রঙ্গ। না কি নিজের অসাধারণত্ব যাতে বুঝতে না পারে কেউ তারই জন্যে এই কৌশল!

তারপর দলবল নিয়ে নিমাই পুনপুনে এল। সেখানে স্নান করে পিতৃদেবের অর্চন করল। তারপর রাজগিরে আবার স্নান সেরে গয়ায় প্রবেশ করল।

গয়াতে ঢুকে দুই শ্রীকর জুড়ে নমস্কার করল তীর্থরাজকে। ভঙ্গি গাঢ়, গম্ভীর ও প্রশান্ত। পিতৃকার্য করে স্নান করল ব্রহ্মকুণ্ডে। তারপর চক্রবেড়ে এসে দেখতে চলল পাদপদ্ম। দেখ দেখ ভগবানের পদচিহ্ন দেখ। যে চরণ কাশীনাথ হৃদয়ে ধরেছে, যে চরণ লক্ষ্মীর জীবন, বলির মাথায় যে চরণের আবির্ভাব, তাকে দেখ চোখ ভরে। যে চরণ তিলার্ধ ধ্যান করলে যম তার অধিকার হারায়, যে চরণে ভাগীরথীর প্রকাশ, ভক্ত নিরবধি যাকে বুকে রাখে, তুমি নিতান্ত ভাগ্যবান, তাই তাকে দেখতে পেয়েছ।

নারায়ণের নাভি থেকে উৎপন্ন পদ্মের নালে চৌদ্দ ভুবন প্রস্ফুটিত। তার মধ্যে এক ভুবন পৃথিবী। পৃথিবীতে সপ্তসমুদ্র—লবণসমুদ্র, ইক্ষুসমুদ্র, সুরাসমুদ্র, ঘৃতসমুদ্র, দধিসমুদ্র, দুগ্ধসমুদ্র ও জলসমুদ্র। দধিসমুদ্রের আরেক নাম ক্ষীরসমুদ্র বা ক্ষীরাব্ধি। ক্ষীরাব্ধির মধ্যে

এক দ্বীপ আছে, যার নাম শ্বেতদ্বীপ। ঐ শ্বেতদ্বীপই ব্রহ্মাণ্ডের পালনকর্তা বিষ্ণুর নিজধাম। দেবতারা তাঁর দর্শন পায় না। অসুরের উৎপীড়নে পৃথিবী যখন ক্লিষ্ট হয়ে ওঠে, তখন দেবতারা ক্ষীরোদসমুদ্রের তীরে গিয়ে তাঁর স্তব করে পৃথিবীর দুর্দশার কথা ব্যক্ত করে। তখন বিষ্ণু অবতীর্ণ হয়ে জগৎকে রক্ষা করেন, ত্রাণ করেন।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, পূর্ণতম ভগবান। তিনি যখন অবতীর্ণ হন সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপই তাঁর বিগ্রহের মধ্যে মিলিত হন। সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপই তাঁর অংশ, তিনিই সকলের আশ্রয়।

'কৃষ্ণ যবে অবতরে সর্বাংশ-আশ্রয়।
সর্বঅংশ আসি তবে কৃষ্ণেতে মিলয়॥
যেই যেই-রূপ জানে সেই তাহা কহে।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে, কিছু মিথ্যা নহে॥'

কৃষ্ণের ছেলে শাম্ব স্বয়ম্বর-সভা থেকে দুর্যোধনের মেয়ে লক্ষণাকে হরণ করল। কৌরবেরা তাকে বাধা দিল, পরাভূত করে হস্তিনাপুরে নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রাখল। স্বয়ং বলরাম গেল আপোষ করতে। দুর্যোধনকে বললে, বৃষ্ণিবংশের সঙ্গে কুরুবংশের বিরোধ বাধিয়ে লাভ কি? শাম্বকে ছেড়ে দাও। বলদৃপ্ত দুর্যোধন বললে, আমার অনুগ্রহেই বৃষ্ণিবংশীয়েরা বেঁচে আছে। আমিই তাদের একটি ক্ষুদ্র-রাজ্যের রাজত্ব দিয়েছি, নইলে রাজাসন তারা কোথায় পেত? আমারই অনুগ্রহে প্রাণ ধারণ করে আবার আমাকেই নির্লজ্জের মত আদেশ করছেন?

বলরাম বললে, 'কৃষ্ণকে রাজাসন দিয়েছ বলে গর্ব করছ? কিন্তু কৃষ্ণের রাজাসনে কী প্রয়োজন? একটা ক্ষুদ্র রাজ্যের সিংহাসনে তার আর কী মহিমা বাড়বে? অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতিরা যার চরণরেণু মাথায় ধরে কৃতকৃতার্থ, ব্রহ্মা, শিব আর আমি, এমন কি সর্বৈশ্বর্যময়ী লক্ষ্মী, যার অংশের অংশ, কলার কলা, তার কী হবে নৃপাসনে?'

একদৃষ্টে নিমাই দেখতে লাগল পাদপদ্ম। দুই পদ্মনয়ন ভরে উঠল অশ্রুতে। প্রথম ধারা নামল অপাঙ্গ থেকে, দ্বিতীয় ধারা নামল নাকের কাছেকার কোণ থেকে। চোখের মাঝখান থেকে নামল তৃতীয় ধারা। তিনধারা মিশে গেল এক হয়ে। ত্রিবেণী হয়ে গেল গঙ্গা অবিচ্ছিন্না। নিমাইয়ের উপবীত ভিজল, উত্তরীয় ভিজল, বসন ভিজল।

নিমাই দেখছে কৃষ্ণকে, আর সকলে দেখছে নিমাইকে। কী সুন্দর মুখ! কী সুন্দর চোখ! কী সুন্দর অশ্রুধারা! মুখে কথা নেই, শুধু ঠোঁট দুখানি কাঁপছে! শরীর টলছে কিন্তু পড়ছে না। এ কী নতুন ভাবাবেশ! কারু সাহস নেই নিমাইকে ছোঁয়, তার বাহ্য সম্বিৎ ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করে।

দৈবযোগে সেখানে ঈশ্বরপুরী উপস্থিত। তিনি দূরে দাঁড়িয়ে নিমাইয়ের এ অভিনব ভাব দেখতে লাগলেন। এ কী অমানুষিক কাণ্ড! মেঘ দেখলে তাঁর গুরু মাধবেন্দ্রের কৃষ্ণস্ফূর্তি হত, পড়তেন মূর্ছিত হয়ে। এ যে দেখি সেই দশা। সত্যি নিমাইও দেখি মূর্ছিত হয়ে পড়ছে। আর সকলে বোঝেনি—ঈশ্বরপুরীর জানা, ঈশ্বরপুরী বুঝেছেন। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে ধরলেন নিমাইকে। নিমাই চিনতে পারল, প্রণাম করতে চাইল, ঈশ্বরপুরী তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। প্রেমানন্দে একসঙ্গে কাঁদতে লাগলেন দুজনে।

নিমাই বললে, 'আমার গয়াযাত্রা সফল হল। দেখলাম আপনাকে। কোনো তীর্থই আপনার সমান নয়, আপনিই পরম তীর্থ। তীর্থে পিণ্ড দিলে, যার পিণ্ড দেওয়া হচ্ছে, সে তরে যায়। কিন্তু আপনাকে দেখলে সমস্ত পিতৃপুরুষেরই বুঝি উদ্ধার হয়। সংসার-সমুদ্র থেকে আমাকে উদ্ধার করুন। আমার এই দেহ সমর্পণ করলাম। আমাকে কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃত রস পান করান।'

'পণ্ডিত, শোনো, আমি বলছি', ঈশ্বরপুরী বলতে লাগলেন গাঢ় স্বরে, 'সন্দেহ নেই, তুমি ঈশ্বর-অংশ। যেদিন থেকে তোমাকে দেখেছি নবদ্বীপে, সেদিন থেকে তুমি আমার চিত্ত আলো করে আছ। কিন্তু

আজ যা দেখলাম, তা অপরূপ। আজ আলোর চেয়েও বেশি, আজ আনন্দ। আজ তোমাকে দেখলাম না কৃষ্ণকে দেখলাম। তোমাকে দেখেই আজ আমার কৃষ্ণদর্শনের সুখ হচ্ছে।'

'এ আপনার কৃপা, আমার ভাগ্য।' বিনয়বচনে নিমাই বললে।

ফল্গুতীর্থে গিয়ে নিমাই বালির পিণ্ড দিলে। তারপর গেল প্রেতগয়ায়। তারপর রামগয়ায়। সেখান থেকে যুধিষ্ঠিরগয়ায়। ক্রমে ক্রমে ষোড়শগয়ায়। সব গয়াতেই শ্রাদ্ধ করল ক্রমে ক্রমে। তারপরে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করে শেষ পিণ্ড গয়াশিরে।

'আমি আর আমার স্ববশে নেই।' বললেন ঈশ্বরপুরী, 'আমি এখন তোমারই অধীন। তুমি এখন যা বলবে আমি তাই করব, আমাকে তাই করতে হবে।'

সর্বস্থানে সর্বপ্রকার শ্রাদ্ধ সেরে নিমাই নিজের বাসায় ফিরে এল, আর স্বহস্তে রাঁধতে বসল। রান্না শেষ হয়েছে, এমন সময় প্রেমাবিষ্ট ঈশ্বরপুরী মুখে কৃষ্ণনাম বলতে-বলতে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।

'তোমাতে চোখের আড় করে থাকি, এমন আর আমার সাধ্য নেই।' বললেন ঈশ্বরপুরী, 'আর এখন তো সমীচীন সময়েই এসেছি। তোমার রান্নাও শেষ আর আমিও ক্ষুধার্ত।'

'খুব আনন্দের কথা।' নিমাই তৃপ্ত মুখে বললে, 'দয়া করে তবে বসুন। আমি ভাত বাড়ি আপনার জন্যে।'

'আমি খেলে তুমি খাবে কী?'

'আমি পরে রান্না করে নেব।'

'তা কি হয়?' ঈশ্বরপুরী ব্যস্ত হয়ে উঠলেন: 'বরং যা রেঁধেছ, এস, দুজনে ভাগ করে খাই।'

'তা হয়না।' নিমাই সব ভাত এক থালায়ই বাড়তে লাগল। গম্ভীরস্বরে বললে, 'যদি সত্যিই আপনি আমাকে চান, সমস্ত ভাত আপনাকে খেতে হবে। বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ করবেন না। তিলার্ধের মধ্যে আমি আবার রান্না করে নেব নিজের জন্যে।'

কৃষ্ণ-ছাড়া ঈশ্বরপুরীর অন্য মতি নেই। কৃষ্ণের প্রসাদ খেতে বসে গেল পাত পেড়ে। আপন হাতে পরিবেশন করল নিমাই। পরমানন্দে খেতে লাগল ঈশ্বর।

খাইয়েও ছুটি দিল না। চন্দন নিয়ে এসে ঈশ্বর-অঙ্গ লেপতে বসল নিমাই। ঈশ্বরের গলায় ঝুলিয়ে দিল ফুলের মালা। দিব্যগন্ধে আমোদ হতে লাগল ঈশ্বরের।

ঈশ্বরের বাসায় এল নিমাই। নিভৃতে তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে, 'আমাকে মন্ত্রদীক্ষা দিন।'

ঈশ্বর বললেন, 'মন্ত্র বলছ কী। আমি তোমাকে আমার প্রাণ দিয়ে দিতে পারি।'

দশাক্ষর-মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন ঈশ্বর। ঈশ্বরকে নিমাই তখন প্রদক্ষিণ করল। বললে, 'আমার দেহ আপনাকে অর্পণ করলাম। আমাকে এমনি শুভদৃষ্টি করুন, যাতে আমি কৃষ্ণপ্রেমসমুদ্রে ভাসতে পারি নিরন্তর।'

'হেন শুভদৃষ্টি তুমি করহ আমারে।
যেন আমি ভাসি কৃষ্ণপ্রেমের সাগরে॥'

মন্ত্র দিয়ে ঈশ্বরপুরী আলিঙ্গন করলেন নিমাইকে। দুজনেই কাঁদতে লাগলেন অঝোরে, উদ্বেল আনন্দে।

তারপরে ঈশ্বরপুরী কোথায় চলে গেলেন, কেউ জানে না.

এ কে? কাকে সে মন্ত্র দিল? জীবনে কত বড় সিদ্ধি, যিনি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন. তিনিই মন্ত্র নিলেন তাঁর কাছে। দীক্ষা-গ্রহণ-লীলার অভিনয় করলেন। দীক্ষার পর নিমাই বারে বারে প্রণাম করে ঈশ্বরকে। যাকে ভগবান বলে জানি, তার প্রণাম নিই কী করে? নিমাইয়ের থেকে দূরে সরে যাই। দূরে সরব কোথায়? নিমাই আমার হৃদয়ের মধ্যে, আমার অণুতে অণুতে। মাধবেন্দ্র যে বীজ পুঁতেছিলেন, নিমাই তারই ফলন্ত বৃক্ষ।

পরে যখন প্রভু কুমারহট্টে এসেছেন, ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থানে, কাঁদতে

লাগলেন অনর্গল। সে স্থানের মৃত্তিকা তুলে বহির্বাসে বাঁধলেন ঝুলি করে। বললেন, এ ধুলো নয়, এ সোনা। কোথায়—কোথায় আমার সেই আনন্দের আকর, সেই স্বর্ণ-খনি!

এই অধন্য দিনান্তর আমি কাটাই কী করে? হে অনাথবন্ধো, করুণৈকসিন্ধো, হা হন্ত, হা হন্ত, কথং নয়ামি? কী করে কাটবে আমার দিনরাত্রি? বলো, কী করে? 'এই কাল না যায় কাটন।'

২০

'দীক্ষা-অনন্তরে কৈল প্রেম-পরকাশ।' যে পরম গম্ভীর ছিল সে এখন পরম বিহ্বল হয়ে পড়ল। ছাড়ল কথাস্ফূর্তি, ছাড়ল দেহচেষ্টা। কখনো ঊর্ধ্বমুখে চেয়ে থাকে, কখনো বা ধ্যাননিশ্চল চোখে, শূন্য পানে। কখনো বা বিরলে বসে কাঁদে। কার সঙ্গে বা কথা বলে স্বগত। কী হল আমাদের নিমাইয়ের? সঙ্গীরা দিশেহারার মত পরস্পরের মুখচাওয়াচাওয়ি করে। নিজেরাও কিছু বোঝে না, নিমাইকে জিগগেস করলেও কিছু বলে না।

আমি কি জানি আমার কী হয়েছে! রাধিকাই বা কী জানত!

'রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে, না শুনে কাহারো কথা॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে, না চলে নয়নের তারা।
বিরতি আহারে, রাঙ্গা বাস পরে, যেমন যোগিনী পারা॥
আউলাইয়া বেণী, চুলের গাঁথনী, দেখয়ে খসায়া চুলি।
হসিত বয়ানে চাহে চন্দ্র পানে, কি কহে দু হাত তুলি॥
এক দিঠি করি ময়ুর-ময়ূরী-কণ্ঠ করে নিরখনে।
চণ্ডীদাস কয়—নব পরিচয় কালিয়া বন্ধুর সনে॥'

কৃষ্ণের সঙ্গে নতুন পরিচয় হয়েছে। 'কৃষ্ণগন্ধলুব্ধ রাধা।' কৃষ্ণের অঙ্গে আটটি পদ্ম। অঙ্গ নলিনাষ্টক। কি কি? নেত্রদ্বয়, করদ্বয়, পদদ্বয়, নাভি আর মুখ। কী দিয়ে চর্চিত করেছেন? মৃগমদ আর কর্পূর, বরচন্দন আর অগুরু দিয়ে। পদ্মগন্ধের সঙ্গে মিশে গিয়েছে অঙ্গানুলেপের গন্ধ। বায়ুর তরঙ্গ নয়, শুধু অঙ্গগন্ধের তরঙ্গ। সেই তরঙ্গ শুধু আমার ঘ্রাণস্পৃহাকেই বিস্তার করছে। স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি নাসাস্পৃহাম্।

গুরুদত্ত মন্ত্র জপ করছে, হঠাৎ নিমাই ডুকরে কেঁদে উঠল: 'কৃষ্ণ রে, বাপ রে, তুমি কোথায়? তুমি কোন দিকে পালালে?' বলতে বলতে মাটিতে মূর্ছিত হয়ে পড়ল। শিষ্যদের শুশ্রূষায় মূর্ছা যদি বা ভাঙল, ধুলোয় গড়াগড়ি দিয়ে আবার কাঁদতে লাগল: 'কৃষ্ণ, বাপ আমার, জীবন-শ্রীহরি, তুমি আমার প্রাণ চুরি করে কোথায় অন্তর্হিত হলে?'

কে সান্ত্বনা দেবে নিমাইকে? যে স্তোকবাক্য বলতে আসে সে নিজেই কেঁদে আকুল। নিমাইয়ের কান্নায় তাদেরও কান্না।

কৃষ্ণ যদি ব্রজে না আসে এ নিশ্চিত যে আমি তাকে পাব না, সেও পাবে না আমাকে। তবে এত কষ্ট স্বীকার করে এ দেহ রেখে লাভ কী? ললিতাকে বলছে রাধিকা: এ দেহ আমি ছেড়ে দেব। আমার মৃত্যুর পর এ দেহ ধরে রাখতে তোমরা কোনো চেষ্টা কোরো না। এ দেহ পচে যাক, গলে যাক, পুড়ে যাক, মিশিয়ে যাক মাটির সঙ্গে। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চভূতে লয় হয়ে যাক। এই পঞ্চভূতই তো আমার প্রাণবল্লভের ব্যবহারের বস্তু। তার ব্যবহারের বস্তুর সঙ্গে এ দেহ মিশে গেলেই তো আমি কৃতার্থ। সখি, এ দেহ দিয়ে তো তার সেবার সৌভাগ্য হল না। দেহাবশেষ দিয়েও যদি তার একটু সেবা করতে পারি। তার সেবা ছাড়া এ জীবনের সার্থকতা কী!

'কিবা মন্ত্র দিলা গোসাঞি! কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল॥'

কে বলে তুমি পাগল ? তোমার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়েছে। কৃষ্ণনামের মজাই এই, যে এই নাম জপবে তার প্রাণই কৃষ্ণপ্রেমের পাথার হয়ে উঠবে। প্রেমের তরঙ্গে সে তখন হাসবে কাঁদবে নাচবে ধুলোয় গড়াগড়ি দেবে।

'কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই তো স্বভাব।
যেই জপে—তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব॥'

আমাদের নয়নপথে আবির্ভূত হও। গোপীরা কৃষ্ণের জন্যে কাঁদছে। হে সম্ভোগপতি, হে অভীষ্টপ্রদ, আমরা তোমার বিনাবেতনের কিঙ্করী, তাই বলে কি সুস্ফুট কমলনয়নের আঘাতে তুমি আমাদের বধ করবে ? তুমি আমাদের বিষ, সর্প, রাক্ষস, বাত্যা, দাবানল—সকল প্রকার ভয় থেকে রক্ষা করেছ, তবে এখন কেন তুমি উদাসীন ? ব্রহ্মার প্রার্থনায় বিশ্বপালনের জন্যে তোমার জন্ম। তুমি গোপিকাসুত নও, তুমি অখিলদেহীর অন্তরের সাথী। অতএব আমরা যখন তোমার ভক্ত, আমাদের প্রার্থনা পূরণ করো। আমাদের ভজনা করো, আমাদের দেখাও তোমার শ্রীমুখ। তোমার যে পাদপদ্ম প্রণতদেহীর পাপনাশন, লক্ষ্মীর সাধনের তীর্থ, যা দিয়ে তুমি গোচারণে যেতে, যা কালীয়ের ফণার উপর ন্যস্ত করেছিলে, তা এখন আমাদের কুচতটের উপর অর্পণ করে আমাদের অনঙ্গবেদনা অপহরণ করো। তোমার কথামৃত আমাদের বিহ্বল করেছে। তুমি এস, তোমার অধরসুধায় আমাদের পুনর্জীবিত করো। তোমার কথাই তো তপ্তজনের জীবনপ্রদ, শ্রবণমাত্রেই মঙ্গলসাধক, সমস্ত কামকর্মনিবারক। যারাই তোমার কীর্তক তারাই বহুদাতা।

নিমাই সঙ্গের লোকদের বললে, 'তোমরা বাড়ি ফিরে যাও।'

'আর তুমি ?'

'আমি আর ফিরব না। আমি মথুরায় চললাম।'

'মথুরায় ?'

'হ্যাঁ, মাকে বোলো আমি কৃষ্ণ পেতে মথুরায় চলেছি। আর প্রবেশ করব না সংসারে।'

সকলে মিলে ঠেকাল নিমাইকে। বোঝাতে বসল।

রাত্রে, সবাই যখন ঘুমিয়েছে, প্রেমের আবেশে বেরিয়ে পড়ল নিমাই। কৃষ্ণ রে, বাপ রে, কোথায় গেলে পাব তোমাকে, কোন পথে, কোন অরণ্যে? তোমাকে ছাড়া আমার রাত অন্ধকার, দিনও অন্ধকার।

কিছু দূর যেতে দৈববাণী শুনল নিমাই। এখন বাড়ি ফিরে যাও, কাল পূর্ণ হলে যাবে মথুরায়।

'কথোদূর যাইতে শুনেন দিব্যবাণী।
এখনে মথুরা না যাইবা দ্বিজমণি॥
যাইবার কাল আছে যাইবা তখনে।
নবদ্বীপে নিজগৃহে চলহ এখনে॥'

আকাশবাণী শুনে গৌরহরি ফিরে চলল নবদ্বীপ। পৌষমাসের শেষে বাড়ি পৌঁছুল।

নিমাই ফিরেছে। শচী ছুটে এল বাইরে, বিষ্ণুপ্রিয়া দোরের আড়ালে দাঁড়িয়ে রইল। মার পাদুখানি ধরে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করল নিমাই, আর চক্ষুর স্নিগ্ধ প্রসাদটি রাখল প্রিয়ার নয়ন দুটিতে।

কিন্তু এ নিমাই কী হয়ে গিয়েছে! এ যেন আরেক মানুষ। বিদ্যার সেই ঔদ্ধত্য নেই, নেই বা প্রাধান্যবোধ। মূঢ় জগৎসংসারকে উপেক্ষা করবার জন্যে মুখে যে একটি বিদ্রূপের রেখা ছিল সেটিও অন্তর্হিত হয়েছে। নিমাই এখন নম্রতা-বশ্যতার প্রতিমূর্তি। মুখখানি বুঝি বা একটু ম্লান, দুটি চোখ করুণায় স্নান করা। সকলের চেয়ে তুচ্ছ, সকলের চেয়ে দীন, এমনি এক আর্তি তার শরীরে। অন্যমনস্ক, না, দূরমনস্ক। যে অনর্গল কথা কইত, কথা কইতে ভালোবাসত, সে এখন স্তব্ধতার সঙ্গেই কথা কইতে উন্মুখ। কেন যে চোখে জল আসছে কে জানে! এ কি তার দুঃখের অশ্রু না আনন্দের অশ্রু, তাই বা কে বলবে?

'কৃষ্ণের চরণে যদি হয় অনুরাগ।
কৃষ্ণ বিনু অন্যত্র তার নাহি রহে রাগ॥'

কৃষ্ণের প্রীতি উদ্দেশ্যেই যে সেবাবাসনা তার নামই অনুরাগ বা প্রেম। যদি সেবা না থাকে তা হলে সম্বন্ধও থাকে না। আর সম্বন্ধ না থাকলে প্রেম কোথায়? আলোকহীন সূর্য যেমন নিরর্থক তেমনি সেবাবাসনাহীন সম্বন্ধজ্ঞানও নিরর্থক। প্রেম যদি জাগে সঙ্গে-সঙ্গে সেবা করবার সাধও জাগবে। আর কৃষ্ণপ্রেম যদি জাগে তাহলে কৃষ্ণসেবার সাধ ছাড়া আর কিছুতেই মন আসক্ত হবে না, আকৃষ্ট হবে না।

'কৃষ্ণপ্রেম সুনির্মল যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল
সেই প্রেমা অমৃতের সিন্ধু।
নির্মল সে অনুরাগে না লুকায় অন্যদাগে
শুক্লবস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু॥'

সাদা কাপড়ে কালির ছোট দাগটিও ধরা পড়ে। তেমনি সুনির্মল কৃষ্ণপ্রেমে যদি সুখবাসনার লেশ থাকে তা হলে তাও ধরা পড়বে। তা পড়ুক। আশার কথা এই, কৃষ্ণপ্রেম গঙ্গাজল। গঙ্গাজলে তো কত কর্দম কত আবর্জনা, তবু তা সংসারমোচক। তেমনি কৃষ্ণপ্রেমের সঙ্গে সুখবাসনা থাকলেও তা অনুরূপ সংসারতারক। কিন্তু গঙ্গাজল যদি আবিল হয় তবে তা সুস্বাদু হয় না, তেমনি কৃষ্ণপ্রেমের সঙ্গে যদি বিষয়মালিন্য মেশে তবে তাও বিস্বাদ লাগে। সুস্বাদু লাগুক আর না লাগুক, কৃষ্ণপ্রেমই পুরুষার্থ। পরমপ্রয়োজন।

'গোবিন্দ শীতলানন্দ করুন প্রসাদ।' নিমাইকে গুরুজনেরা আশীর্বাদ করছে। তবু নিমাইয়ের কান্নার বিরাম হচ্ছে না কেন?

শ্রীমান পণ্ডিত, সদাশিব কবিরাজ আর মুরারি গুপ্ত—তিন বন্ধুর কাছে তীর্থকথা বলছে নিমাই।

'বিষ্ণুপাদপদ্ম দেখলাম। গয়ায় এসে ঐখানে কৃষ্ণ পা রেখেছিল, ঐখানেই ধুয়েছিল পা। ঐ পা-ধোয়া জলই তো গঙ্গা। সেই গঙ্গাই শিব মাথায় ধরেছে।' বলতে-বলতে থেমে পড়ল নিমাই। চক্ষু নির্নিমেষ হয়ে গেল। মহাশ্বাস ছেড়ে কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলে কাঁদতে লাগল। টলে পড়ে গেল মাটিতে।

এ কী অবস্থা! তিন বন্ধু স্তম্ভিত হয়ে রইল। পরে শুশ্রূষায় মন দিল। কী বলে কাকে বোঝাব! কী দুঃখ যে সান্ত্বনা দিই। কৃষ্ণকে কি দেখছে, না, দেখতে পাচ্ছে না বলে কাঁদছে? যারই জন্যে কাঁদুক, মানুষের চোখে এত অশ্রু থাকতে পারে এ কবে কে দেখেছে? এরই নাম বুঝি প্রেমগঙ্গা?

সুবিশাল তনু কত বলবান হয়ে উঠেছে, কী সুঠাম সুন্দর! সর্বকলেবর এখন পুলকপরিপূর। থরথর করে কাঁপছে কখনো। কখনো বা স্বেদ ঝরছে। কখনো বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে। কখনো কথা বলছে গদ্গদ ভাষে। কখনো বা ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সব মিলে আনন্দচমৎকার।

কৃষ্ণভাবে চিত্ত আক্রান্ত হলেই চিত্তকে সত্ত্ব বলে। এই সত্ত্ব থেকে যে ভাব জাগে তাই সাত্ত্বিক ভাব। সাত্ত্বিক ভাব আট রকম। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু আর মূর্চ্ছা। এই সাত্ত্বিক ভাবের প্রকাশ এখন নিমাইয়ে।

> 'প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে কাঁন্দে গায়।
> উন্মত্ত হইয়া নাচে—ইতি-উতি ধায়॥
> স্বেদ কম্প রোমাঞ্চাশ্রু গদ্গদ বৈবর্ণ্য।
> উন্মাদ বিষাদ ধৈর্য গর্ব হর্ষ দৈন্য॥
> এই ভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায়।
> কৃষ্ণের আনন্দামৃতসাগরে ভাসায়॥'

'সেই নিমাই কী হয়ে গেল দেখছ?' বললে সদাশিব।

'কে জানত সেই বিদ্বান এমন ভক্তিমান হবে?' মুরারি বললে।

'কিন্তু আসল ব্যাপার কী?' শ্রীমান পণ্ডিত তট বা তল কিছুই খুঁজে পাচ্ছে না। নিমাই কি কৃষ্ণকে দেখছে, না, দেখছে না? দেখছে না বলে যদি কাঁদছে তবে আনন্দে এমন মাতোয়ারা কেন? আর দেখছে বলে যদি তার পুলকরোমাঞ্চ, তবে এমন কাঁদছে কেন অঝোরে!

বন্ধুদের সেবায় কিছুটা শান্ত হল নিমাই। বললে, 'কাল তোমরা তিন জন শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাড়ি যাবে। সেখানে নিভৃতে বসে তোমাদের কাছে আমার দুঃখের কথা নিবেদন করব।' 'মোর দুঃখ নিবেদিব নিভৃতে বসিয়া।'

'মা, ওঠ, ওঠ—' শচীর রুদ্ধ ঘরের দরজায় করাঘাত করছে বিষ্ণুপ্রিয়া।

'কি, কী হয়েছে?' ধড়মড় করে উঠে বসল শচী।

'দেখ এসে উনি কেমন করছেন।'

তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে শচী দেখল, শয্যায় বসে 'নিমাই কাঁদছে, অবুঝের মত কাঁদছে। বউয়ের দিকে তাকাল শচী। বালিকা বিষ্ণুপ্রিয়া কী এর ব্যাখ্যা দেবে? ঝড়ে পড়া পাখির মত চেয়ে রইল অবোলা চোখে।

ছেলের মাথায় হাত রাখল শচী। বললে, 'নিমাই, কাঁদছিস কেন?'

প্রশ্ন নিমাইয়ের কানেও ঢুকল না।

'কেন কাঁদছিস বাপ, কী হয়েছে?'

কে কার কথা শোনে।

'তোর কিসের দুঃখ? আর যদি দুঃখ থেকেই থাকে, আমি তোর মা, সেই কথা তুই আমাকে বলবি না তো কাকে বলবি?'

নিমাইয়ের কান্না আরো বেড়ে চলল।

'নিমাই, বাপ,' গায়ে-পিঠে হাত বুলোতে লাগল শচী। বললে, 'অন্যে উতলা হলে তুই তাকে শান্ত করিস, এখন তুই-ই যদি উতলা হোস তোকে কে শান্ত করবে? আমার এত গম্ভীর নিমাই পণ্ডিত কেন পাগল হল, বিহ্বল হল?' শচীও কাঁদতে লাগল।

মায়ের কান্না বুঝি শুনতে পেল নিমাই। বললে, 'মা, আমি কাঁদছি দেখে তুমি কেঁদো না। আমি স্বপ্নে বনমালী কৃষ্ণকে দেখলাম। সেই কালিন্দীপুলিনপ্রাঙ্গণপ্রণয়ী কৃষ্ণ। যার বাঁশির স্বরে শুষ্ক স্থাবর

সজীব হয়ে ওঠে সেই বিপুলবিলোচন কমনীয় কিশোর, অখিললক্ষ্মী-চিত্তহারী মুগ্ধমূর্তি। মা, এমন রূপ আর দেখিনি, এমন বাঁশি আর শুনিনি। কিন্তু জানো, দেখা দিয়েই সে কোটিমদনবিমোহন পালিয়ে গেছে। কৃষ্ণকে সকলে কল্পতরুর চেয়েও উদার বলে। কল্পতরু বিনা প্রার্থনায় কাউকে কিছু দেয় না। বাঞ্ছাতিরিক্ত দান কল্পতরুর নিয়ম নয়। কিন্তু কৃষ্ণ, মা, না চাইলেও দান করে। না চাইতেই স্বপ্নে দেখা দিয়েছিল, কিন্তু মিলিয়ে গেল। আবার কৃষ্ণ দেখা দেবে সেই আশায় তৃষ্ণাতুর চোখে তাকিয়ে আছি। যমুনা বা জাহ্নবীর স্রোতের বিরাম আছে, আমার এই সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে থাকার বিরাম নেই।'

সারা রাত বসে মা আর স্ত্রী শুনতে লাগল কৃষ্ণকথা।

ভোরবেলা শ্রীবাসের বাড়ি ফুল তুলতে এসেছে শ্রীমান। শুধু শ্রীমান নয়, গদাধর, গোপীনাথ, আরো অনেকে। শ্রীমানের মুখখানি হাসি-হাসি।

'বড় যে হাসি দেখছি। কী ব্যাপার?' জিগগেস করল শ্রীবাস।

'তা, কারণ ছাড়া কি কার্য হয়?'

'সত্যি? বলো না কী কারণ?' আগ্রহে এগিয়ে এল শ্রীবাস।

'সে এক অদ্ভুত কথা। নিমাই পণ্ডিত পরম বৈষ্ণব হয়ে গিয়েছে।'

'বলো কী?'

'গয়া থেকে ফিরেছে জেনে বিকেলে গিয়েছিলাম কুশল সম্ভাষ করতে।' বলতে লাগল শ্রীমান: 'গিয়ে দেখি উদ্ধত নিমাই আর নেই, এ এক বিনম্র নিমাই। বৈরাগ্যে-ঔদাস্যে অপরূপ। আমাদের কাছে তীর্থের কথা বলতে লাগল। পাদপদ্মতীর্থের নাম নেওয়ামাত্র বিরাট বিপ্লব এল নিমাইয়ে। সর্ব-অঙ্গে মহাকম্পপুলক উপস্থিত হল। কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বলে কাঁদতে-কাঁদতে মূর্ছিত হয়ে পড়ল মাটিতে। ভাই, এত কান্না মানুষে কাঁদতে পারে তা আমার জানা ছিল না। দেখিনি কখনো শুনিনি কখনো।' 'যে-অশ্রু দেখিল আমি তাহান নয়নে। তাহানে মনুষ্যবুদ্ধি নাহি আর মনে॥'

'এর মত শুভসংবাদ আর কী আছে?' বললে শ্রীবাস, 'নিমাই যদি বৈষ্ণব হয় তা হলে আর পায় কে আমাদের? বিদ্বেষীদের তবে দেখে নেব এবার।'

'শোনো। নিমাই আমাকে আর সদাশিবকে আর মুরারিকে শুক্লাম্বরের বাড়ি যেতে বলেছে। সেখানে নাকি আমাদের বলবে সে আরো দুঃখের কথা।' শ্রীমান ত্বরান্বিত হল: 'ফুল তুলেই সেখানে যাচ্ছি।'

শ্রীবাসের উঠোনে কুন্দফুলের ঝাড়। গদাধরও ফুল তুলছিল। যতই ফুল তোলে ততই শাখায় আবার ফুল আসে। ফুল তুলে গাছকে কেউ রিক্ত-শূন্য করতে পারে না। 'যতেক বৈষ্ণব তোলে, তুলিতে না পারে। অক্ষয় অব্যয় পুষ্প সর্বক্ষণ ধরে।' কিন্তু গদাধর যে নিজেই নিষ্পুষ্প, নির্গন্ধ। কই, তাকে তো নিমাই নিমন্ত্রণ করল না, শুক্লাম্বরের বাড়িতে উপস্থিত থাকতে বলল না। সে কি নিমাইয়ের অন্তরঙ্গ হবার অধিকারী নয়? নিমাইয়ের দুঃখের কথা সেও কি একটু শুনতে পায় না? তবে নিশ্চয়ই তার হৃদয়ে ভক্তি নেই, নেই নামগন্ধ। সে তাই প্রত্যাখ্যানের যোগ্য।

তবে ভক্তি কী?

গর্গাচার্য বললে, কথাদিষ্বনুরাগঃ। অর্থ, ভগবানের কথা ইত্যাদিতে অনুরাগ। অঙ্গিরা বললে, সানুরাগরূপা।

অনুরাগ কী?

আসক্তির নাম অনুরাগ। যেমন শিশুর মাতৃস্তন্যে, কামুকের কামিনীতে, গৃধ্নুর অর্থে, তৃষ্ণার্তের জলে, ক্ষুধিতের অন্নে, অজ্ঞানীর দেহে, কুলটার উপপতিতে আকর্ষণ, তেমনি ভগবানের প্রতি একান্ত আকর্ষণের নাম অনুরাগ। আর সেই অনুরাগই ভক্তি।

ইন্দ্রিয় নির্মল করে প্রিয়তমের যে সেবা তার নামই ভক্তি। ইন্দ্রিয়কে নির্মল করব কা করে? সর্বত্র ভগবানকে দেখে, সকল শব্দে ভগবানকে শুনে, সকলরূপে ভগবানের আস্বাদনে, নিখিলগন্ধে তাঁর

ঘ্রাণ নিয়ে, সমস্ত স্পর্শে তাঁর স্পর্শ অনুভব করে। সেই অনুভবেই নির্মল হওয়া।

এ তো খুব কঠিন শোনাচ্ছে। এমন লোক আছে নাকি পৃথিবীতে?

দুর্লভ হলেও আছে। চন্দন দুষ্প্রাপ্য, কিন্তু পাওয়া যায়। ভক্তিদেবীর কাছে কেউ বঞ্চিত হয় না। আর কিছু না পারো তুমি শুধু শ্রবণ-কীর্তন করো। শ্রবণের চেয়ে অবশ্য কীর্তন শ্রেষ্ঠ। শ্রবণে শুধু কান পরিতৃপ্ত হয়, কীর্তনে রসনাও পরিতৃপ্ত হবে।

'প্রভু কহে শাস্ত্রে কহে শ্রবণ কীর্তন।
কৃষ্ণপ্রেম সেবাফলের পরম সাধন ॥
শ্রবণকীর্তন হতে হয় কৃষ্ণপ্রেমা।
সেই পরমপুরুষার্থ, পুরুষার্থে সীমা ॥'

কিন্তু নাম করতে হলেও তো শ্রদ্ধা চাই। না, নাম শ্রদ্ধারও অপেক্ষা করে না। সংশয়সত্ত্বেও নাম করো, শুষ্কতাতেও ভয় কোরো না। ডাকতে ডাকতেই ভক্তি আসবে। প্রবল নামশক্তির দুয়ারেই ভক্তি শৃঙ্খলিতা।

তা হলে আর ভয় নেই গদাধরের। সেও তবে যাবে শুক্লাম্বরের বাড়িতে। না হয় লুকিয়ে থাকবে।

শ্রীবাস হুঙ্কার দিয়ে উঠল: 'কৃষ্ণ আমাদের বৈষ্ণবপরিবার বৃদ্ধি করুন।' 'গোত্র বাড়াউক কৃষ্ণ আমা সভাকার।'

শুক্লাম্বরের ঘরে সমবেত হয়েছে তিন বন্ধু।

ঐ আসছে নিমাই।

দীর্ঘকায় পরাক্রান্ত পুরুষ কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে স্খলিত হয়ে পড়ছে। বাহ্যদৃষ্টির প্রকাশ মাত্র নেই। অজস্র ধারায় অশ্রু পড়ছে গড়িয়ে।

এ কী, সর্বক্ষণই আবেশ। সর্বক্ষণই অশ্রুস্নান।

'আমার কৃষ্ণ কোন দিকে গেল? তাকে পেয়েছিলাম, দেখেছিলাম, কিন্তু সে পালিয়ে গেল। কেন পালিয়ে গেল? কোন দেশে গেল?'

টলতে টলতে একটা স্তম্ভ ধরল নিমাই। ভেঙে পড়ল স্তম্ভ।

জলসিঞ্চনে অর্ধ বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল নিমাইয়ের। সে এবার আরেক-জনের কান্না শুনছে। জিগগেস করল, 'ঘরের মধ্যে কে কাঁদে ?'

শুক্লাম্বর বললে, 'তোমার গদাধর।'

'গদাধরকে ডাকো।'

গদাধর বেরিয়ে এল।

নিমাই বললে, 'গদাধর, তুমিই ধন্য। শিশুকাল থেকে তুমি আমার সঙ্গে ছায়ার মত বেড়াচ্ছ, কিন্তু ছায়াই সার্থক, দেহী নয়। শিশুকাল থেকেই তুমি কৃষ্ণে দৃঢ়মতি, কিন্তু আমার জীবন বৃথা-রসে কেটে গেল। অমূল্য নিধি পেয়েও আবার হারালাম। তোমরা সব বলো, আমার কৃষ্ণ কোথায়।'

ক্ষণে পড়ছে ক্ষণে উঠছে। দুই চোখ প্রেমজলের প্লাবনে মেলতে পারছে না। নিমাইকে দেখে আর সকলেও কাঁদছে। হরি-হরি ধ্বনি তুলছে। ঈশ্বরপুরীর সঙ্গ থেকেই এই কৃষ্ণপ্রকাশ। বলছে কেউ কেউ। 'গয়াধামে ঈশ্বরপুরী কিবা মন্ত্র দিল। সেই হতে নিমাই আমার পাগল হইল।' কৃষ্ণরহস্যের উদ্ভেদ হল এতদিনে, বলছে আবার কেউ কেউ। নিমাই একটু সুস্থ হোক, পাষণ্ডীদের মুণ্ড ছিঁড়ে নেব এবার, কেউ কেউ আবার আস্ফালন করলে।

'আমার দুঃখের খণ্ডন করো সকলে। নন্দগোপের নন্দনকে এনে দাও।' মাটিতে চুল লুটিয়ে দিয়ে কাঁদছে নিমাই।

সারা দিন চলে গেল, স্নানাহার নেই নিমাইয়ের। সন্ধ্যায় টলতে টলতে ফিরে চলল বাড়ি। শচী তার ভার নিল।

স্নানাহারের পর আবার বেরিয়ে পড়েছে নিমাই। এবার তার ছাত্রেরা তাকে ঘিরে ধরল। মনে পড়ল, হ্যাঁ, সে তো টোলে পড়াত এ সব ছাত্রদের। আর কি তবে সে পড়াবে না এদের ? আর কি কিছু পড়াবার নেই ?

গুরু গঙ্গাদাসের কথা মনে পড়ে গেল। সটান চলে গেল পণ্ডিতের বাড়ি। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করল গুরুকে।

'তোমার জীবন সার্থক, পিতৃকুল মাতৃকুল দুই কুলই মোচন করলে। এবার তবে আবার অধ্যাপনা শুরু করো।' বললে গঙ্গাদাস।

'আর কেউ পড়ালে হয় না?'

'তোমার পড়ুয়ারা তোমাকে ছাড়া আর কাউকে জানে না। তোমার যাবার পর থেকে ওরা পুঁথিতে ডোর দিয়ে বসে আছে। পড়তে হলে তোমার কাছেই পড়বে, আর কারু কাছে নয়।'

'আমি আর কী পড়াব?'

সেখান থেকে মুকুন্দসঞ্জয়ের বাড়ি গেল। মেয়েরা উলু দিয়ে উঠল, শঙ্খধ্বনি করল। চণ্ডীমণ্ডপে টোল ছিল নিমাইয়ের, সেখানে গিয়ে বসল। মুকুন্দ এসে প্রণাম করল, নিমাই তাকে বাহুবন্ধনে বেঁধে কাঁদতে লাগল।

'হা নাথ রমণপ্রেষ্ঠ ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ।
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্॥'

২১

ঊষাকালে গঙ্গাস্নান করে নিমাই টোলে গিয়ে বসল। পড়ুয়ারা আসতে লাগল একে-একে। হাতে পুঁথি আছে সকলের কিন্তু ডোর দিয়ে বাঁধা। যার-যার আসনে বসল স্থির হয়ে।

ডোর খোলো এইবার।

কোনোদিন এমন হয়নি, পড়ুয়ারা ডোর খোলবার আগে হরি-হরি বলে উঠল। হরিধ্বনির সঙ্গে-সঙ্গেই খুলে গেল ডোর। হরিধ্বনিই কি সমস্ত বন্ধনমোচনের ভূমিকা?

হরিধ্বনি শুনে নিমাই আনন্দে আবেগে বিভোর হয়ে গেল।

বললে, 'সর্বকালে হরিনামই সত্য। সূত্র বৃত্তি টীকা সমস্তই হরিনাম। হরি ছাড়া শাস্ত্র নেই শব্দ নেই ব্যাখ্যা নেই। আবার বলো। আবার শুনি।'

হরি শব্দের নানা অর্থ, দুটি মুখ্যতম। এক, 'সর্ব অমঙ্গল হরে'; আর 'প্রেমে হরে মন।' যিনি হরণ করেন তিনিই হরি। কী হরণ করেন? সমস্ত অমঙ্গলের যা কারণ সেই মায়াবন্ধন হরণ করেন। আর হরণ করেন আসক্তি যা মনের সঙ্গে ওতপ্রোত। শুধু নিয়েই যান না, দিয়েও যান। আসক্তি নিয়ে দিয়ে যান কৃষ্ণপ্রেম।

কৃষ্ণ তাই চৌরাগ্রগণ্য। ব্রজের নবনীতচোর, গোপীদের দুকূল-চোর, রাধিকার হৃদয়চোর, নবাম্বুদের শ্যামলকান্তিচোর। আর আমাদের বহুজন্মার্জিত পাপচোর, যমবন্ধপাশচোর।

মাধুর্য-চাতুর্যের সম্পদ কৃষ্ণের মুখপঙ্কজ সততই আমার হৃৎ-সরোবরে বিরাজ করুক। এ পদ্মের মকরন্দ কোথায়? মুরলীধ্বনিই এ পদ্মের মকরন্দ। কৃষ্ণের কপোল দুটি মুকুরায়মান ইন্দ্রনীলমণি। চোখ দুটি ভাবোদ্গারে ও স্মরমদে ঈষৎ মুকুলিত। তার সেই মধুরিমার কণিকাও কি আমার বাক্যে প্রকাশ পাবে? তবু আমার সেই বাঙ্ময়জীবিত মদনমন্থরমুগ্ধ শ্যামসুন্দরের জয় হোক।

'কৃষ্ণে যার রতি-মতি নেই, সর্বশাস্ত্র পড়েও তার দারিদ্র্য যাবেনা।' আপন মনে বলতে লাগল নিমাই, 'কিন্তু দুর্গত অধমও যদি কৃষ্ণনাম নেয় তার কৃষ্ণধামে গতি হয়। কৃষ্ণের ভজন নেই অথচ শাস্ত্রব্যাখ্যা করে, সে ভারবাহী গর্দ্দভ ছাড়া আর কী! কৃষ্ণপদে ভক্তি—এই শাস্ত্রমর্ম যে পড়াবে, তার নিজের জীবনে তা বিশদ করতে হবে। সুতরাং আর কিছু নয়, কৃষ্ণপাদপদ্মধন ভজন করো।'

'পুতনারে যে প্রভু করিলা মুক্তিদান।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি লোক করে অন্যধ্যান॥
অঘাসুর হেন পাপী যে কৈল মোচন।
কোন্ সুখে ছাড়ে লোক তাহার কীর্তন॥'

ঘোরা খেচরী কামচারিণী পুতনা নন্দগৃহে যদৃচ্ছা ঘুরতে ঘুরতে শয্যার উপরে বালককে দেখতে পেল। সে বালক যে অসাধুদের অন্তকারক, ভস্মাচ্ছাদিত পাবকের মত স্বীয় অসীম তেজ প্রচ্ছন্ন করে রেখেছে, জানত না পুতনা। সুতরাং তার ভয়ও হল না। চরাচরাত্মা ভগবান হরি বুঝল এ ভামিনী-কামিনী নয়, এ রাক্ষসী, বালঘাতিনী। চোখ বুজে রইল। নির্বোধ যেমন রজ্জুবোধে নিদ্রিত কালসর্পকে তুলে নেয়, তেমনি পুতনা নিজকালস্বরূপ কৃষ্ণকে অসহায় শিশুজ্ঞানে কোলে তুলে নিল। কোষনিহিত অসির মত পুতনার অন্তর তীক্ষ্ণ বটে কিন্তু তার বাহ্যভঙ্গি ঠিক মায়ের মত। যশোদা আর রোহিণী তাই বারণ করতে পারল না। শিশুকে কোলে নিয়ে পুতনা তার দুর্জয়বিষপূরিত স্তন তার মুখে দিল। শিশু দুই হাতে সেই স্তন ধরে সবলে পীড়ন করতে লাগল, ক্রুদ্ধ রসনায় স্তনদুগ্ধের সঙ্গে পান করতে লাগল রাক্ষসীর প্রাণশক্তি। মুঞ্চ, মুঞ্চ, অলং—ছাড়ো, ছাড়ো, আর নয়, আর্তনাদ করতে লাগল পুতনা। মর্মভেদী যন্ত্রণায় নয়ন বিবৃত করে হস্তপদ বিক্ষেপ করতে করতে নিজরূপ ধারণ করলে। আকাশপথে উড়ে যেতে চাইল কিন্তু সাধ্য কি অযুতমত্তহস্তী সেই শিশুর ভার সে সহ্য করে। কেশ, চরণ ও বাহু বিস্তৃত করে কংসের গোষ্ঠে গিয়ে পড়ল, ছয় ক্রোশব্যাপী সমস্ত গাছ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। কৃষ্ণ কোথায়? ছয় দিনের শিশু, কৃষ্ণ নির্ভয়ে সেই রাক্ষসীর বুকের উপর খেলা করছে।

ক্রীড়ারত শিশুকে উদ্ধার করে আনল গোপীরা। প্রচলিত বিধি অনুসারে শিশুর রক্ষাবিধান করল। চক্রধারী মুরারি তোমার সামনে, গদাধারী হরি তোমার পশ্চাতে, ধনুর্ধারী মধুসূদন আর অসিধারী অজ তোমার দুই ভুজপার্শ্বে অবস্থিত হোক। হৃষীকেশ তোমার ইন্দ্রিয়, নারায়ণ প্রাণ, শ্বেতদ্বীপপতি চিত্ত, যোগেশ্বর মন, পৃশ্নিনন্দন বুদ্ধি আর পরম ভগবান তোমার আত্মা রক্ষা করুন। তুমি যখন খেলবে তখন গোবিন্দ, যখন শুয়ে থাকবে তখন মাধব, যখন চলবে তখন বিষ্ণু, যখন

বসবে তখন শ্রীপতি আর যখন খাবে তখন সমুদায় গ্রহের ভয়োৎ-পাদক যজ্ঞভুক তোমাকে রক্ষা করুন। যক্ষ-রক্ষ-পিশাচ-বিনায়ক, কোটরা-রেবতী-জ্যেষ্ঠা-ডাকিনী সকলে নষ্ট হোক, নষ্ট হোক সকল ব্যাধি আর উৎপাত, উন্মাদ আর অপস্মার।

যশোদা কৃষ্ণকে কোলে করে স্তন্যপান করাতে লাগল।

গোপগণ কুঠার দিয়ে পুতনার বিশাল কলেবর খণ্ড খণ্ড করে কাষ্ঠে বেষ্টন করে দাহ করল। চিতাধূম থেকে উঠল অগুরুসৌরভ। কৃষ্ণকে স্তন্যদান করেছিল বলে ও তার লোকবন্দিত পদস্পর্শ লাভ করেছিল বলে পুতনার সমস্ত পাপ দূরীভূত হল আর সে লাভ করল জননীর গতি, বৈকুণ্ঠগতি।

আর অঘাসুর ?

গোপাল-বয়স্যদের সঙ্গে খেলা করছে কৃষ্ণ। যে ভগবান হরি বিদ্বজ্জনের পক্ষে স্বপ্রকাশ পরম সুখ, ভক্তজনের পক্ষে নিগূঢ় আত্ম-প্রসাদ আর মায়ামূঢ়ের পক্ষে সামান্য নরবালক, সে পুঞ্জপুঞ্জ পুণ্যসঞ্চয়ী গোপবালকদের সঙ্গে বিহার করছে। প্রতিবিম্বকে উপহাস করছে আর আক্রোশ করছে প্রতিধ্বনিকে। কেউ গুঞ্জন করছে ভৃঙ্গের সঙ্গে, কূজন করছে কোকিলের সঙ্গে, কেউ বা উড়ন্ত পাখির ছায়ার সঙ্গে ছুটছে। কেউ নাচছে ময়ূরের সঙ্গে, কেউ বা গাছে উঠে বানরের সঙ্গে শাখা থেকে শাখান্তরে লাফ দিচ্ছে।

তাদের সুখক্রীড়ায় অসহিষ্ণু হয়ে সেখানে অঘাসুর এসে উপস্থিত হল। পুতনা আর বকের ছোট ভাই এই অঘ, কংস তাকে পাঠিয়েছে কৃষ্ণনিধনে। দাঁড়াও, এই শিশু আমার ভ্রাতা-ভগ্নীকে বধ করেছে। সন্দেহ কি এ শিশুই তাদের তিলোদক, একে বিনষ্ট করব সদলে। দুর্মতি অঘ অজগর দেহ ধারণ করল, আর গুহার মত মুখব্যাদান করে শুয়ে পড়ল পথের উপর। তার নিম্ন ওষ্ঠ পৃথিবী ও উত্তর ওষ্ঠ মেঘ ছুঁয়ে রইল। দুই সৃক্কনী দুই দরীর মত বিস্তীর্ণ, একেকটি দাঁত একেকটি গিরিশৃঙ্গ, মুখবিবর ঘোর অন্ধকার, জিহ্বা যেন অন্তহীন

সরণি, নিশ্বাস সাক্ষাৎ ঝঞ্ঝা, চক্ষু দাবাগ্নির মত খরস্পর্শ। হাসতে হাসতে করতালি দিয়ে গোপবালকেরা অঘাসুরের মুখের মধ্যে প্রবেশ করল। অসুর তক্ষুনি ওদের গলাধঃকরণ করল না, কৃষ্ণের প্রবেশ প্রতীক্ষা করতে লাগল। নিখিললোকের অভয়দাতা অশেষদর্শী কৃষ্ণ তার প্রার্থনা পূর্ণ করল, ঢুকল তার মুখগহ্বরে। মৃত্যুর জঠরাগ্নির মধ্যে বয়স্যদের সে তৃণীভূত হতে দেবে না আর খল অসুরকেও নষ্ট করবে। সর্পের গলদেশে কৃষ্ণ নিজেকে অতিবেগে বর্ধিত বিস্ফারিত করল। অসুরের কণ্ঠ নিরুদ্ধ হল, ব্রহ্মরন্ধ্র বিদীর্ণ করে প্রাণ বেরিয়ে গেল মুহূর্তে। বয়স্যেরা প্রাণ পেয়ে বেরিয়ে এল। মহৎ জ্যোতিতে উজ্জ্বল হল দশ দিক।

অসাধু ব্যক্তি কিছুতেই ভগবানের সমানরূপতা লাভ করতে পারে না, কিন্তু অঘাসুর শুধু তাঁর অঙ্গস্পর্শহেতু পাপ থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর সমানরূপতা প্রাপ্ত হল। যার শুধু প্রতিকৃতি অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করে ভক্ত ভাগবতী গতি পায়, সেই ভগবান স্বয়ং যদি অসুরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, তবে সে অসুর মুক্ত হবে না কেন?

নিমাই শুধু কৃষ্ণকথাই বলে চলেছে, আর পড়ুয়ারা শুনে চলেছে একমনে।

হঠাৎ বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল নিমাইয়ের, লজ্জায় অধোমুখ হয়ে রইল। এ সে কী বলছিল? তার না পড়ানোর কথা? এ সে কী পড়াল?

'এ আমি তোমাদের কাছে কোন সূত্র ব্যাখ্যা করলাম?' নিজেই জিগগেস করল অপ্রস্তুতের মত।

'কিছুই বুঝলাম না।' বললে পড়ুয়ারা। 'শুধু বললেন যা কিছু শব্দ সবই কৃষ্ণনাম।'

'তা হলে এখন পুঁথি বাঁধো। চলো গঙ্গাস্নানে যাই।' নিমাই উঠে পড়ল: 'আজ মঙ্গলাচরণ হল, কাল পাঠারম্ভ হবে।'

বাড়ি ফিরে এলে মা জিগগেস করল, 'আজ টোলে কী পড়ালে?'

নিমাই বললে, 'শুধু এক কথা। এক বিদ্যা। তার নাম কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণবিদ্যা।'

'মায়ে বোলে, আজি বাপ! কি পুঁথি পঢ়িলা?
কাহার সহিত কিবা কন্দল করিলা?
প্রভু বোলে, আজি পঢ়িলাঙ কৃষ্ণনাম।
সত্য কৃষ্ণ চরণ-কমল-গুণধাম॥'

মায়ের সঙ্গেও কৃষ্ণকথা বলতে লাগল নিমাই। কপিল যেমন বলেছিল তার মা দেবহূতিকে।

বিন্দু সরোবরের তীরে দেবহূতি পুত্ররূপে অবতীর্ণ ভগবান কপিলের কাছে গিয়ে বললে, হে ভূমন, আমি ইন্দ্রিয়াভিলাষে মোহান্ধ। আমার সম্মোহ দূর করে দাও। তুমি অজ্ঞানের চক্ষু, আমাকে পথ দেখাও।

কপিল বললে, হে অপার্পে, চিত্তই জীবের বন্ধন ও মুক্তির একমাত্র কারণ। চিত্ত বিষয়ে আসক্ত হলে বন্ধের আর পরমাত্মাতে আসক্ত হলে মুক্তির কারণ হয়। মা, যোগীদের ব্রহ্মজ্ঞানসিদ্ধির একমাত্র পথ ভক্তি। ভক্তি ছাড়া মঙ্গলময় পথ আর দ্বিতীয় নেই। কিন্তু এই ভক্তি লাভ করতে হলে সাধুসঙ্গ একান্ত দরকার। যে আসক্তি আত্মার অক্ষয়পাশস্বরূপ তা সাধুপুরুষে বিহিত হলে নিরাবরণ মোক্ষের দ্বারস্বরূপ হয়ে যায়।

কিন্তু সাধু কে? জিগগেস করল দেবহূতি।

যে তিতিক্ষু, দয়ালু, সর্বদেহীর সুহৃদ, শান্ত ও অজাতশত্রু, সেই সাধু। সে সর্বদা সদাচারভূষিত সর্বসঙ্গবিবর্জিত। সে অপ্রগল্‌ভ হয়ে আমার পবিত্র কথা শ্রবণ ও কীর্তন করে। 'দেবাঃ স্বার্থা ন সাধবঃ।' দেবতারা স্বার্থান্বেষী কিন্তু সাধুর ঈশ্বর ছাড়া অন্বিষ্ট নেই। তাই ভগবৎকৃপাও 'সাধুবাহনা'—সাধুর কৃপাকে বাহন করেই মানুষের কাছে এসে থাকে। সাধুসমাগমে আবার বীর্যপ্রকাশক হৃৎকর্ণরসায়ন কথা ওঠে আর সে কথাতেই শ্রীহরিতে শ্রদ্ধা জন্মে। শ্রদ্ধা হতে রুচি আসে

আর রুচি থেকে ভক্তি। আর ভক্তি জাগলেই ইন্দ্রিয়-সুখ-সাধে বিরতি ঘটে।

দেবহূতি বললে, আমি অল্পবুদ্ধি নারী, আমাকে সরলভাবে বুঝিয়ে দাও।

মা, ভগবান হরির প্রতি যে স্বাভাবিক আকর্ষণ, তাই অনিমিত্তা ভক্তি আর তা মুক্তির চেয়েও গরীয়সী। যদি ভক্তি জাগে তা হলে ভগবানের সঙ্গে একাত্মতাও কাম্য নয়। ভক্ত কী করে? আমার প্রসন্ন বরদরূপ দর্শন করে, আমার সঙ্গে ইচ্ছামত কথা বলে। মা, ভক্তিই জীবের নিঃশ্রেয়সের উপায়। আমার প্রতি ভক্তির মনোগতি সাগরাভিমুখিনী গঙ্গাধারার মত অচ্ছিন্নপ্রবাহ। সে সালোক্য সাযুজ্য সারূপ্য সামীপ্য কিছু চায় না, পেলেও নেয় না কোনোদিন। সে চায় শুধু আমাকে সেবা করতে, অখণ্ড অনন্তকাল ধরে সেবা করতে। যেহেতু আমি সকল প্রাণীর আত্মস্বরূপ, ভক্ত বহুসম্মানসহ সকল প্রাণীকেই প্রণাম করে মনে মনে। 'মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেৎ বহু মানয়ন্।' সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শনই অহেতুকী অব্যবহিতা ভক্তির চরম পরিণাম।

জননী দেবহূতির মোহাবরণ দূরীভূত হল। ভগবানের স্তব করে বললে, তোমার নাম যার জিহ্বাগ্রে থাকে, সে চণ্ডাল হলেও শ্রেষ্ঠ; যারা তোমার নাম উচ্চারণ করে, তারাই যথার্থ তপস্যা হোম আর তীর্থস্নান করেছে, তারাই যথার্থ সদাচারী ও সার্থক বেদাধ্যায়া।

পরদিন সকালে আবার টোলে চলল নিমাই। মনে মনে স্থির করল আজ ঠিক-ঠিক পড়াব, মন বিচ্যুত হতে দেব না, বিভ্রান্ত হতে দেব না। পণ্ডিত, থাকব পণ্ডিতের মত।

কিন্তু পড়াতে বসেই আবার লুপ্ত হল বাহ্যজ্ঞান। বৈষ্ণব আবেশে কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলতে লাগল। 'যে প্রভু আছিল ভোলা মহা বিদ্যারসে। এবে কৃষ্ণ বিনু আর কিছু নাহি বাসে॥'

'তারপর?' প্রশ্ন করল পড়ুয়া।

'কৃষ্ণ-কৃষ্ণ। তার পরেও কৃষ্ণ-কৃষ্ণ।' নিমাইয়ের তুচোখে ধারা নামল। 'পঢ়াইতে বৈসে গিয়া ত্রিজগৎরায়। কৃষ্ণ বিহু কিছু আর না আইসে জিহ্বায়॥'

'বর্ণ সিদ্ধ কোন সংজ্ঞায়?' জিগগেস করল আরেক ছাত্র।

'সর্ব বর্ণে একমাত্র নারায়ণই সিদ্ধ।' নিমাই বললে।

'কিন্তু বর্ণ সিদ্ধ হল কী করে?'

'শুধু কৃষ্ণদৃষ্টিপাতের কৃপায়।'

একজন ছাত্র বিরক্ত হয়ে উঠল। বললে, 'সমুচিত ব্যাখ্যা করুন।'

'সর্বক্ষণ কৃষ্ণস্মরণই একমাত্র ব্যাখ্যা।'

ছাত্র বললে, 'এ সব বায়ুব্যাধি ছাড়া কিছু নয়।'

'এ কৃষ্ণব্যাধি।' হাসল নিমাই: 'এখন তবে এ পর্যন্ত থাক। বিকেলে আবার একত্র হব। ইতিমধ্যে বিরলে বসে পুঁথি পড়ে তৈরি হই গে।'

ছাত্রের মধ্যে কেউ কেউ গঙ্গাদাসের বাড়ি গেল নালিশ করতে, নিজেদের তুর্দশার কথা বলতে। এখন কী করা যায়! গয়া থেকে এসে অবধি পড়ানোতে আর মন নেই অধ্যাপকের, সর্বক্ষণ কেবল কৃষ্ণ-কৃষ্ণ করেন। কৃষ্ণ ছাড়া শব্দও নেই, ব্যাখ্যাও নেই। যা কিছু সূত্র তার সিদ্ধান্ত কৃষ্ণ। যা কিছু সিদ্ধান্ত তার সূত্র কৃষ্ণ। এরকম ভাবে চললে আমাদের পড়া হবে কী করে! আপনি যদি ওঁকে একটু বলে দেন।

'আমরা বাড়ি ঘর ছেড়ে কত দূর দেশে বিত্তার্জন করতে এসেছি, কৃষ্ণকথা শুনতে আসিনি।' ছাত্রেরা কেউ কেউ বিদ্রোহী হয়ে উঠল: 'আমাদের অধ্যাপকের এ কী হল? একে আপনি সংযত করুন। আদেশ করুন যেন ঠিকমত পড়ায় আমাদের।'

গঙ্গাদাস বিদ্রূপ করে উঠল: 'পণ্ডিত হয়ে শাস্ত্র ছেড়ে কৃষ্ণ ধরেছে? যাও, তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো। আমি নিমাইকে বলে দেব, ভালো করে পড়ায় যেন ঠিক ঠিক।'

বিকেলে ছাত্ররা খবর দিল, গঙ্গাদাস ডেকেছে পণ্ডিতকে। তখুনি নিমাই ছাত্রদের নিয়ে গুরুগৃহে এসে উপস্থিত হল।

'বিদ্যালাভ হোক।' আশীর্বাদ করল গঙ্গাদাস।

বিনম্র ভঙ্গিতে বসল নিমাই।

গঙ্গাদাস বললে, 'কত বড় ভাগ্য তুমি অধ্যাপক হয়েছ। তুমি জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র, নীলাম্বর চক্রবর্তীর দৌহিত্র। তোমার বাপ আর মাতামহ দুইই প্রকাণ্ড পণ্ডিত। তুমি তাদের নাম ডোবাবে? সমস্ত গৌড়ে তোমার যশ পরিব্যাপ্ত, তোমার ব্যাকরণের টিপ্পনীর কত আদর আজ সমাজে, তুমি ডোবাবে তোমার নিজের নাম?'

আমি কী করেছি! শিশুর মত সারল্যে নীরবে তাকিয়ে রইল নিমাই।

'তুমি নাকি হরিভজা হয়ে যাচ্ছ? সর্বকথারই নাকি তোমার কৃষ্ণ উত্তর।' গঙ্গাদাস প্রায় তিরস্কার করে উঠল: 'এ সব পাগলামি ছাড়ো। সমীচীন পাঠ দাও, ব্যতিরিক্ত অর্থ করো কোন সাহসে? তুমি না পণ্ডিত, অতএব তাৎপর্যে তুমি পর্যাপ্ত থাকবে। সীমা লঙ্ঘন করার তোমার অধিকার কোথায়? তোমার ছাত্ররা তোমাকে ছাড়া আর কারুর কাছে পড়বে না, অথচ তুমি রীতিমত পড়াচ্ছ না ওদের। তুমি আমার মাথা খাও, ওদের ক্ষোভ নিরসন করো।'

নিমাই লজ্জিত হয়ে করজোড়ে মার্জনা চাইল। বললে, 'আপনার ভয় নেই, আপনার চরণপ্রসাদে আমি যথার্থ পাঠ দেব। আমার সূত্র-ব্যাখ্যা খণ্ডন করতে পারে এমন কাউকে দেখিনা নবদ্বীপে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমার পাঠে বিন্দুমাত্র ভুল হবে না। কারু সাধ্য নেই দোষ ধরে।'

গঙ্গাদাস খুশি হয়ে আশীর্বাদ করল। গুরুকে প্রণাম করে সশিষ্য নিষ্ক্রান্ত হল নিমাই। এগিয়ে গিয়ে দেখল রত্নগর্ভ আচার্যের দুয়ারে শাস্ত্রালাপের সভা বসেছে। যোগপট্ট ছাঁদে কাপড় বেঁধে একপাশে বসল নিমাই, শিষ্যরাও বসল। চার দণ্ড রাত হয়েছে, তবু বাড়ির কথা কারু মনে এল না।

কৃষ্ণ দর্শনের বর্ণনা করছে আচার্য :

'শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্হ
ধাতু প্রবালনটবেশমনুব্রতাংসে।
বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমব্জং
কর্ণোৎপলালকপোলমুখাব্জহাসম ॥'

তার বর্ণ শ্যাম, পরিধানে পীতবাস, অঙ্গে বনমালা ও ময়ূরপুচ্ছ, ধাতু ও প্রবালে তার বেশ রচিত বলে নটের মত শোভমান। অনুচরের কাঁধে এক হাত রেখে আরেক হাতে একটি লীলাকমল ঘোরাচ্ছে। তার কর্ণযুগলে উৎপল, কপোলযুগলে কুন্তল আর মুখপঙ্কজে সুমধুর হাসি বিলসিত।

কৃষ্ণরূপবর্ণনার এই শ্লোক শুনেই নিমাই মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

ছাত্রেরা বিস্ময়বিগাঢ় চোখে তাকিয়ে রইল। এমন ভাব তো কোনোদিন দেখেনি। শুধু কথাই শুনেছে, এ কী তার উচ্চারণ!

ছাত্রেরা নিমাইয়ের সেবা করতে লাগল। বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেয়েও নিমাই শান্ত হল না, কাঁদতে লাগল আকুল হয়ে। মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগল। ধুলো কাদা করে ফেলল চোখের জলে।

সভায় যারা ছিল তারা সবাই হতবাক। রাস্তায় চলতি পথিক দাঁড়িয়ে পড়ে, কেউ কেউ বা প্রণাম করে সেই ভাববিগ্রহকে।

'শ্লোক বলো। আবার বলো।' লুটিয়ে লুটিয়ে বলতে লাগল নিমাই।

রত্নগর্ভ আবার সেই শ্লোক পড়ল। 'শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্য-বর্হ।' উঠে বসবার চেষ্টা করছিল নিমাই কিন্তু পড়ে গেল মাটিতে।

'শ্লোক বলো।'

এ কী শ্রবণক্ষুধা!

রত্নগর্ভ আবার পড়ল।

'বলো, বলো—' শ্লোক কথাটা আর বলতে পারছে না, বিহ্বল কণ্ঠে নিমাই শুধু বলো-বলো করতে লাগল।

রত্নগর্ভ তৃতীয়বার পড়ল।

নিমাই টলতে-টলতে উঠে আলিঙ্গন করল রত্নগর্ভকে।

মুহূর্তে এ কী হল রত্নগর্ভের? নিমাইয়ের পা ধরে কাঁদতে লাগল অঝোরে। কাঁদে আর শ্লোক আওড়ায়। আর নিমাই ততই হুঙ্কার ছাড়ে: বলো, বলো। আর যত শোনে ততই ধুলোয় লুণ্ঠিত হয়।

যেখানে নিমাই সেখানে গদাধর। গদাধর আর সইতে পারছে না নিমাইয়ের আর্তি, বাণবিদ্ধ বিহঙ্গের কাতরতা। রত্নগর্ভকে বললে, 'তুমি থামো। তুমি না থামলে নিমাইকে পারব না সুস্থ করতে।'

রত্নগর্ভ থামল।

'বলো, বলো—' অনুনয় করল নিমাই।

রত্নগর্ভ আর পড়ল না।

আস্তে আস্তে বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেল নিমাই। আস্তে আস্তে উঠে বসল। সোনার অঙ্গ ধূলিধূসর, প্রথম লক্ষ্য করল নিজেকে, তারপর বিস্ময়নিশ্চল জনতাকে। লজ্জিত মুখে বললে, 'এ আমি কী চাঞ্চল্য করলাম!'

'চলো গঙ্গাস্নানে যাই।' গদাধর নিমাইয়ের হাত ধরল।

'চলো।' উঠে পড়ল নিমাই।

পরদিন আবার টোলে এসে বসেছে। ছাত্রদের বলছে, 'একটি গোপন কথা তোমাদের বলি। এ কথা অন্যত্র অকথ্য। তোমরা আমার অন্তরঙ্গ আত্মীয়, তাই এ কথা শোনবার যোগ্য শুধু তোমরাই। শোনো। তোমাদের কী পড়াব, সব সময় দেখি এক কৃষ্ণবর্ণ শিশু আমার সামনে দাঁড়িয়ে বাঁশি বাজাচ্ছে। তাকে দেখব, না শুনব, আমি উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ি। রূপমাধুর্য না বেণুমাধুর্য—আমি কোন লীলা-কল্লোল-বারিধিতে স্নান করি বলো!'

'কৃষ্ণবর্ণ শিশু?' সকলে পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল উৎসুক হয়ে।

'শ্রাবং শ্রাবং সুনামশ্রুতি-
সমিত-পরব্রহ্মবংশী-প্রসূতং।
দর্শং দর্শং ত্রিলোক-বর
তরুণ কলা-কেলি-লাবণ্য সারম্॥'

'সবে দেখোঁ তাই, সেই বোলোঁ সর্বথায়।
কৃষ্ণবর্ণ শিশু এক মুরলী বাজায়॥
যত শুনি শ্রবণে—সকল কৃষ্ণনাম।
সকল ভুবন দেখোঁ—গোবিন্দের ধাম॥
কৃষ্ণ বিনু আর বাক্য না স্ফুরে আমার।
সত্য আমি কহিলাম চিত্ত আপনার॥'

'তাই আমার কাছে তোমাদের পড়া বিড়ম্বনা মাত্র।' বললে নিমাই, 'তোমরা অন্য গুরু দেখ। আমি অনুমতি দিচ্ছি, যার কাছে তোমাদের ইচ্ছে তার কাছে গিয়ে পড়ো, আমাকে নিষ্কৃতি দাও।' অশ্রু-উদ্বেল চোখে নিমাই নিজের পুঁথিতেই ডোর দিল।

'আমরা আর কার কাছে পড়ব? তোমাকে ছেড়ে আর কার কাছে যাব—আমাদের আর কে আছে?' সমস্বরে কাঁদতে লাগল পড়ুয়ারা। 'কী হবে আর আমাদের পড়ে? তোমার কাছে যা পড়লাম যা পেলাম তাই আমাদের বিস্তর।' কান্নার রোল উঠল চারদিকে।

নিমাই প্রত্যেককে ডেকে আলিঙ্গন করতে লাগল। বললে, 'আমি আশীর্বাদ করি, যদি আমি একদিনও কৃষ্ণভজন করে থাকি তবে তোমাদের জীবনের অভিলাষ সিদ্ধ হোক। কৃষ্ণ-কৃপায় বিদ্যার স্ফূর্তি হোক তোমাদের হৃদয়ে। আর বিদ্যা কী? কৃষ্ণ-ভক্তি কৃষ্ণ-বিলাসই তো বিদ্যা। তোমরা নিরবধি কৃষ্ণ-নাম শোনো, তোমাদের বদন কৃষ্ণ-নামে মুখর হোক। এস, সবাই মিলে কৃষ্ণকীর্তন করি।'

শিষ্যরা কাঁদতে লাগল, বললে, 'কৃষ্ণকীর্তন কেমন আমাদের শিখিয়ে দিন।'

নিমাই হাতে তালি দিয়ে গাইতে লাগল: 'হরি হরয়ে নমঃ, কৃষ্ণ

যাদবায় নমঃ। যাদবায় কেশবায় গোবিন্দায় নমঃ। আরো বলো, গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।'

ছাত্ররাও তালি দিতে লাগল, গাইতে লাগল মুক্তকণ্ঠে।

কৃষ্ণ-প্রেম-সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ উঠল চারদিকে। কৌতুক দেখতে লোকে ভিড় করে এল কিন্তু সবাই বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়াল। কৌতুক কোথায়, এ যে ভক্তি আর ভাবের গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম। কেউ নাচছে, কেউ ধুলোয় গড়াগড়ি দিচ্ছে, নিজনামরসে আবিষ্ট হয়ে কীর্তননাথ বারে বারে আছাড় খেয়ে পড়ছে।

নয়ন সফল করছে সকলে। বলছে, 'জগতে এমন ভক্তি আছে তা কে জানত।' 'হেন উদ্ধতের যদি হেন ভক্তি হয়, না বুঝি কৃষ্ণের ইচ্ছা ওবা কিবা নয়।'

এই মহাপ্রভুর প্রকাশের সূচনা। নবদ্বীপে এই প্রথম নামকীর্তনের উদয়।

২২

সকলে তখন অদ্বৈতের কাছে গেল। তার নবদ্বীপের বাসায়।

'নিমাই কী হয়েছে দেখবেন চলুন।'

'কী হয়েছে?' যেন কিছুই জানে না, বিস্ময়াবিষ্ট চোখে তাকাল অদ্বৈত।

'সে নিমাই আর নেই।'

'কোন নিমাই?'

'পাণ্ডিত্যে জগৎজয় করে ধরাকে যে সরাজ্ঞান করত। সেই উদ্ধতের শিরোমণি। সেই গর্বে পর্বতায়মান।'

'এখন কী হয়েছে?'

'কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হয়েছে। ধরেছে দীন-হীন কাঙালের সাজ। অঙ্গে ধুলো, চোখে অবিরাম অশ্রু।'

'হয়েছে ? এসেছে ?' হুঙ্কার দিয়ে উঠল অদ্বৈত : 'আমার সঙ্কল্প সফল করেছে ?'

কত ডেকেছে অদ্বৈত, কত হুঙ্কার দিয়েছে, কত তুলসী-গঙ্গাজলে ভজন করেছে একমনে। জীবকুল মলিন হয়ে রয়েছে, কত জন এসে নালিশ করেছে সকাতর। অদ্বৈত আশ্বাস দিয়েছে সকলকে, আর বেশি দেরি নেই, আসবেন শ্রীহরি, পতিতকে উদ্ধার করবেন, মলিনকে প্রদীপ্ত করবেন। শুষ্ককে দ্রবীভূত করবেন। সকলের নয়নগোচর হবেন।

'জানো না কাল কী হয়েছিল ?' বলতে লাগল অদ্বৈত, 'কাল সন্ধ্যায় গীতা পড়ছিলাম। একটা শ্লোকের অর্থ নানাবিচারেও প্রাঞ্জল হচ্ছিল না। তাই উপোস করে ছিলাম রাত্রে। ঘুমিয়ে ছিলাম, স্বপ্ন দেখলাম অপরূপ। কে যেন আমাকে ডাকছে। বলছে, আচার্য, ওঠ, কেন উপোস করে আছ ? উঠে ভোজন করো। ভোজন করব কী, শ্লোকের যে এখনো ব্যাখ্যা পাইনি। আগন্তুক বললে, তার জন্যে কী হয়েছে, আমি বলে দিচ্ছি অর্থ। উচ্চ কণ্ঠে শ্লোক পড়ে অর্থ করে দিল আগন্তুক। তুমি কে ? যার জন্যে এত দিন অপেক্ষা করেছ, সাধন ভজন ক্রন্দন করেছ, আমি সেই। একবার দেখতে পাই না তোমাকে ? একবার কাছে এসে দাঁড়াও।'

'দাঁড়াল ?'

'দাঁড়াল। দেখলাম আমাদের সেই বিশ্বম্ভর।' অদ্বৈত আকুল উজ্জ্বল চোখে তাকাল সকলের মুখের দিকে।

'ঠিক চিনতে পারলেন ?'

'বা, পারব না চিনতে ?' বললে অদ্বৈত, 'ওর দাদা বিশ্বরূপ গীতা পড়তে আসত আমার কাছে। পড়তে পড়তে বেলা বেড়ে যেত, বাড়ি ফেরার কথা মনে থাকত না। কত দিন ছোট্ট শিশু বিশ্বম্ভর ডাকতে

আসত দাদাকে। বলত, দাদা, তোমার খিদে পায় না? মা রান্না শেষ করে বসে আছে। কী সুন্দর দেখতে সেই শিশুকে, কী মধুর তার কথা! দাদার হাত ধরে টেনে নিয়ে যেত মার কাছে। মন আপনা থেকেই শিশুর দিকে ছুটে যেত। নিজের মনে বিচার করতাম, আমি কৃষ্ণের দাস, সর্বক্ষণ আমার চিত্ত কেন ঐ শিশুতে আকৃষ্ট হবে, কেন ঐ শিশু আমার চিন্তা জুড়ে বিরাজ করবে? কে ঐ শিশু? ওই কি তবে আমার সেই আরাধনের ধন?'

'কিছু বলল সেই স্বপ্নমূর্তি?'

'বললে, নগরে-নগরে ঘরে-ঘরে এখন কৃষ্ণকীর্তন হবে। ভয় নেই, ত্রাণ পাবে জীবকুল।'

'আর কী দেখলেন?'

'ঐ কথা বলেই অন্তর্হিত হল।' অদ্বৈত আনন্দের লহর তুলে বললে, 'এখন যখন তোমরা বলছ সেই বিশ্বম্ভর ভক্তিতে ভরপুর হয়ে উঠেছে, তখন কী না-জানি অঘটন ঘটে! অতুলন ঘটে। কী না-জানি মঙ্গলের বন্যা নামে সংসারে।'

'একবার যাবেন তাকে দেখতে?' কে একজন কানের কাছে মুখ এনে জিগগেস করল।

'না, সে যদি আমার জিনিস হয়, সত্যবস্তু হয়, নিজেই সে উদ্যোগী হয়ে আসবে আমার কাছে।' অদ্বৈত হাসতে লাগল: 'আমার সঙ্গে তার তো সেই রকমই কথা হয়ে আছে।'

ঠিক একদিন গৃহদ্বারে গদাধরকে সঙ্গে নিয়ে নিমাই এসে হাজির। এসে দেখল অদ্বৈত জলসিঞ্চনে তুলসীর সেবা করছে।

'আমি এসেছি।'

'এসেছ?' মহামত্ত সিংহের মত হুঙ্কার দিয়ে উঠল অদ্বৈত। বাহু আস্ফালন করে হরি-হরি বলে নৃত্য করতে লাগল। পূজার্চন ভুলে গেল। তোমার যখন দর্শন পেয়েছি তখন আর আমার কিসের পূজা?

প্রহ্লাদ বলছে নৃসিংহকে, তোমার সাক্ষাৎকারের ফলে আমি আনন্দ-সমুদ্রে ডুবেছি, আমার ব্রহ্মানুভূতির গোষ্পদ দিয়ে কী হবে? সাক্ষাৎকরণানন্দের তুলনায় ব্রহ্মানন্দ তুচ্ছ, অল্প, যৎসামান্য। অনুভবের চেয়ে দর্শন বেশি সুখের। ব্রহ্মানন্দ সামান্য নয় কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমানন্দ অধিকতর। 'কৃষ্ণনামে যে আনন্দ-সিন্ধু-আস্বাদন। ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক-সম।' ব্রহ্মানন্দ ছোট গর্ত, কৃষ্ণনামানন্দ অম্বুনিধি।

অদ্বৈতকে দেখে, তার ভাবভক্তির বন্যা দেখে, নিমাই মাটিতে মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

'এই যে, এই আমার প্রাণনাথ।' অদ্বৈত নির্নিমেষে দেখতে লাগল নিমাইকে: 'কিন্তু ও কী? তুমি না কালো, তবে তোমার গৌরবরণ কেন? আর তুমি যে এখন আসবে, এ তো শাস্ত্রে বলে নি। তবে, তুমি তো শাস্ত্রের হয়েও শাস্ত্রের অতীত। তুমি যে যুগের হয়েও শাশ্বতের।'

সন্দেহ কী, এই অদ্বৈতের সাধনধন।

অদ্বৈত দ্রুতপায়ে ঘরে ঢুকে পাদ্য-অর্ঘ্য নিয়ে এল, গঙ্গাজল আর তুলসী-চন্দন। গঙ্গাজলে পা ধুইয়ে দিল নিমাইয়ের। তুলসীতে চন্দন মেখে নিমাইয়ের পায়ের উপর রাখতে লাগল। আর সনমস্কার বলতে লাগল;

'নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥'

যিনি বেদজ্ঞদের পূজনীয়, যিনি গো ও ব্রাহ্মণের হিতকারী, যিনি সর্বজগতের হিতকারী, যিনি গোপালক, সেই কৃষ্ণকে বারংবার নমস্কার।

গদাধর কাছেই ছিল, কাণ্ড দেখে বিমূঢ় হয়ে গেল। প্রায় সত্তর বছর বয়স অদ্বৈতের, সে কিনা নবীন এক যুবকের পা পুজো করছে। ছি ছি, লজ্জায় জিভ কাটল গদাধর। চেঁচিয়ে উঠল, 'গোঁসাই, এ আপনি কী করছেন?'

কী করছি তো দেখতেই পাচ্ছ। গোঁসাই কথাটা কানেও নিল না।

'নিমাই সামান্য বালক, আপনার কত ছোট, ওর পা পুজো করে ওকে অপরাধী করছেন কেন?' গদাধর আবার প্রতিবাদ করল: 'কেন ওর অকল্যাণ করছেন?'

'যিনি সর্বজীবের কল্যাণ করতে এসেছেন, তাঁর অকল্যাণ করে, এমন সাধ্য কোন মানুষের? আর বালক বলছ কাকে? কদিন পরেই জানতে পারবে এ বালক না আর কেউ! আর বালক হলেই বা কোথাকার বালক!'

গদাধর থমকে দাঁড়াল। এ বলে কী গোঁসাই? তবে নিমাই কি সত্যিই অবতীর্ণ ভগবান?

ভয় করতে লাগল গদাধরের। নিমাই শুধু পণ্ডিত ছিল, মানুষ ছিল, গদাধরের একলার ছিল। কিন্তু যদি সে এখন ভগবান বলে স্বীকৃত হয়, তা হলে সে তো সকলের হয়ে যাবে, আর পুছবেও না গদাধরকে। কী জানি কী অপরাধ সে করেছে এতদিন না জেনে, নিমাইকে সামান্য-চোখে দেখে, তাকে শুধু সখা ভেবে। এক পা দু পা করে এখন ভয়ে-ভয়ে সরতে লাগল গদাধর।

নিমাইয়ের বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল। চোখ চেয়ে দেখল অদ্বৈত তাকে পুজো করছে। উলটে দু'হাতে তার পায়ের ধুলো নিল নিমাই। করুণবচনে বললে, 'গোঁসাই, তুমি আমাকে কৃপা করো। আমি ভবসাগরে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছি, উদ্ধার করো আমাকে। আমার এই দেহ তোমাকে অর্পণ করলাম, তুমি আমার মাথায় তোমার পা দুখানি একটু রাখো। আমাকে পবিত্র করো। তুমি কৃপা করলেই তবে মুখে কৃষ্ণনামের স্ফুরণ হবে। তুমি কৃপা করলেই তবে নষ্ট হবে ভববন্ধ। তুমিই তো সমস্ত কিছুর প্রেরণা। সমস্ত কিছুর মুল। তুমি আমাকে আশীর্বাদ করো।'

কী রকম খটকা লাগল অদ্বৈতের। নিমাই যদি ভগবানই হবে তবে আমাকে, ক্ষুদ্র মানুষকে, প্রণাম করছে কেন? কেন তবে আমার কাছে প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকছে? কেন প্রকট হচ্ছে না?

তারপরে এত দৈন্য কেন নিমাইয়ের? কেন এত নির্বেদ ও বিষাদ, কেন এত উদ্বেগার্তি? যে ভগবান, সে কেন নিজেকে হীন বা নিকৃষ্ট মনে করবে? তার কেন এত শোক হবে? এত চিন্তা, এত অশ্রু, এত বৈবর্ণ্য? কেন সে নিজেকে আর্তির প্রহারে অবমাননা করবে? তবে কি নিমাই ভগবান নয়?

মনের সন্দেহ মনে চেপে রেখে অদ্বৈত বললে, 'আমি আর কী আশীর্বাদ করব? তুমি নিত্য কৃষ্ণকথাকৌতুকে থাকো। যা বলেছ, সকল বৈষ্ণবকে নিয়ে কীর্তন করো। কীর্তন-আটোপে সমস্ত পৃথিবী টলমল করে উঠুক।'

'তাই, তাই করব।' নিমাই ফিরে গেল নিজ গৃহে।

'কলিকালে যুগধর্ম—নামের প্রচার।
তথি লাগি পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার॥'

দ্বাপরে ভগবান শ্যাম, কলিতে ভগবান গৌর। এঁরা দুই পৃথক অবতার নন, একই অবতারের দুটি ভাব বা দুটি আবির্ভাব। গৌরসুন্দর শ্যামসুন্দরেরই আরেক অভিব্যক্তি। বৃন্দাবনলীলা ও নবদ্বীপলীলা পৃথক লীলা নয়, একই লীলা-সমুদ্রের দুটি তরঙ্গ। পূর্বতরঙ্গ বৃন্দাবন, উত্তর তরঙ্গ নবদ্বীপ।

জীবকে ব্রজপ্রেম দেওয়াই নবদ্বীপলীলার উদ্দেশ্য। কিন্তু এই ব্রজপ্রেম কী করে দেওয়া যায় রাধিকা ছাড়া? রাধিকাই তে ব্রজ-প্রেমের মালিক। আর রাধিকা গৌরাঙ্গী। তাই রাধিকার ভাব ও কান্তি ছাড়া ব্রজপ্রেম অসাধ্য। সেই ভাব আর কান্তিকে অঙ্গীকৃত করে নিয়েছে বলেই শ্রীকৃষ্ণ পীত বা গৌর হয়েছেন নবদ্বীপে।

'ব্যক্ত করি ভাগবতে কহে আরবার।
কলিযুগে ধর্ম—নামসঙ্কীর্তন সার॥'

অদ্বৈত ফিরে গেল শান্তিপুর। ওখানে বসে পরীক্ষা করব নিমাইকে। নিমাই যদি সত্যি ভগবান হয়, যদি সত্যি তার প্রকাশ হয়ে থাকে, সে আমাকে দূরে ফেলে রাখবে না, তার নিজের কাছে টেনে

নেবে। 'সত্যি যদি প্রভু হয়, মুঞি হঙ দাস। তবে মোরে বান্ধিয়া আনিব নিজ পাশ ॥' আমাকে করবে না উপেক্ষা।

কেউ কেউ ভাবলে এ নিমাইয়ের বায়ুরোগ ছাড়া কিছু নয়। নইলে কেন এত কম্প, এত কান্না, ক্ষণে ক্ষণে কেনই বা সর্ব-অঙ্গ স্তম্ভাকৃতি, কেনই বা নবনীতময়! শচী পাগলের মত হয়ে গিয়েছে। এ কী হল নিমাইয়ের? শ্রীবাস এসে আশ্বস্ত করল শচীকে। এ বায়ুরোগ নয়, এ কৃষ্ণভক্তি। শরীরে কৃষ্ণবিহার, কৃষ্ণস্ফুরণ।

শচীর তবু সান্ত্বনা কই? যদি কৃষ্ণপ্রেমের ঢেউয়ে নিমাই বেরিয়ে যায় বাড়ি থেকে?

না, শোক করি কেন? আমিও চোখ ভরে দেখি এই কৃষ্ণমাধুর্য।

'যে মাধুরী, ঊর্ধ্ব আন নাহি যার সমান
পর ব্যোমে স্বরূপের গণে।
যেঁহো সব অবতারী পরব্যোমে অধিকারী
এ মাধুর্য নাহি নারায়ণে ॥'

অন্য স্বরূপের কথা দূরে থাক, যিনি সমস্ত অবতারের মূল, যিনি পরব্যোমধামের অধিপতি, সেই নারায়ণেও শ্রীকৃষ্ণের সমান মাধুর্য নেই। থাকলে লক্ষ্মী বৈকুণ্ঠের সমস্ত ঐশ্বর্য উপেক্ষা করে সমস্ত কামভোগ বিসর্জন দিয়ে কৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদনের আশায় তপস্যা করতে বসত না।

দেখ দেখ নিমাইকে।

'কনক মানস যেন পুলকিত অঙ্গ।
ক্ষণে-ক্ষণে অট্ট-অট্ট হাসে বহুরঙ্গ ॥
ক্ষণে হয় আনন্দ মূর্ছিত প্রহরেক।
বাহ্য হৈলে না বোলয়ে কৃষ্ণ ব্যতিরেক ॥'

বহিরঙ্গ লোক দেখলে নিমাই এড়িয়ে যায় আর ভক্ত দেখলেই নমস্কার করে, কারুর পায়ের কাছে বা লুটিয়ে পড়ে সাষ্টাঙ্গে।

সবাই হায়-হায় করে ওঠে। কী কর কী কর বলে পিছিয়ে যায়।

নিমাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কেঁদে ফেলে, তার আন্তরিকতায় বাধা দিতেও কুণ্ঠা আসে।

কারু ফুলের সাজি বয়ে দেয় নিমাই, কারু বা স্নানের কাপড়। স্নানের শেষে কারু বা ভিজে কাপড় নিংড়ে দেয়।

কিন্তু এসবের কী অর্থ? নিজেকে কি তৃণাদপি তুচ্ছ মনে করা?

'শুনেছি ভক্তের সেবা করলে কৃষ্ণকৃপা হয়, তাই আমি সেবা করছি আপনাদের।' বললে নিমাই, 'আমাকে কৃষ্ণকৃপা থেকে বঞ্চিত করবেন কেন?'

'কৃষ্ণের করয়ে সেবা ভক্তের স্বভাব।
ভক্ত লাগি কৃষ্ণের সকল অনুভাব॥'

নিমাইয়ের বিনয়ে সকলে মুগ্ধ। অকৈতবে সকলে তাকে আশীর্বাদ করতে লাগল: কৃষ্ণ তোমাকে কৃপা করুন। তোমার থেকে আমাদের সকলের দুঃখ যাক। যারা অজ্ঞ, রুক্ষ, কঠিন, যারা নিন্দুক, বিমুখ, বিরুদ্ধ, তারাও সকলে কৃষ্ণরসে মগ্ন হোক। তুমি যেমন শাস্ত্রে সর্ব-সংসার জয় করেছ, তেমনি ভক্তিতে পাষণ্ডদের সংহার করো। যারা অধ্যাপক আছে নবদ্বীপে তাদের মুখেও কৃষ্ণনাম নেই। 'এই নবদ্বীপে বাপ, যত অধ্যাপক। কৃষ্ণভক্তি বাখানিতে সভে হয় বক॥' আর যারা বিষয়ী, পাপাশ্রয়ী তারা তো আমাদের পীড়ন আর অপমান করতেই ব্যস্ত।'

ভক্তের দুঃখের কথা শুনে, পাপিষ্ঠদের অত্যাচারের কথা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে নিমাই। হুঙ্কার দিয়ে ওঠে—আমি সেই—আমিই সেই। দুর্জনদের বিনাশ করতে আমি এসেছি। দূরে সরো অভক্তের দল। অনৃতের দল।

'আপন ভক্তের দুঃখ শুনিঞা ঠাকুর।
পাষণ্ডীর প্রতি ক্রোধ বাড়িল প্রচুর॥
সংহারিব সব বলি করয়ে হুঙ্কার।
মুঞি সেই মুঞি সেই বোলে বারবার॥

আপনে আপনে কহে মনে মনে কথা।
ক্ষণে বোলে ছিণ্ডোঁ ছিণ্ডোঁ পাষণ্ডীর মাথা॥
দন্ত কড়মড়ি করে, মালসাট মারে।
গড়াগড়ি যায়, কিছু বচন না স্ফুরে॥'

এ আবার আরেক প্রকাশ। আরেক কৃষ্ণস্ফূর্তি। কৃষ্ণোদ্দীপন।

কিন্তু পরক্ষণেই আবার বিপুল বিরহভারে ভেঙে পড়ে নিমাই। অশ্রুর স্রোতস্বিনীতে ঝাঁপ দেয়।

কোথায়, আমার নন্দকুলচন্দ্রমা কোথায়? আমার শিখিপুচ্ছভূষণ কোথায়? আমার সান্দ্রমুরলীরব কোথায়? কোথায় সুরেন্দ্রনীলদ্যুতি? কোথায় রসরাসতাণ্ডবী? কোথায় আমার প্রাণরক্ষার মহৌষধ? আমার সুহৃত্তম অমূল্যরত্ন কোথায়? সেই বিধিকে ধিক যে আমাকে আমার এমন প্রিয়তমের থেকে বিচ্যুত করল।

'কাঁহা সে চুড়ার ঠান, শিখিপঞ্ছের উড়ান,
নবমেঘে যেন ইন্দ্রধনু।
পীতাম্বর তড়িদ্দ্যুতি মুক্তামালা বক পাঁতি,
নবাম্বুদ জিনি শ্যামতনু॥'

সর্বত্রই ঐ এক ধ্বনি, কোথায়, কোথায়? কানাই কানাই, কাহাঁ নাই, কাহাঁ নাই।

শ্রীবাস নিমাইকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল কীর্তন করাতে। তারা চার ভাই, সকলেই কীর্তনে কীর্তিমান। সকলে আনন্দ করে উঠল। তারপরে আসবে মুকুন্দ-মুরারি, সদাশিব আর গদাধর। আসবে আরো অনেক কৃষ্ণপ্রণত—কৃষ্ণপ্রণীত। জয়-জয়কার হবে।

কিন্তু কীর্তন কোথায়? কাঁদতে বসল নিমাই। সে ক্রন্দন বুঝি কীর্তনের চেয়েও মধুর।

'জানো গয়া থেকে ফেরবার সময় কানাই-নাটশালা নামে এক গ্রামে এসে উঠেছিলাম। সকালে দেখলাম সেখানে একটি শিশু এসে উপস্থিত। আহা, কী সুন্দর সে শিশু। তমাল-শ্যামল। কুন্তলে

নবগুঞ্জা, তার উপরে বিচিত্র ময়ূরপুচ্ছ। ছোট ছোট মণি তাতে ঝলমল করছে। মুক্ত কমলদলের মত চোখ, কানে মকরকুণ্ডল। পরনের পীত ধটিটি কী মনোহর! আর তাতে মোহন বাঁশি, পায়ে মধুর নূপুর। সে অতিচঞ্চল শিশু হাসতে হাসতে আমার কাছে এল, এল নাচতে-নাচতে, আর আমার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঝাঁপিয়ে পড়েই মিলিয়ে গেল। কোথায় গেল সেই শিশু, সেই আমার মধুর মধুর স্মেরাকার, সেই আমার মানসনয়নোৎসব!'

কিমিহ বৃণুমঃ কস্য ব্রুমঃ কৃতং বৃতম আশয়া। হা হা সখি কী করি উপায়। কাহাঁ করোঁ কাহাঁ যাঙ কাহাঁ গেলে কৃষ্ণ পাঙ, কৃষ্ণ বিনু প্রাণ মোর যায়।

নিমাই মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

মূর্ছাভঙ্গে হাসতে লাগল নিমাই। গৌরকলেবর স্থির হল। আনন্দের সরোবরে ভাসতে লাগল সন্তোষের শ্বেতপদ্ম।

এ আমরা কোথায় আছি? মর্তে না বৈকুণ্ঠে? এ আমাদের কী অবস্থা? জাগ্রত না নিদ্রামগ্ন? এ কি আমরা বিষাদ দেখছি না প্রসাদ দেখছি? এ কি আমাদের সেই নিমাই, না কি এ শুকদেব না প্রহ্লাদ? না কি এ যুগলায়িত রাধাকৃষ্ণ?

বলতে লাগল সবাই, 'আমাদের আজ বড় পুণ্য, তোমার সঙ্গ পেয়েছি। আর আমাদের কী চাই!' 'তুমি সঙ্গে যার, তার বৈকুণ্ঠে কি করে। তিলেকে তোমার সঙ্গে ভক্তি ফল ধরে॥' পাষণ্ডদের বাক্যে ব্যবহারে শরীর দগ্ধ হয়ে আছে, তোমার প্রেমজলে এবার শীতল হব।'

'কোথায় কৃষ্ণ?' বাড়ি ফিরে এসে সঙ্গী গদাধরকে আবার জিগগেস করল নিমাই। শিশুর মত চাউনি, শিশুর মত প্রশ্ন।

'কোথায় আবার যাবেন?' বললে গদাধর, 'তোমার হৃদয়েই শুয়ে আছেন।'

'হৃদয়ে? সত্যি?' দুই হাতের নখ দিয়ে বুক চিরতে লাগল নিমাই। রক্ত ঝরতে লাগল।

যাকে আমি ত্যাগ করব ভাবছি, সে আর জায়গা না পেয়ে আমার হৃদয়ে এসে লুকিয়েছে ? 'যারে চাহি ছাড়িতে, সেই শুঞা আছে চিতে। কোন রীতে না পারি ছাড়িতে॥' যাকে ভোলবার জন্যে এত চেষ্টা তার কিনা হৃদয়শয়ন ?

ত্রস্তব্যস্ত হয়ে নিমাইয়ের দুই হাত ধরে ফেলল গদাধর। শিশুর মতই প্রবোধ দিল : 'ব্যস্ত হচ্ছ কেন ? শিগগিরই আসবেন কৃষ্ণ।'

'আসবেন ?'

'হ্যাঁ, হৃদয় থেকে উঠে আসবেন বাইরে।' বললে গদাধর, 'তুমি দেখবে, সকলে দেখবে।'

আশ্বস্ত হল নিমাই। নিরস্ত হল।

শচী কৃতজ্ঞকণ্ঠে বললে, 'বাবা গদাধর, এমন শিশুর বুদ্ধি আর কোথাও দেখিনি। আমি তো ভয়ে ওর সামনেও যেতে পারি না, বউয়েরও সেই দশা, তুমি ছিলে বলেই ও আজ রক্ষা পেল। বলো তুমি ওর সঙ্গ ছেড়ে যাবেনা কোথাও, ওকে চোখে-চোখে রাখবে।'

'কৃষ্ণই ওকে চোখে-চোখে রাখবেন।'

২৩

'কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত।' বাহ্যে বিষজ্বালা কিন্তু অন্তরে আনন্দস্রোত। তপ্ত ইক্ষুচর্বণের মত। মুখ জ্বলে যাচ্ছে তবু 'না যায় ত্যজন'। 'সেই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সে-ই জানে, বিষামৃতে একত্র মিলন।'

প্রৌঢ় সাপের চেয়ে শিশু সাপের বিষ বেশি। তার কটুতা অর্থাৎ তীব্রতাও বেশি। আর এই কটুতার জন্যে সর্পশাবকের গর্বের অন্ত নেই। কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমের জ্বালা সেই নবকালকূটের গর্বকেও নির্বাসনে পাঠিয়েছে। অন্যদিকে সুধারও অহঙ্কার কম নয়। আমার মতন

কার এমন মধুরিমা এই তার অহঙ্কার। কৃষ্ণপ্রেমের আনন্দ সেই অহঙ্কারেরও সঙ্কোচ ঘটিয়েছে। কৃষ্ণপ্রেম একাধারে বক্র ও মধুর।

নিমাই নাচছে আর আছাড় খেয়ে খেয়ে পড়ছে মাটিতে। শচী বলছে, 'বাছার আমার হাড়গোড় ভেঙে গেল। তোমরা আর কীর্তন কোরো না। ক্ষান্ত দাও এবার।'

কে কার কথা শোনে। নিমাই আবার উঠেছে। না, হাড়গোড় ভাঙেনি। আবার নাচছে নিমাই। আবার হরি হরয়ে নমঃ, কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ, বলে নামগান করছে। তখন শচী নিমাইয়ের সঙ্গী-ভক্তদের বললে, 'ওগো তোমরা নিমাইকে ঘিরে থাকো, যদি ঢলে পড়ে ধরে ফেলো। তার কোমল অঙ্গ যেন মাটিতে না পড়ে।'

কিন্তু বারণ করছ কাকে? দেখ কাকে বলে কৃষ্ণপ্রেম।

শচী নিমাইকে বললে, 'তুমি যেখানে যা পাও তা আমাকে দাও। শুনছি তুমি কৃষ্ণপ্রেম এনেছ। তবে তা আমাকে দিচ্ছ না কেন?'

নিমাই বললে, 'মা, তোমার অপরাধ আছে।'

'কী অপরাধ?'

'বৈষ্ণব-অপরাধ।'

অদ্বৈতের প্রতি অপ্রসন্ন ছিল শচী। বড় ছেলে বিশ্বরূপ অদ্বৈতের কাছে যাতায়াত করত, বলত ঈশ্বরকথা। যখন সন্ন্যাসী হয়ে বিশ্বরূপ ঘর ছাড়লে, শচী মনে করল অদ্বৈতই এর হেতু। মন বেঁকে রইল অদ্বৈতের উপর। তারপর নিমাই যখন আশ্বাস দিল যে সংসারে থাকবে তখন শচী ভুলে গেল অদ্বৈতকে। কিন্তু এখন, গয়া থেকে আসবার পর, এ সব কী হচ্ছে? নিমাই ঘন ঘন যাচ্ছে অদ্বৈতের কাছে। এমন কি লক্ষ্মীপ্রতিমা বিষ্ণুপ্রিয়াকে ছেড়ে অদ্বৈতের ঘরে রাত কাটাচ্ছে। নিমাই না আবার সন্ন্যাসী হয়ে চলে যায়। অদ্বৈত না আবার বৈরাগ্যের মন্ত্র দেয় কানে কানে। শচীর সমস্ত চিত্ত অদ্বৈতের উপর বিমুখ হয়ে রইল।

আর তার এই বৈমুখ্য এই অপ্রসন্নতাই বৈষ্ণব-অপরাধ।

কোনো বৈষ্ণবকে প্রহার করলে, নিন্দা করলে, দ্বেষ করলে, অভিনন্দন না করলে, অর্থাৎ অনাদর করলে, বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করলে বা বৈষ্ণব দর্শনে আনন্দ না দেখালে বৈষ্ণবাপরাধ হয়।

শচী বৈষ্ণবপ্রধান অদ্বৈতের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেছে। সুতরাং সে অপরাধী।

'সবে এই অপরাধ আর কিছু নাই।
ইহার লাগিয়া প্রেম না দেন গোসাঞি॥'

শাস্তি দিল নিমাই। মা বলেও পক্ষপাতিত্ব করল না। এ তো দণ্ড নয়, প্রসাদ। অদ্বৈতের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিল শচী। সে ক্ষমায় অপরাধ ধুয়ে গেল। তারপরে মাকে নিমাই কৃষ্ণপ্রেম দিলে।

'যে দণ্ড পাইলেন শ্রীশচী ভাগ্যবতী।
সে দণ্ড প্রসাদ অন্য লোক পাবে কতি?'

ভক্ত অম্বরীষের কাছে অপরাধ করে দুর্বাসারও দণ্ড হয়েছে, বিষ্ণুচক্রের তেজ তাকে দগ্ধ করছে। ছুটতে ছুটতে অম্বরীষ বৈকুণ্ঠে এসে শ্রীহরির শরণ নিয়েছে, হে অচ্যুত, হে বিশ্বভাবন, আমাকে রক্ষা করুন। শ্রীহরি বললে, আমার করার কিছু সাধ্য নেই। আমি অস্বতন্ত্র, আমি ভক্তপরাধীন। ভক্তরা আমার হৃদয় গ্রাস করে রেখেছে। তাদের মত প্রিয় আর আমার কেউ নেই। আমি তাদের কথাই শুনি, তাদের কথায়ই উঠি বসি।

তবে আমার উপায়? দুর্বাসা চোখে অন্ধকার দেখল।

তুমি গিয়ে অম্বরীষের কাছে ক্ষমা চাও। তা হলেই তুমি শান্তি পাবে। চক্র আর পিছু নেবে না। ফিরে যাবে।

ব্রাহ্মণ দুর্বাসা ক্ষত্রিয় রাজার পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইল। প্রশান্ত হল বিষ্ণুচক্র।

মুকুন্দ দত্ত সম্পর্কেও সেই দণ্ড-প্রসাদ।

এক সঙ্গে পড়ত নিমাইয়ের সঙ্গে। ব্যাকরণের ফাঁকির লড়াই হত দু' জনে। অন্তরঙ্গ সঙ্গী মুকুন্দ আর গানে সুধাকণ্ঠ।

সেই মুকুন্দের প্রতি নিমাই বিরূপ। আর সকলকে ডেকে কৃপা করছে, প্রেম দিচ্ছে, কিন্তু মুকুন্দকে ডাকছে না। নামও করছে না মুকুন্দের।

কী যেন অপরাধ করেছি। সরাসরি নিমাইকে জিগগেস করতেও সাহস হয় না। শুধু অন্তরে বসে কাঁদে। ম্লানমুখে ঘুরে বেড়ায়।

শ্রীবাস এসে নিমাইকে ধরল, 'তুমি সকলকে ডাকছ, মুকুন্দকে ডাকছ না কেন? তোমার কাছে ও কী অপরাধ করেছে? ও তোমার বন্ধু। ওর গানে প্রস্তর পর্যন্ত দ্রবীভূত। তুমি কেন ওর প্রতি উদাসীন? ওকে দেখা পর্যন্ত দিচ্ছ না।'

'বোলো না, ওর কথা বোলো না।' নিমাই বললে বিরক্ত স্বরে, 'ওর ভক্তিস্থানে অপরাধ।'

'ভক্তিস্থানে?'

'হ্যাঁ, ও যখন যেখানে যায় তখন সেখানের মত কথা বলে। যখন জ্ঞানমার্গীদের কাছে যায় তখন যোগবাশিষ্ঠ পড়ে, আবার যখন ভক্তের কাছে যায় তখন ভক্তির প্রাধান্য স্থাপন করে।' নিমাই বললে, 'ভক্তিস্থানে তাই ও অপরাধী।' 'ভক্তিস্থানে উহার হইল অপরাধ। এতেকে উহার হৈল দরশনে বাধ!'

ঘরের বাইরে থেকে শুনল সব মুকুন্দ। ঠিক করল এ অপরাধী দেহ আর রাখবে না! কাঁদতে কাঁদতে শ্রীবাসকে বললে, 'প্রভুকে জিগগেস করো আর কোনোদিন তাঁর দর্শন পাব কি না—'

নিমাই বললে, 'পাবে। কোটি জন্ম পরে পাবে।'

'পাব? পাব? আমার অপরাধ ক্ষয় হয়ে যাবে?' নিশ্চয়প্রাপ্তির কথা জেনে মহানন্দে নাচতে লাগল মুকুন্দ।

মুকুন্দের কাণ্ড দেখে নিমাই হাসতে লাগল। বললে, 'শিগগির আমার কাছে নিয়ে এস মুকুন্দকে। ওর আর অপরাধ নেই।'

মুকুন্দ কাছে এসে দাঁড়াতেই নিমাই বললে, 'মুকুন্দ, প্রসাদ নাও।' 'প্রভু বোলে মুকুন্দ, ঘুচিল অপরাধ। আইস আমারে দেখ, ধরহ প্রসাদ॥'

মুকুন্দ নিমাইয়ের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল।

নিমাই বললে, 'ওঠ। আর তোমার তিলার্ধ অপরাধ নেই। তুমি আমার বাক্য অব্যর্থ জেনে আনন্দ করছ তাতেই তোমার শরীরে ভক্তি এসে গিয়েছে।' 'ভক্তিময় তোমার শরীর - মোর দাস। তোমার জিহ্বায় মোর নিরন্তর বাস॥'

অনুতাপ করতে লাগল মুকুন্দ: 'এই ছার মুখে আমি ভক্তি মানলাম না, আমার মত হীনমতি আর কে আছে?' 'কীট হই না মানিলুঁ মুঞি হেন ভক্তি। আর তোমা দেখিবারে আছে মোর শক্তি?' দুর্যোধনও বিশ্বরূপ দেখল কিন্তু ভক্তিশূন্য বলে কিছুই দেখল না। পেল না আনন্দলেশ। 'না পাইল সুখ—ভক্তিশূন্যের কারণে।' বেদ-মহাভারত বহু শাস্ত্র লিখেও ব্যাসের শান্তি হল না। শান্তি হল ভক্তির বিস্তারে। 'নারদের বাক্যে ভক্তি করিলা বিস্তার। তবে মনো-দুঃখ গেল তারিল সংসার।' আর আমি কিনা সেই ভক্তি মানলাম না, তবু তুমি—তুমি আমাকে কৃপা করলে।'

গত চরিত্রের জন্যে অনুতাপ করতে লাগল মুকুন্দ। নিমাই বললে, 'না, তোমার কণ্ঠস্বরেই তো প্রেমভক্তি ঢেলে দিয়েছি। তোমার সর্বদেহে এখন প্রিয়ঙ্করী ভক্তি এসেছে। তুমি ঠিকই বলেছ, যদি ভক্তি না থাকে আমাকে দেখেও কিছু হয় না, ভক্তি ছাড়া সমস্ত কর্ম অর্থহীন। কিন্তু তোমার আর ভয় নেই। তুমি ভক্তি-বিশ্বাসের গান হয়ে উঠেছ।' 'যেখানে যেখানে হয় মোর অবতার। তথায় গায়ন তুমি হইবে আমার।' 'যথা গাও তুমি তথা আমি অবতরি।'

মুকুন্দকে বরদান করল নিমাই আর সকলে জয়ধ্বনি, হরিধ্বনি করে উঠল।

'মুকুন্দের স্তুতি বর শুনে যেই জন।
সেহো মুকুন্দের সঙ্গে হইব গায়ন॥'

গদাধরও কাঁদছে। নিমাইয়ের নিত্যসঙ্গী গদাধর। যত গৃহকাজ সব গদাধর করে দেয়। নিমাইয়ের বিছানা করে, পান সাজে, পাখা

করে, পায়ের নিচে শুয়ে থাকে যদি কিছু আদেশ হয়! বিষ্ণুপ্রিয়া তাকে দু চক্ষে দেখতে পারে না। তার সকল কাজ বুঝি হরণ করেছে গদাধর।

গদাধরেরও গোপন সাধ একদিন কৃষ্ণপ্রেম চেয়ে নেয় নিমাইয়ের কাছে। কিন্তু মুখ ফুটে বলতে সাহস পায় না। নিমাইয়ের মুখের দিকে তাকাতেও কেমন তার ভয় করে।

একদিন রাত্রে দুজনে শুয়েছে কীর্তনান্তে। নিমাইয়ের পায়ের নিচে গদাধর।

হঠাৎ গদাধর নিমাইয়ের দু পা বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল।

'এ কি, কাঁদ কেন?' নিমাই চঞ্চল হয়ে উঠল।

গদাধর সভয়ে বললে, 'আমার কৃষ্ণপ্রেম কই?'

'তোমারও চাই না কি ও বস্তু?'

'সকলে প্রসাদ পেয়ে উদ্ধার হয়ে গেল, আর আমি তোমার সঙ্গী, তোমার সেবক, শুধু আমিই বঞ্চিত হয়ে থাকব? এ কেমন কথা?'

সহাস্যে নিমাই বললে, 'আচ্ছা, তুমিও পাবে।'

'পাব?'

'হ্যাঁ, দেখো, কাল ভোরে যখন তুমি গঙ্গাস্নান করবে দেখবে তোমাতে কৃষ্ণপ্রেম আবির্ভূত হয়েছে।

'সত্যি?'

বাকি রাত গদাধর আর ঘুমুল না। পারল না ঘুমুতে। পুবের দিকে তাকিয়ে রইল কতক্ষণে ফোটে তার আনন্দের স্বপ্ন।

ভোর হতেই ছুটল গঙ্গার দিকে। ডুবের পর ডুব দিতে লাগল। কই কোথায় কৃষ্ণপ্রেম!

স্নান সেরে পারে উঠতেই এ কী আবেশ এল সর্বাঙ্গে! এ কী আনন্দ! এ কী অশ্রু! পা কেন স্থির রাখতে পারছি না মাটিতে? কেন টলে-টলে পড়ছি?

ভক্তগণ নিয়ে বসে আছে নিমাই, দেখল অবশ শরীরে টলমল করতে-করতে গদাধর এগিয়ে আসছে। কাঁদছে অঝোরে, চোখ লাল হয়েছে কাঁদতে-কাঁদতে। গলবস্ত্র হয়ে নিমাইয়ের পায়ে লুটিয়ে পড়ল।

'গদাধর, কী খবর ?' নিমাই তাকে তুলল হাতে ধরে।

গদাধর বিহ্বল চোখে তাকিয়ে রইল।

'কী, পেলে ?' স্মিতহাস্যে জিগগেস করল গৌরহরি।

গদাধরের মুখে কথা নেই, শুধু অশ্রু ঝরছে অবিশ্রাম।

শুক্লাম্বরা ব্রহ্মচারী নিমাইয়ের প্রতিবেশী। কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলে ভিক্ষে করে বেড়ায় এবং তারই বলে অনেক তীর্থ ঘুরতে পেরেছে। তপস্যাও অনেক করেছে শোনা যায়। একদিন তার মনে হল, প্রেমই পরম পদার্থ আর প্রেম না পেলে কী পেলাম জীবনে! আর, প্রেম আমি পাব না তো পাবে কে ? কে অত তীর্থ পর্যটন করেছে, কে করেছে এত ব্রত, এত কৃচ্ছ্র, এত কাঠিন্য।

প্রেমভিক্ষা চাইল শুক্লাম্বর। তার ভিক্ষার পিছনে দম্ভ ছিল। বললে, 'দ্বারকা মথুরা বেড়িয়েছি, করেছি অনেক তপঃক্লেশ, সুতরাং আমিই প্রেমভক্তি পাবার উপযুক্ত। দাও আমার প্রাপ্যধন।'

নিমাই বললে, 'দ্বারকা মথুরায় কি শেয়াল কুকুর ছিল না ?'

মুহূর্তে শুক্লাম্বর বুঝতে পারল তার অপরাধ। আর তৎক্ষণাৎ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। লোকদেখানো কান্না নয়, কৃষ্ণ-বিরহের আর্তি।

অনুগতের আর্তি নিমাই সইতে পারল না। প্রেম-প্রসাদ দিয়ে দিল ব্রাহ্মণকে। তখুনি শরীরে পুলককম্প শুরু হল, নয়নে বইতে লাগল অশ্রুর ভরাস্রোত।

করুণায় অবতীর্ণ গৌরহরি! অস্ত্র ধারণ করেনি, কারু প্রাণসংহার করেনি, হরিনাম কৃষ্ণপ্রেম দিয়ে সকলের চিত্ত শুদ্ধ করে দিল। অসুর নাশ করল না, অসুরত্বকে নাশ করল। পাপীকে শাস্তি দিল না, তার পাপ হরণ করে তাকে ভক্ত করে তুলল।

'রাম আদি অবতারে ক্রোধে নানা অস্ত্র ধরে
অসুরেরে করিল সংহার।
এবে অস্ত্র না ধরিল প্রাণে কারে না মারিল
চিত্তশুদ্ধি করিল সভার।'

আর যে এত করুণা দিচ্ছে সে কৃষ্ণ ছাড়া আর কে? কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি? কৃষ্ণ ছাড়া এমন আর কে আছে যে লতাকে পর্যন্ত প্রেম দেয়? প্রেমে বৃক্ষ-লতাও কাঁদে, সর্বাঙ্গে পুলকশিহরণ ধরে থাকে। মধুক্ষরণ করে।

সেই কৃষ্ণমাধুরী আস্বাদনের উপায় কী? উপায় প্রেম। 'প্রৌঢ় নির্মল ভাব প্রেম সর্বোত্তম। কৃষ্ণের মাধুরী আস্বাদনের কারণ॥' যার যতটুকু প্রেম তার ততটুকু আস্বাদন। 'আমার মাধুর্য নিত্য নব নব হয়। স্ব-স্ব-প্রেম অনুরূপ ভক্ত আস্বাদয়॥' একমাত্র রাধিকাতেই ভাবের অবধি, প্রেমের পূর্ণতম সর্বোত্তম প্রকাশ। তাই একমাত্র শ্রীমতীরই পূর্ণতম সর্বোত্তম আস্বাদন।

প্রেম পেয়ে শুক্লাম্বর নাচতে লাগল। তার কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি, তা নামিয়ে রাখল না। কার সাধ্য সেই নাচ দেখে না হাসে। নিমাই উঠে তার ভিক্ষার ঝুলিতে হাত ঢুকিয়ে দিল। দেখল তাতে কিছু চাল পড়ে আছে। সেই চাল এক মুঠো কুড়িয়ে নিয়ে খেতে লাগল নিমাই।

'করো কী, করো কী! শুধু শুধু কাঁচা চাল কি কেউ খায়?'

নিমাই বললে, 'বেশ, ঘরে গিয়ে রান্না করে কৃষ্ণের নৈবেদ্য করো। মধ্যাহ্নে আমি খাব।'

শুক্লাম্বর ফাঁপরে পড়ল। পরামর্শ নিল ভক্তদের। ভাত আর গর্ভথোড় রান্না করল। গঙ্গাস্নান করে এসে কৃষ্ণে নিবেদন করে খেল তাই নিমাই।

শ্রীবাসের আঙিনায় নিত্য কীর্তন হচ্ছে রাত্রিতে। শত শত ভক্ত নিয়ে নৃত্য করছে গৌরহরি। কখনো বাজাচ্ছে মৃদঙ্গ, কখনো বাজাচ্ছে

করতাল। কখনো বা হরিবোল বলছে, কখনো বা হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। কখনো বা দুই বাহু তুলে দিচ্ছে ঊর্ধ্বে। হরি-বোলের আর হরি নেই, শুধু বলছে বোল-বোল। উত্তাল হয়েছে ভক্তির সুধা-সাগর।

'আপনি করিব ভক্তভাব অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি ভক্তি শিখাইমু সভারে॥
আপনি না কৈলে ধর্ম শিখান না যায়।
এই ত সিদ্ধান্ত গীতা-ভাগবতে গায়॥'

নদীয়ার রাজপথে দিনে কীর্তন তো হচ্ছেই, রাত্রে আবার দরজা এঁটে, শ্রীবাসের বাড়ির ভিতরের উঠোনে। এমন কথা কেউ কখনো শোনেনি, দেখেনি শহরে-গ্রামে। ব্রাহ্মণ-শূদ্র ইতর-ভদ্র সকলে মিলে একসঙ্গে হৈ হৈ রৈ রৈ করে নাচবে আর চেঁচাবে! শুধু খোল করতাল বাজাচ্ছে না, পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নিয়েছে। কী কেলেঙ্কার! নগরবাসীদের কারু ঘুমুবার জো নেই, রাত্রির শান্তি চলে গিয়েছে দেশ ছেড়ে। এর বিহিত কী!

নগরের সঙ্কীর্তন বহির্মুখদের জন্যে, যদি প্রচারে কেউ অন্তর্মুখ হয়ে ওঠে। যদি পাষণ্ডীরা জাগে, যদি ফেরে তাদের মতিগতি। তাদের আর কাজ কী। তাদের কাজই হচ্ছে বিদ্রূপ করা, বিরুদ্ধতা করা, তিরস্কারে অপদস্থ করা। করুক, তবু কেউ যদি আকৃষ্ট হয়, কারু চোখে-কানে যদি অপূর্বের স্পর্শ লাগে।

কিন্তু শ্রীবাস-আঙিনার সঙ্কীর্তন অন্তর্মুখদের জন্যে, যারা অন্তরঙ্গ ভক্ত তাদের আস্বাদনের জন্যে। প্রাচীরের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে যাতে বহির্মুখেরা, বিরুদ্ধবাদীরা, না উৎপাত করতে পারে। ঠাট্টা-বিদ্রূপে না ব্যাহত করতে পারে তন্ময়তা। তারা তো সম্ভোগের দলে নয় তারা ভণ্ডুলের দলে। সুতরাং এ কথা বলতে পারো না তাদেরকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। বলতে পারো কীর্তনের পবিত্রতাকে নির্বিঘ্ন করা হচ্ছে।

'কবাট দিয়া কীর্তন করে পরম আবেশে।
পাষণ্ডী হাসিতে আইসে না পায় প্রবেশে ॥'

বহির্মুখের দল দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে নানা জটলা করে। এগুলোর এ কী বাই হল। এত নাচন-কুঁদন তো কোথাও দেখিনি। তার উপর দরজা বন্ধ কেন? ভিতরে কীর্তনের নামে কী হচ্ছে কে জানে!

নানা রকম কুৎসা রটাতে লাগল শত্রুরা। ভগবানকে ডাকবার জন্যে এত ঘটা-ছটার কী দরকার। তিনি হৃদয়ে আছেন, তাঁকে মনে মনে ডাকলেই তো চলে যায়। ওরকম চেঁচালে তিনিই তো সর্বাগ্রে রুষ্ট হবেন। তিনি রুষ্ট হলে দেশে বৃষ্টি হবে না, শস্য হবে না, সকলে না খেয়ে মারা যাব। ওঠো, একত্র হও, প্রতিকারের পথ দেখ।

এ সমস্তই নিমাইয়ের কাণ্ড। নিমাই পণ্ডিত আগে ভালো ছিল, গয়া থেকে ফিরে এসে শুরু করেছে পাগলামি। এ নবদ্বীপ, এখানে তোমার ঐ নব্য মত চলবে না। রাজা মুসলমান, এ কথা শুনলে রক্ষে রাখবে না, ধরে নিয়ে তো যাবেই, শহর-গ্রাম লুঠতরাজ করবে।

অনাচারে নষ্ট হল হিন্দু ধর্ম। চলো যাই কাজীর দরবারে গিয়ে নালিশ করি। রাজা লুটপাট করবে কেন? শরণাগত বিপন্ন প্রজাদের রক্ষে করবে। ধরে নিয়ে যাবে নিমাইকে আর যার ঐ অঙ্গন সেই শ্রীবাসকে।

এত হাঙ্গামার দরকার কী! আমরা নিজেরাই দরজা ভাঙি চলো। মারপিট করে ঘায়েল করি পাগলগুলোকে। শ্রীবাসের ঘর-দোর ভেঙে ফেলে ভাসিয়ে দিই গঙ্গায়।

খোলো, দরজা খোলো।

দরজায় ঘন ঘন করাঘাত করে পাষণ্ডীরা। ভিতরে অন্তর্মুখের দল তা গ্রাহ্যও করে না। উদ্দাম কীর্তন করে। তাদের শব্দে ঢাকা পড়ে বাইরের কোলাহল।

দ্বাররক্ষী গঙ্গাদাস। তার দৃঢ়তা অটুট-অটল। কারু সাধ্য নেই সামান্যতম ছিদ্র করে দরজায়।

প্রতিহত হয়ে ফিরে যায় বিমুখেরা। ষড়যন্ত্র করে। কী করে জব্দ করা যায় শ্রীবাসকে।

'কীর্তন শুনি বাহিরে তারা জ্বলি পুড়ি মরে।
শ্রীবাসেরে দুঃখ দিতে নানা যুক্তি করে।'

যুক্তি রাখো। সোজাসুজি কাজীর কাছে গিয়ে নালিশ করো। কাজী যদি কিছু প্রতিকার না করে তখন দেখা যাবে।

দল বেঁধে সবাই হাজির হল কাজীর কাছে।

আর্জি কী?

নিমাই পণ্ডিত দল খাড়া করে হিন্দুধর্মের নিপাত করছে। খোলকরতাল বাজিয়ে নিশিদিসি বেসুরো চিৎকার করছে। লাফাচ্ছে-ঝাঁপাচ্ছে। জনসাধারণের শান্তিভঙ্গ করছে। কাউকে ঘুমুতে দিচ্ছে না।

চেঁচিয়ে বলছে কী? কী বলে চেঁচাচ্ছে?

হরি-হরি বলে। এ ভাবের তাণ্ডবভজন হিন্দুধর্মে বিধেয় নয়। দেশের ঘোর অকল্যাণ হচ্ছে তাতে। সারা দেশে দেখা দেবে দুর্ভিক্ষ, দেখা দেবে মহামারী। ঈশ্বরের রোষে উচ্ছন্নে যাব সকলে।

আরো নালিশ আছে। বললে দলের আর আর কেউ।

দিনে কীর্তন রাস্তায়, রাত্রে কীর্তন রুদ্ধঘরে। দরজা যখন বন্ধ তখন ভিতরে নিশ্চয় পাপের প্রস্রবণ। মদ-মাংস তো আছেই, আছে হয়তো বা প্রাসঙ্গিক আসঙ্গ। আমাদের কি কেউ রাজা নেই? আমরা কি অবিধির দেশে আছি?

কাজী বললে, যাও, শায়েস্তা করছি। কীর্তন বন্ধ করে দিচ্ছি অচিরে।

অভিযোক্তারা ফিরল খুশি হয়ে। রাষ্ট্র করে দিল গৌড়ের বাদশা হোসেন শা নিমাই আর তার পার্ষদদের ধরবার জন্য সৈন্য পাঠাচ্ছে।

বৈষ্ণবদের কেউ কেউ ঘাবড়ে গিয়ে বললে, 'ঘরে বসে একাকী কীর্তন করাই ভালো। শয়ে-শয়ে লোক জুটিয়ে লোকের বিরক্তি ঘটিয়ে কীর্তন করার দরকার কি।'

কেউ-কেউ বললে, 'আমাদের কী দায়! ধরতে আসে শ্রীবাসকে বেঁধে নিয়ে যাবে। ওই তো নাচিয়েছে আমাদের।'

কিন্তু বেশির ভাগ বৈষ্ণবই নির্ভয়। আমাদের প্রভু আছেন, আমাদের ভয় কী। 'যে করিব কৃষ্ণচন্দ্র—সেই সত্য হয়। সে প্রভু থাকিতে কোন অধমেরে ভয়?'

আর নিমাই? নিমাইয়ের কী ভাব? এ কী, গঙ্গাতীরে একা-একা বেড়াচ্ছ কী! রাজার সৈন্য যে ধরতে আসছে।

আসুক। চলে যাব রাজার কাছে। এ তো ভাগ্যের কথা। রাজা সম্মান করলে সকলে সম্মান করবে।

পালাও। সময় থাকতে দেশ ছাড়ো।

সমস্ত দেশই তো রাজার। পালিয়ে যাব কোথায়?

'এত ভয় শুনিঞাও ভয় নাহি পায়।
রাজার কুমার যেন নগরে বেড়ায়॥'

২৪

পূজার ঘরের দরজা বন্ধ করে নৃসিংহের ধ্যান করছে শ্রীবাস, হঠাৎ কে হুঙ্কার করে উঠল বাইরে থেকে: 'দরজা খোলো।'

লক্ষ্য করল না শ্রীবাস। যেমন তন্ময় হয়ে বসেছিল তেমনি বসে রইল।

'কী, খুললে না? খোলো বলছি শিগগির।' বাইরে থেকে দরজায় লাথি পড়ল এবার।

ভীষণ বিরক্ত হল শ্রীবাস। রুক্ষস্বরে চেঁচিয়ে উঠল: 'কে তুমি?'

'কে আমি?' বাইরে থেকে বললে, আগন্তুক: 'যার তুমি ধ্যান করছ সেই আমি। দরজা খুলে দেখ আমাকে।'

হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে বললে, 'তুই মন্দবুদ্ধি। নিশ্চয়ই তুই মরণেচ্ছু। আর মুমূর্ষুদেরই বাক্যবিপ্লব হয়ে থাকে। নইলে কী সাহস তুই বলিস আমি ছাড়া আরেক জগদীশ্বর আছে। যদি থাকে, সে কোথায়? যদি বলিস সে সর্বত্র আছে, তবে এই স্তম্ভে তাকে দেখছি না কেন?' 'ক্বাসৌ যদি স সর্বত্র, কস্মাৎ স্তম্ভে ন দৃশ্যতে?'

প্রহ্লাদ প্রণত হয়ে বল্লে, 'বা, ঐ তো দেখা যাচ্ছে।'

হিরণ্যকশিপু বলছে, 'ক্বাসৌ যদি স', অর্থাৎ সে ঈশ্বর যদি আছে সে কোথায়? প্রহ্লাদ বলছে, 'সর্বত্র', অর্থাৎ সর্বভূতে। হিরণ্যকশিপু বলছে, 'কস্মাৎ স্তম্ভে ন', অর্থাৎ, তা হলে ঐ স্ফটিকস্তম্ভে নেই কেন? প্রহ্লাদ বললে, 'দৃশ্যতে', অর্থাৎ, ঐ তো দেখতে পাচ্ছি।

তুমি যাকে শূন্যময় দেখছ, আমি তাকে কৃষ্ণময় দেখছি।

'তোর শরীর থেকে তোর শির আমি হরণ করব,' হিরণ্যকশিপু খড়্গ কুড়িয়ে নিল, বললে, 'আমাকে ছেড়ে যার তুই আশ্রয় নিয়েছিস সেই হরি আজ তোকে রক্ষা করুক।' সিংহাসন থেকে লাফ দিল হিরণ্যকশিপু আর অতিবলে স্তম্ভে মুষ্টিপ্রহার করল।

তৎক্ষণাৎ ভয়ঙ্কর শব্দ উঠল স্তম্ভে, যেন ব্রহ্মাণ্ড-কটাহ বিদীর্ণ হয়ে গেল। ধ্বনির পর প্রতিধ্বনি, প্রতিধ্বনির লহরী উঠল চারদিকে। হিরণ্যকশিপু চকিতনেত্রে পাগলের মত চারদিকে তাকাতে লাগল, এই ধ্বনির কারণ কী, নির্ণয় করতে পারল না।

ভক্ত প্রহ্লাদের কথা সত্য করবার জন্যে শ্রীহরি স্তম্ভের থেকে নির্গত হলেন। কিন্তু এ কী অদ্ভুতমূর্তি। অমৃগ, অমানুষ, অথচ সিংহ আর মানুষ একসঙ্গে, নৃসিংহমূর্তিতে দেখা দিলেন। প্রতপ্ত সুবর্ণের মত চোখ, স্ফীতদীপ্ত কেশর, করালদংষ্ট্র, ক্ষুরান্তজিহ্ব, ভ্রূকুটিভীষণ মুখাবয়ব। কর্ণদ্বয় নিশ্চল ও উর্ধ্বমুখ, নাসিকা পর্বতগুহার মত বিস্ফারিত। দেহ আকাশস্পর্শী, গ্রীবা হ্রস্ব ও স্থূল, বক্ষস্থল বিশাল ও উদর অতিশয় কৃশ। নখরনিকরে দুর্ধর্ষদর্শন।

ব্রহ্মার কাছ থেকে বর পেয়েছিল হিরণ্যকশিপু যে তার সৃষ্ট কোনো

জীব, দেবতা বা দানবের হাত থেকে তার মৃত্যু হবে না। তাই এই 'ন মৃগঃ ন মানুষঃ' অদ্ভুত নৃসিংহমূর্তি ধরতে হল ভগবানকে।

'যদিও স্পষ্ট বুঝতে পারছি মহামায়াবী হরি এইভাবেই আমার মৃত্যু চিন্তা করে রেখেছেন, তবুও এ উদ্যমে আমার আর কী হতে পারে?' এই বলে গদা তুলে নিয়ে সিংহনাদ করতে করতে নৃসিংহের দিকে ধাবিত হল হিরণ্যকশিপু।

গরুড় যেমন মহাসর্পকে ধরে, তেমনি নৃসিংহ হিরণ্যকশিপুকে ধরে ফেললেন। নিজের উরুদ্বয়ের উপর রেখে শাণিত নখরে তার উদর বিদীর্ণ করে হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করলেন। দেবাঙ্গনারা পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগল। স্তবে মুখর হয়ে উঠল দিঙ্মণ্ডল।

কিন্তু এ কী ভয়ঙ্কর মূর্তি নৃসিংহের। ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং—কিছুতেই এর নিবৃত্তি নেই। দেবতাদের কারু সাহস নেই কাছে যায়, তাকে শান্ত হতে বলে। লক্ষ্মীকে পাঠানো হল যদি তাকে দেখে করুণাপরবশ হন। কিন্তু লক্ষ্মীও এগুতে সাহস পেল না।

একমাত্র দুঃসাহস ভক্তের। যেখানে দেবতারা অক্ষম, স্বয়ং লক্ষ্মী সশঙ্ক, সেখানে ভক্তই অধিকারী, ভক্তই সম্মানিত।

নারদ বললে, বৎস, তোমার পিতার প্রতি ক্রুদ্ধ নৃসিংহদেবকে শান্ত করো।

পরম ভাগবত বালক প্রহ্লাদ নৃসিংহের কাছে গিয়ে ভূতলে শরীর লুণ্ঠিত করে প্রণাম করল। কৃতাঞ্জলি হয়ে স্তব করতে লাগল: হে সত্ত্বমূর্তে, ক্রোধ সংবরণ করুন। সর্পবৃশ্চিকাদি হিংস্র হত্যায় সাধুও আনন্দিত হয়। অসুরকে আপনি বধ করেছেন, আপনিও আনন্দিত হোন। আপনার রূপ লোকে ভয়শান্তির জন্যে স্মরণ করে, তবে কেন আপনি এই কোপমূর্তি ধরে আছেন? আমি কিন্তু আপনার শত্রুবিদারী নখাগ্রে ভীত নই, যেমন আমার ত্রাস সংসারচক্রপেষণে। দুঃখের যা ওষুধ তাও দুঃখ। আমি এই সংসারচক্রে ইক্ষুদণ্ডের মত নিষ্পীড়িত হচ্ছি, আপনি এ বিপন্নকে রক্ষা করুন। করদ্বয়ের কণ্ডুয়নের মত

দুঃখের পর সুখের ছদ্মবেশে দুঃখই বারে বারে দেখা দেয়। হে আর্তবন্ধু, মথনে যেমন কাঠে অগ্নির অনুভব হয়, তেমনি ভক্তিতে আমার হৃদয়ে আপনার মঙ্গলকোমল দর্শন ঘটুক। এই করাল মূর্তি প্রত্যাহার করুন। হে সর্বকল্যাণের অধীশ্বর, আমাকে লোকপ্রলোভনে আকৃষ্ট করবেন না, আমাকে নিরুপাধিক ভক্তি দিন।

প্রহ্লাদের স্তবে দ্রবীভূত হলেন নৃসিংহ। মাটি থেকে তাকে তুলে তার মাথায় অভয়ঙ্কর হাত রাখলেন। বজ্রসার মূর্তি কুসুমসুকুমার হয়ে উঠল।

শ্রীবাস দরজা খুলে দিল। কিন্তু এ কী! এ সে কাকে দেখছে!

এ যে নিমাই পণ্ডিত। তীব্রতেজ সূর্য্যের বীর্যজ্যোতি তার সর্বাঙ্গে।

'আমি এসেছি।'

হতচেতনের মত নির্বাক দাঁড়িয়ে রইল শ্রীবাস। তুমি এসেছ! তবে যে আমার পরম কামনার ধন, যাকে জড়ে-চেতনে নিত্য খুঁজছি, তুমিই কি সেই নরসিংহ? তোমার পাদপদ্মই কি সংসারমোচক? তুমিই কি সেই বিচিত্রবীর্য পরমপুরুষ?

'তাকিয়ে দেখছ কী!' বললে নিমাই, 'আমাকে অভিষেক করো।'

এতক্ষণে বুঝি চেতনা হল শ্রীবাসের। উচ্চ কণ্ঠে সকলকে ডাকতে লাগল। ওরে, কে কোথায় আছিস, ছুটে আয়, ভগবান আমাদের ঘরে এসেছেন, তাঁর অভিষেক করতে হবে। নতুন কলসী কিনে আন, একশো ঘটে জল নিয়ে আয় গঙ্গা থেকে।

পূজার ঘরে বিষ্ণুর খাটে শালগ্রাম শুয়ে। তাকে এক পাশে সরিয়ে রেখে নিমাই সেই বিষ্ণুখাটে বসে পড়ল।

কে আপত্তি করবে! 'আমিই সেই।' শুধু মুখের কথায় নয়, সর্বাঙ্গের অলোকসম্ভব রূপে, দিব্যদীপ্ত কান্তির সুধাপ্লাবনে।

গদাধর ছুটে এল, যে যেখানে ছিল শ্রীবাসের সমস্ত আত্মীয়মণ্ডলী। নিমাইকে উঠোনের মাঝখানে প্রশস্ত পিঁড়ির উপর বসানো হল, আর

শত শত গঙ্গাজলের ঘট উপুড় করা হল তার উপর। যারা স্নান করাচ্ছে আর যে স্নাত হচ্ছে, কারুরই বাহ্যজ্ঞান নেই। এত জল তবু গায়ের আভা শীতল হয় না। সোনার কান্তি সোনার চেয়েও তেজস্বী হয়ে ওঠে।

স্নানান্তে সূক্ষ্ম শুক্ল কাপড় পরিয়ে নিমাইকে ফের পূজার ঘরে আনা হল। আর বলা-কওয়া নেই, নিমাই ফের বসে পড়ল বিষ্ণুখাটে। দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল, সকলে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। শুনতে পেল ঘরের মধ্যে বাঁশি বাজছে, বেড়ার ফাঁক দিয়ে বেরুচ্ছে তেজঃপ্রভা। এমনটি কেউ দেখেনি, কেউ শোনেনি, কেউ কল্পনাও করেনি।

'শ্রীবাস!' ঘরের মধ্য থেকে গম্ভীর কণ্ঠে ডেকে উঠল নিমাই।

নাম ধরে শ্রীবাসকে এর আগে ডাকেনি কোনো দিন। আর এ অনুরোধের সম্ভাষণ নয়, আদেশের নির্ঘোষ!

ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকল শ্রীবাস।

'প্রভু!' দাঁড়াল করজোড়ে।

'তোমার ঘরে আমার জায়গা করে দাও।' বললে নিমাই, 'আমি তোমার ঘরের বাসিন্দে হব।'

খাট থেকে নেমে নিমাই অন্য আসনে বসল। আর সেই খাট নিয়ে যাওয়া হল শ্রীবাসের শয়ন-ঘরে। খাটানো হল চাঁদোয়া আর পরদা, খাটে পাতা হল বিছানা। তারপর তার উপরে নিমাই বসল।

গদাধর তাকে সাজাতে বসল ফুল দিয়ে। গায়ে লেপে দিল চন্দন, মাখিয়ে দিল কেশর-কর্পূর। নিমাইয়ের যেন রক্তমাংসের শরীর নয়, শুধু জ্যোতিস্রোত। শুধু তেজঃপুঞ্জ।

'আমি কে বুঝতে পেরেছ?'

কেউ চামর দিয়ে ব্যজন করছিল, কেউ বা স্তব করছিল তন্ময় হয়ে, আর কেউ শুধু তাকিয়ে ছিল নির্নিমেষে। নিমাইয়ের প্রশ্ন শুনে কাঁদতে লাগল।

নিমাই বললে, 'আমিই সেই অন্তরবাসী অন্তরতম। যিনি তোমাদের হৃদয়ে বিরাজ করছেন আমিই সেই পরমপুরুষ। জীবের দুঃখ নিবারণের জন্যে আমি এসেছি। কিন্তু সঙ্গে আমার দণ্ড-অস্ত্র নেই, সৈন্যসামন্ত নেই, শুধু প্রেম নিয়ে, ভক্তি নিয়ে এসেছি। শুধু প্রেম-ভক্তিতেই এবার সকলের পাপক্ষয় করব, করব দুঃখজয়।'

'কিন্তু প্রভু, রাজা আসছে আমাদের সকলকে ধরে নিয়ে যেতে।' কে একজন বললে ভয়ের কথা।

নিমাই হাসল। বললে, 'কোনো ভয় নেই। প্রেম দিয়ে রাজার হৃদয়ও জয় করব দেখো।'

'অন্য অবতারে সব সৈন্য শস্ত্র সঙ্গে।
চৈতন্যকৃষ্ণের সৈন্য অঙ্গ-উপাঙ্গে॥'

অঙ্গ কী? নিমাইয়ের হাত-পা, নিমাইয়ের কৃপাকটাক্ষ। বাহুর উত্তোলন আর পদনৃত্যন্যাস। আর উপাঙ্গ কী? নামকীর্তন। বাহু তুলে হরি বলে প্রেম-দৃষ্টিতে তাকালেই জগত বশীভূত। নিমাইয়ের শ্রীঅঙ্গ শ্রীমুখ যে দেখবে সেই প্রেমধন পেয়ে যাবে। রাজা যাবে কোথায়?

'শ্রীঅঙ্গ শ্রীমুখ যেই করে দরশন।
তার পাপক্ষয় হয়, পায় প্রেমধন॥

তবু যেন কারু সন্দেহ যায় না। রাজা যে বিধর্মী, রাজা যে দুর্ধর্ষ।

নিমাই বললে, 'বেশ, আসুক রাজা। নিয়ে আসুক তার হাতি-ঘোড়া, সৈন্য-সামন্ত। সকলকে আমি কৃষ্ণ বলে কাঁদাব। প্রেমে বিকল বিহ্বল করে দেব সকলকে।'

'হস্তী ঘোড়া মৃগ পাখী একত্র করিয়া।
সেইখানে কান্দাইমু শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া॥
রাজার যতেক গণ রাজার সহিতে।
সভা কান্দাইমু কৃষ্ণ বলি ভাল মতে॥'

'কী, বিশ্বাস হয় না?' নিমাই সহসা উচ্চকণ্ঠে ডেকে উঠল, 'নারায়ণী! নারায়ণী।' নারায়ণী শ্রীবাসের ভাইঝি, বয়েস মোটে চার বছর। ডাক শুনে কাছে এসে দাঁড়াল।

নিমাই বললে, 'নারায়ণী, কৃষ্ণ বলে কাঁদো।'

হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! বলে তৎক্ষণাৎ কাঁদতে শুরু করল নারায়ণী। ছোট শিশু, তার চোখের জলে পৃথিবী ভেসে যেতে লাগল।

'দেখলে, দেখলে আমার কৃষ্ণনামের মহিমা।' নিমাই বললে গদ্গদ কণ্ঠে, 'তোমাদের রাজা আসুক, ধরুক আমাকে, তাকেও এমনি কৃষ্ণনামে বিগলিত করব।'

'কৃষ্ণ মন্ত্র হৈতে হবে সংসার মোচন।
কৃষ্ণ নাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥
নাম বিনু কলিকালে নাহি আর ধর্ম।
সর্বমন্ত্রসার নাম এই শাস্ত্রমর্ম॥'

হরি নামই কলির একমাত্র সাধন। সত্যযুগের সাধন ধ্যান, ত্রেতার সাধন যজ্ঞ, দ্বাপরের সাধন পরিচর্যা। কলিতে ধ্যান নয়, যজ্ঞ নয়, পরিচর্যা নয়, কেবল হরিনাম। সাধন ভক্তির পঞ্চ অঙ্গ। সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবতশ্রবণ, মথুরাবাস, শ্রীমূর্তিসেবন। 'এক অঙ্গ সাধে কেহো সাধে বহু অঙ্গ। নিষ্ঠা হৈলে উপজয়ে প্রেমের তরঙ্গ।' কিন্তু যে অঙ্গেরই সাধন করো, নামের আশ্রয় ছাড়া ফল নেই।

'কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই ত স্বভাব।
যেই জপে—তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব॥'

সুতরাং আত্মহারা হবেই কৃষ্ণনামে। হাসবে কাঁদবে নাচবে গাইবে। মান-অপমানের জ্ঞান থাকবে না, লজ্জা-জুগুপ্সা থাকবে না, থাকবে না লোকাপেক্ষা। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাবে। চার পুরুষার্থ, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ, তৃণতুল্য মনে হবে। ব্রহ্মানন্দকেও মনে হবে অকিঞ্চিৎ। ভক্তিই প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু। ভক্তিই পঞ্চম পুরুষার্থ।

শ্রীবাসের স্ত্রী মালিনী। সে আর তার তিন জা দাঁড়াল এসে

দরজায়। শ্রীবাসের কনিষ্ঠ ভাই শ্রীকান্তকে বললে, 'আমাদের ঠাকুর দর্শন করাও।'

'সে কি, তোমরা কুলবধূ, কোনোদিন দাঁড়াওনি অপরিচিতের সামনে।' শ্রীকান্ত প্রতিবাদ করল: 'তোমরা দেখবে কী!'

'যিনি আমাদের হৃদয়ে বাস করছেন, তিনি কি আমাদের অনাত্মীয়, অপরিচিত? তাঁকে গিয়ে নিবেদন করো আমাদের কথা।' মালিনী অনুনয় করতে লাগল।

শ্রীকান্তর সাহস হল না এই আবেদন নিয়ে দাঁড়ায় নিমাইয়ের সামনে।

নিমাই শুনতে পেয়েছে কাতরতা। বললে সস্নেহে, 'আসতে দাও। যারা আমাকে দেখবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে দাঁড়িয়েছে এসে দরজায়, তাদের আসতে দাও স্বচ্ছন্দে।'

মালিনী ও তার জায়েরা এসে সামনে প্রত্যক্ষে দেখতে লাগল নিমাইকে। অভিভূত হয়ে পড়ল পদতলে। তাদের মাথায় পা রাখল নিমাই।

'মৎপ্রাণা মৎপরায়ণা হও।' বরদ হাতে নিমাই আশীর্বাদ করল।

হে প্রভু, যতদিন তোমার হতে না পারি ততদিনই এ গৃহ কারাগৃহ, মোহপাশ পদশৃঙ্খলস্বরূপ। তুমি নিষ্প্রপঞ্চ হয়েও আমাদের আনন্দের জন্যে পৃথিবীতে প্রপঞ্চের অনুকরণ করছ। অতএব মমতার আস্পদ এই জগৎ ও দেহ তোমাকেই অর্পণ করলাম। যতদিন কল্প থাকবে ততদিন তোমাকে নমস্কার।

হঠাৎ নিমাই বিষ্ণুখট্টা থেকে উঠে পড়ল। বললে, 'এবার আমি যাই। সময় হলে আবার আসব।'

হুঙ্কার ছেড়ে মাটিতে পড়ল মূর্ছিত হয়ে।

এ কি, জীবনের চিহ্ন পর্যন্ত নেই! কে ছিল, কে চলে গেল দেহ ছেড়ে?

সবাই ব্যাকুল হয়ে সেবা করতে লাগল নিমাইকে। বাহ্যজ্ঞান

ফিরে আসতেই নিমাই ধীরে ধীরে চোখ মেলল। এ কী, নিমাই আবার রক্তমাংসের মানুষ হয়ে গিয়েছে। তাকে ঘিরে যে জ্যোতিঃসমুদ্র উচ্ছ্বসিত ছিল এতক্ষণ, তা স্তিমিত হতে হতে অন্তর্হিত হয়ে গেল।

নিমাই শ্রীবাসকে ডাকল : 'পণ্ডিত।'

শ্রীবাস উৎসুক হয়ে কাছে এল। শ্রীবাসও আর তুচ্ছ ভৃত্য নয়, সম্মানার্হ পণ্ডিত!

'পণ্ডিত, আমি এখানে কী করে এলাম?' বিস্ময়াবেশে চারদিকে তাকাতে লাগল নিমাই : 'কে আমাকে এখানে নিয়ে এল? এ কী, আমার গায়ে এত চন্দন কেন? কী, কথা নেই কেন মুখে? আমি কি ঘুমুচ্ছিলাম এতক্ষণ? স্বপ্ন দেখছিলাম?'

সবাই নির্বাক হয়ে রইল।

'তবে কি কৃষ্ণভাবে আচ্ছন্ন হয়ে চলে এসেছি?' নিমাই ব্যাকুল হয়ে উঠল : 'কৃপা করে বলো কোনো চাপল্য প্রকাশ করিনি তো?'

'না, কোনো চাপল্য প্রকাশ করনি।' সকলে আশ্বস্ত করল নিমাইকে।

নিমাই বাড়ি চলে গেল।

পরদিন ভোরে আবার নিমাইকে সকলে দেখল। একজন সাধারণ মানুষ ছাড়া আর সে কী! বড়-জোর মধুরস্বভাব বিনম্র এক ভক্তমাত্র। কেমন আর্ত হয়ে প্রার্থনা করছে দেখ। বলছে, হে কৃষ্ণ করুণাময়, আমাকে বিষয়বাসনা থেকে উদ্ধার করো। নিজে ঈশ্বর হলে কি আর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে?

'তথাপি বিষয়ের অভাব—করে মহা অন্ধ।
সেই কর্ম করায়, যাতে হয় ভববন্ধ॥
হেন বিষয় হৈতে কৃষ্ণ উদ্ধারিলেন তোমা।
কহেন না যায় কৃষ্ণকৃপার মহিমা॥'

যদি ভববন্ধন থেকে মুক্তি চাও, যদি কৃষ্ণভক্তি পেতে চাও, বিষয়ের সংস্রব থেকে দূরে থাকো। আর যার বিষয়সম্পত্তি আছে আগে

থেকে? সে কী করবে? বিষয়সম্পত্তি সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের, তাঁর ঐকান্তিক নিত্যকিঙ্করন্ধপে আমি তাঁরই বিষয়ের অবধায়কমাত্র—এই বিনয় নিয়ে সে বাস করবে। যতটুকু না করলে জীবনধারণ করা যায় না, ঠিক ততটুকুই ভোগ করবে। অতিরিক্ততাই বন্ধন।

হে প্রভু, তোমার কাছে শুধু আমার এক নিবেদন, এক বিজ্ঞাপন। শোনো, অবধান করো। যা বলছি তা মিথ্যে নয়, তা পরমার্থ, তা যথার্থ সত্য। যদি আমাকে তুমি না দয়া করো, তা হলে কোথাও আর কৃপাপাত্র পাবে না। একমাত্র পতিতই তো দয়ার পাত্র। তাকিয়ে দেখ আমার মত পতিত আর কে আছে? আমার মত দীনহীন, অধন-অধম?

'ন মৃষা পরমার্থমেব মে
শৃণু বিজ্ঞাপনমেকাগ্রতঃ
যদি মে ন দয়িষ্যসি তদা
দয়নীয়স্তব নাথ দুর্লভঃ॥'

'সত্য এক বার্তা কহোঁ—শুন দয়াময়।
মো বিনু দয়ার পাত্র জগতে না হয়॥
মোরে দয়া করি কর স্বদয়া সফল।
অখিলব্রহ্মাণ্ড দেখুক তোমার দয়াবল॥'

লোকশিক্ষার জন্যে যাই কেন না করো, তোমাকে আর ভুলছি না, দেখছি না ভুল করে। তুমিই স্বয়ং ঈশ্বর, প্রকৃতির অগোচর সর্বনিয়ন্তা আদি পুরুষ, তুমিই অন্তরহিত সর্বহন্তা কালস্বরূপ। যতই উদ্ধার করো বলে না কাঁদো তুমিই মৃত্যু-সংসারসাগরে সমুদ্ধর্তা। দৃষ্টি-দোষ ঘটলে যেমন নাট্যধর নটকে চেনা যায় না, তেমনি দেহাভিমানে জীব তোমার নির্ণয় করতে অসমর্থ। তুমিই বাসুদেব, তুমিই নন্দগোপ-কুমার গোবিন্দ। পদ্মনাভ কমলমালী পঙ্কজনয়ন হৃষীকেশ। সম্পদে মঙ্গল নেই, কৌলীন্যে ঐশ্বর্যে বিদ্যাবত্তায় বা সৌভাগ্যমদে মত্ত হয়ে মানুষ তোমার নামোচ্চারণ করতে ভুলে যায়। তুমি অকিঞ্চনের

ধন, যার কিছু নেই, কেউ নেই, তাকেই তুমি দর্শন দাও, তাকেই কৃপা কর। হে করুণাবলোকন, আমাদের দিকে তাকাও।

আর কেউ ভুল করল না। নরদেহে ভগবান এসেছেন। তাই তো চিত্ত সুখময়, জগৎ সুখময়।

মুসলমান-সৈন্যের ভয়ে মুরারি গুপ্ত ম্লান হয়ে আছে। তাকে আশ্বস্ত করা দরকার।

শ্রীবাসের ঘরে নিমাইয়ের সামনে স্তবপাঠ হচ্ছে। বরাহ-অবতারের স্তব যেই পড়া হল অমনি নিমাই হুঙ্কার করে উঠল। দ্রুতবেগে ছুটল মুরারির বাড়ির দিকে। মুরারির বাড়িতে ঢুকেই চেঁচিয়ে বলতে লাগল: শূকর! শূকর! মুরারি বাড়িতে ছিল, গর্জন শুনে সচকিত হল। কোথায় শূকর, ত্রস্ত হয়ে তাকাতে লাগল চারদিকে। মুরারিকে পিছনে ফেলে নিমাই তার পূজার ঘরে গিয়ে ঢুকল। দেখল সেখানে এক বৃহৎ জলপাত্র। নিমাই বরাহরূপ ধারণ করল, দাঁতে করে তুলল সেই জলপাত্র, গর্জন করতে লাগল। সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেল রূপ দেখে। নিমাইয়ের হাতে পায়ে চার খুর প্রকাশিত হয়েছে আর সেই চার পায়ে হাঁটছে মাটিতে।

নিমাই বললে, 'মুরারি, কোনো ভয় নেই। আমার স্তব করো।'

মুরারি স্তব করতে লাগল।

'তুমি খুব বেদ মানো, কিন্তু বেদ অন্ধ, সে আমার তত্ত্ব কী জানে?'

'তোমার তত্ত্ব শুধু তুমিই।' বললে মুরারি, 'অনন্ত ভুবন তোমার রোমকূপে। বেদ তোমার কী করে অন্ত পাবে? অন্ত পায় না বলেই তো অন্ধ।'

'কাশীতে বেদাচার্য প্রকাশানন্দ আমার অঙ্গ খণ্ড খণ্ড করছে। তার শুধু বেদব্যাখ্যা, সে ভক্তি মানে না, বিগ্রহ মানে না। মানে না ভক্তিই সমস্ত বেদসার।'

'তুমি তাকে জানাও।'

'জানাব। তুমিও জানো আর নির্ভয় হও। কার সৈন্য, কে বিধর্মী ?' নিমাই তাকাল অভয়নেত্রে। বললে, 'আমি এবার তবে যাই।'

বলতে বলতেই নিমাই মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলে বললে, 'মুরারি, আমি এখানে কী করে এলাম ?'

মুরারি স্তব্ধ।

মনে পড়ল নিমাইয়ের। 'শ্রীবাসের বাড়িতে আমি অবতারের স্তোত্র শুনছিলাম। শুনতে-শুনতে এখানে চলে এসেছি বুঝি ? কোনো চাপল্য করিনি তো ?'

'না, কোনো চাপল্য করোনি।' গম্ভীরস্বরে বললে শ্রীবাস।

নিমাই আবার ঘরে-ঘরে গিয়ে কাঁদতে লাগল। 'তোমরা সবাই কৃষ্ণের দাস, বলে দাও আমার কিসে কৃষ্ণে মতি হবে।'

আর ভুলছি না। তোমার দুই ভাব। কখনো ভক্ত-ভাব, কখনো ভগবান-ভাব। ভক্ত-ভগবান দুইই তুমি।

হে প্রভু, আমার সমস্ত স্নেহ খণ্ডন করো যাতে আমার চিত্ত কেবল তোমাতেই ধাবমান থাকে। নিয়ত বিপদে রাখো, তাহলেই থাকব তোমার শ্রীপদে। অবিদ্যার বশে বিষয়াভিলাষী হয়ে অনর্থক কাম্যকর্ম করে অশেষ যন্ত্রণা পাচ্ছি, সেই যন্ত্রণা দূর করবার জন্যেই তুমি অবতীর্ণ হয়েছ। তোমার চরিত্র শুনতে দাও, গান করতে দাও, নিরন্তর উচ্চারণ করতে দাও, চিন্তা করতে দাও, অন্তত অন্যের থেকে শুনে আনন্দিত হতে দাও।

যে ব্রহ্মতেজ চায় সে বেদপতি ব্রহ্মার উপাসনা করে, যে ইন্দ্রিয়ের পটুতা চায় সে ইন্দ্রের, যে সন্তান চায় সে প্রজাপতি দক্ষের, যে সৌভাগ্য চায় সে দুর্গার। যে ধনকামী সে বসুর উপাসক, যে বীর্যকামী সে রুদ্রের, যে রূপকামী সে গন্ধর্বের, যে স্বর্গকামী সে দ্বাদশ আদিত্যের। যে শত্রুর উচ্ছেদ চায় সে রাক্ষসকে ভজনা করবে, যে

পদভ্রংশের নিবারণ চায় সে করবে অন্তরীক্ষকে, যে বিঘ্ননাশ চায় সে যক্ষকে, সে রাজকার্য চায় সে মনুকে, যে শুধু আয়ু চায় সে অশ্বিনী-তনয়দ্বয়কে। আর যে ভক্তি চায়, ভগবদনুরাগ চায়, তার অর্চনীয় শুধু বিষ্ণু।

তার অর্চনীয় তুমি।

২৫

নিত্যানন্দ, ডাক নাম নিতাই, নিমাইয়ের চেয়ে আট-নয় বছরের বড়। জন্ম বীরভূম জেলার একচাকা গ্রামে। বাপের নাম হাড়াই পণ্ডিত বা হাড়াই ওঝা, মায়ের নাম পদ্মাবতী।

ব্রজের যে বলরাম সেই নিত্যানন্দ। শ্রীকৃষ্ণের বলরামকে চাই। তেমনি নিমাইয়ের নিত্যানন্দকে প্রয়োজন। বলরাম যেমন শ্রীকৃষ্ণের বিলাস তেমনি নিত্যানন্দ নিমাইয়ের। 'নিত্যানন্দরায় প্রভুর স্বরূপ-প্রকাশ।' নিত্যানন্দ নিমাইয়েরই আবির্ভাব-বিশেষ। 'সাক্ষাৎ হলধর।'

'ব্রজে যে বিহরে পূর্বে কৃষ্ণ-বলরাম।
কোটি সূর্য চন্দ্র জিনি দোঁহার নিজধাম॥
সেই দুই জগতেরে হইয়া সদয়।
গৌড়দেশে পূর্বশৈলে করিলা উদয়॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
যাঁহার প্রকাশে সর্ব জগত-আনন্দ॥'

সূর্য কী করে? অন্ধকার হরণ করে। আর প্রচ্ছন্নকে প্রকাশিত করে। তেমনি নিমাই-নিতাই দুভাই কী করে? অজ্ঞান হরণ করে। অজ্ঞান কী? তত্ত্বজ্ঞানের অভাবই অজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞান কী? শ্রীকৃষ্ণই

একমাত্র সেব্য আর কৃষ্ণেসেবা শুধু কৃষ্ণেরই প্রীতির জন্যে, এই জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান। আর ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের যে বাসনা, যার লক্ষ্য শুধু আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি, তাই অজ্ঞান। সংক্ষেপে, কৃষ্ণভক্তিকামনা ছাড়া অন্য কামনাই অজ্ঞান।

এই অজ্ঞানের নাম কৈতব। কৈতব মানে আত্মবঞ্চনা। জীব যখন ঐহিক বা পারত্রিক সুখ চায় তখনই সে নিজেকে প্রতারণা করে। নিত্য-শাশ্বত সুখ শুধু কৃষ্ণসেবায়, কৃষ্ণভক্তিতে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত হৃদয়ে নিজের সুখের বা দুঃখনিবৃত্তির ইচ্ছা, ততক্ষণ ভক্তি অনুপস্থিত।

মোক্ষবাসনাই শ্রেষ্ঠকৈতব। মায়াধীন জীব যদি নিজেকে মায়াধীশ ঈশ্বর মনে করে, তাহলে আর ভক্তি থাকে না, সেব্য-সেবকত্ব থাকে না। শুভাশুভ কর্মও কৃষ্ণভক্তির বাধক। শুভকর্মের প্রেরণাও আত্মসুখের বাসনা, আর পাপকর্মের উদ্দেশ্যও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি। কিন্তু কৃষ্ণভক্তিতে সুখবাসনার লেশ নেই।

সেই অজ্ঞান নাশ করে দু-ভাই—নিমাই-নিতাই। শুধু অজ্ঞানই নাশ করে না, প্রচ্ছন্নবস্তু, তত্ত্ববস্তুকেও প্রকাশ করে। তত্ত্ববস্তু কী? তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি আর নামকীর্তন। আর এ তত্ত্ববস্তুই আনন্দস্বরূপ।

কৃষ্ণভক্তির তিন স্তর। সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি আর প্রেমভক্তি। আর প্রেমভক্তিই প্রগাঢ়তমা।

দু ভাই আর কী করে? দুই ভাগবত সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দেয়। দুই ভাগবত কী? এক ভাগবত শাস্ত্র, আর এক ভাগবত ভক্ত। 'দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস। তাহার হৃদয়ে তার প্রেমে হয় বশ॥' ভাগবতসঙ্গ করিয়ে নিমাই-নিতাই ভক্তের বশীভূত হয়ে থাকে। ভক্তের কাছে ভগবানের স্বাতন্ত্র্য কই? ভক্তই ভগবানের হৃদয়, ভগবানও ভক্তের হৃদয়।

সূর্য-চন্দ্র একসঙ্গে ওঠেনা আকাশে। কিন্তু নিমাই-নিতাই একসঙ্গে উঠেছে—'সমকালে দোঁহার প্রকাশ।' আর সূর্য-চন্দ্র কি গিরিগুহার

অন্ধকার দূর করতে পারে ? পারে না। কিন্তু নিমাই-নিতাই মানুষের চিত্তগুহার অন্ধকার ক্ষালন করে। দুই ভাই 'হৃদয়ের ক্ষালে অন্ধকার।'

নবদ্বীপে গৌরের যেদিন জন্ম হল, সেদিন একচক্রায় নিতাই হুঙ্কার করে উঠল। কেউ ভাবল বজ্রপাত হল বুঝি। কেউ ভাবল বা কামানের গর্জন। কোথায়, কতদূরে ?

শিশুকালে ভগবৎলীলার খেলা খেলে নিতাই। বসুদেব-দেবকীর বিয়ে দেয়। কারাগার তৈরি করে সকলে মিলে ঘুমোয়, বসুদেব কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে বেরিয়ে আসে। শকট তৈরি করে তা আবার ভেঙে ফেলে। অন্যান্য শিশুদের বক, অঘ, ধেনুক সাজিয়ে কৃষ্ণরূপে তাদের নিধন করে। কোনোদিন বা আঙুলে করে পাহাড় তুলে ধরার কসরৎ দেখায়। এত সব কৃষ্ণবাল্যলীলা শিখল কোথায়, কে বলবে ?

কখনো বা লক্ষ্মণের খেলা খেলে। ইন্দ্রজিতবধের লীলা করে। কোনো দিন বা শক্তিশেলের আঘাতে মূর্ছা যায়। হনুমানকে দিয়ে গন্ধমাদন আনিয়ে ওষুধ খেয়ে উঠে বসে। রাবণকে মেরে বিভীষণকে রাজ্য দিয়ে সীতাকে নিয়ে অযোধ্যায় যাত্রা করে। দেশে গিয়ে চার ভাই একত্র হয়।

নিতাইয়ের বয়েস যখন বারো, তখন বাড়িতে এক সন্ন্যাসী এসে উপস্থিত।

নিতাইকে দেখে তার চমক লাগল। তার বাপ হাড়াইকে জিগগেস করল, 'কে এ ?'

'আমার ছেলে।'

'নাম কী ?'

'কুবের।'

হাসল সন্ন্যাসী। বললে, 'এ সদানন্দ শিশু আর নিত্যের প্রতি অভিমুখী, সুতরাং এ-ছেলের নাম নিত্যানন্দ।'

রাত্রে অতিথি হল সন্ন্যাসী। সকালে উঠে হাড়াইকে বললে, 'আমি একটি ভিক্ষে চাই।'

'কী চাই বলুন।'

'দেবে?'

'দেব।'

'তোমার এই ছেলেটিকে চাই। চিরকালের জন্যে নয়, কিছু দিনের জন্যে। কিছুদিন পরে আবার ও ফিরে আসবে।'

হাড়াই পণ্ডিত কথা রাখল। পদ্মাবতীও বাধা দিল না!

সন্ন্যাসীর সঙ্গে নিতাই বেরুল তীর্থভ্রমণে। প্রথমে বক্রেশ্বর, সেখান থেকে বৈদ্যনাথ, সেখান থেকে গয়া হয়ে কাশী, শিবরাজধানী। গঙ্গা দেখে বড় খুশি নিতাই, স্নান করে, পান করে, তবু যেন আর্তি যায় না। সেখান থেকে প্রয়াগ। প্রয়াগ থেকে পূর্বজন্মস্থান মথুরায়। যমুনার বিশ্রামঘাটে জলকেলি করে, গোবর্ধনপর্বতে গিয়ে বসে থাকে। দ্বাদশবন পরিক্রমা করে বৃন্দাবনে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে কাঁদে। কোথায় কৃষ্ণ? সন্ন্যাসী কিছু বুঝতে পারে না—কেন এই কান্না? কী করে বুঝবে? সে তো ভক্তির পথের যাত্রী নয়।

নিতাই অবধূত সেজেছে। কিন্তু শিবকে বুকে নিলেও হৃদয়ে বাসুদেব।

তারপরে হস্তিনাপুর। 'বলরামকীর্তি দেখি হস্তিনানগরে। ত্রাহি হলধর, বলি নমস্কার করে॥' সেখান থেকে দ্বারকায়। তারপরে প্রভাস, নৈমিষারণ্য হয়ে অযোধ্যায়। সেখান থেকে গঙ্গাজন্মভূমি হরিদ্বার। তারপর ঘুরতে ঘুরতে দ্রাবিড়ে, দক্ষিণে। আবার—উত্তরে বদরিকাশ্রমে। এমনি তীর্থ থেকে তীর্থান্তরে ঘুরতে লাগল নিতাই। 'নিরন্তর কৃষ্ণাবেশে শরীর অবশ। ক্ষণে কান্দে ক্ষণে হাসে, কে বুঝে সে রস॥'

একদিন স্বামী শঙ্করারণ্যের সঙ্গে দেখা। খুব ভাব হয়ে গেল তার সঙ্গে। কী তার পূর্বাশ্রমের নাম-ঠিকানা জানতে চাইল নিতাই।

শঙ্করারণ্য বললে, পূর্বাশ্রমে তার নাম ছিল বিশ্বরূপ, বাড়ি নবদ্বীপ। জগন্নাথ মিশ্র তার পিতা আর তার একটি ভাই আছে, নাম বিশ্বম্ভর, ডাকে সবাই নিমাই বলে। কেউ বা বলে গৌর, গোরা, গৌরাঙ্গ। যদি যাও কোনোদিন নবদ্বীপে, তাকে দেখে এস।

'অমিয়া মথিয়া কে বা লবনি তুলিল গো,
তাহাতে গড়িল গোরা-দেহ।
জগত ছানিয়া কে বা রস নিঙ্গাড়িল গো,
এক কৈল সুধই সুলেহ॥'

পরে দেখা মাধবেন্দ্র পুরীর সঙ্গে। যার কৃষ্ণরস বিনা আহার নেই, কৃষ্ণের বিহার যার দেহে-মনে। ভক্তিরসের যে আদিম সূত্রধার। আকাশে মেঘ দেখলেই যে অচেতন হয়, কৃষ্ণপ্রেমে যে মদ্যপের মত ব্যবহার করে। পরস্পর পরস্পরকে দেখে প্রেমে নিস্পন্দ হয়ে গেল, কাঁদতে বসল গলা ধরে। ঈশ্বরপুরী ও অন্যান্য শিষ্যরাও কাঁদতে লাগল।

নিত্যানন্দ বললে, 'যত তীর্থ করলাম এতদিন তার সম্যক ফল আজ মিলল। প্রেমময় কলেবর মাধবেন্দ্রকে দেখলাম। দেখলাম প্রেম কাকে বলে।'

মাধবেন্দ্র বললে, 'কৃষ্ণ যে আমার প্রতি কৃপালু তা এতদিনে বুঝলাম, নিত্যানন্দের মত তিনি বন্ধু জুটিয়ে দিলেন। যেখানে নিত্যানন্দের প্রেম সেখানেই সর্বতীর্থময় বৈকুণ্ঠ।'

কৃষ্ণনামে যার অনুরাগ হয়েছে তার চিত্তে আর কৌটিল্য নেই, কাঠিন্য নেই। সে দ্রুতচিত্ত অর্থাৎ তার চিত্ত দ্রবীভূত হয়েছে। সে তখন 'উন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ।' লোকে কী বলবে—এর আর সে ধার ধারে না, সে তখন উন্মাদের মত নাচে, হাসে, কাঁদে, গান গায়, আর্তনাদ করে। বাজিকরের হাতে যেমন পুতুল তেমনি অনুরাগের হাতে ভক্তচিত্ত। 'সেই কৃষ্ণনাম কভু গাওয়ায় নাচায়। গাই নাচি নাহি আমি আপন ইচ্ছায়॥'

মাধবেন্দ্রের সঙ্গ করে কত দিন চলে গেল খেয়াল নেই—নিতাই চলল সেতুবন্ধ। ধনুতীর্থে স্নান করে পৌঁছুল রামেশ্বরে। সেখান থেকে ঘুরে ঘুরে নীলাচলচন্দ্রের নগরে। ধ্বজা দেখেই মূর্ছা গেল। আবার জগন্নাথকে দেখে মূর্ছা।

নীলাচল থেকে গঙ্গাসাগর। আবার সেখান থেকে পুনর্বার মথুরায়। হাঁটতে-হাঁটতে বৃন্দাবন।

সেখানে আবার ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে দেখা।

'এখানে কাকে এত খুঁজছ?' জিগগেস করল ঈশ্বর।

'জানোনা কাকে? সেই কোটিমদনবিমোহন অখিললক্ষ্মীচিত্তহারী কৃষ্ণকে।' বললে নিতাই।

'সে এখানে কোথায়?' বললে ঈশ্বর, 'সে নবদ্বীপে।'

'নাম কী?'

'নিমাই পণ্ডিত।'

'কার ঘর?'

'শচীমাতার ঘর।'

'আমি জানি। প্রভুর প্রকাশ হয়েছে নবদ্বীপে।'

আর কথা নেই। নবদ্বীপের দিকে ছুটল নিতাই।

নিমাই পণ্ডিতের কোন বাড়ি? জ্যৈষ্ঠের রোদ মাথায় করে পথ দিয়ে হাঁটছে নিতাই আর জনে-জনে জিগগেস করছে, নিমাই পণ্ডিতের বাড়ি কোথায়?

সবাই দেখিয়ে দিচ্ছে পথ, নিতাই শেষ পর্যন্ত নিমাইয়ের বাড়িতে না গিয়ে উঠল এসে নন্দন আচার্যের ঘরে।

'গত রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখেছি,' সঙ্গীদের বলছে নিমাই, 'আমার বাড়িতে এক রথ এসে দাঁড়িয়েছে। রথ থেকে নামল এক মহাপুরুষ, প্রকাণ্ড শরীর, কাঁধের উপর বিশাল এক স্তম্ভ। পরনে নীলাম্বর, মাথায়ও নীলবস্ত্র বাঁধা। অবধুতের বেশ, তেজস্কর মুর্তি। প্রবলকণ্ঠে জিগগেস করল আমাকে, এটা কি নিমাই পণ্ডিতের বাড়ি? আমি

বললুম, 'তুমি কে? কোন মহাজন?' সন্ন্যাসী বললে, 'ভাই হয়ে ভাইকে চিনতে পাচ্ছ না? বেশ, কাল পরিচয় হবে।' নিমাই তাকাল সঙ্গীদের দিকে: 'তোমরা যাও, মহাপুরুষকে খুঁজে নিয়ে এস। নিশ্চয়ই সে এসেছে নবদ্বীপে, আত্মগোপন করে আছে।'

বলতে বলতেই বলরামের আবেশ এল নিমাইয়ে, সে গর্জন করে উঠল, 'মদ আনো, মদ আনো।'

সঙ্গীরা ব্যস্ত হয়ে উঠল। এ কী বলছে নিমাই? মদ পাব কোথায়? মদ দিয়ে কী হবে? নিমাই খাবে? খাওয়াবে সকলকে?

শ্রীবাস বললে, 'প্রভু, মদ তো তোমার কাছে।'

'আমার কাছে?'

'হ্যাঁ, সেই মদের মালিক তুমি। আর সেই মদিরার নাম প্রেম।'

হাসতে লাগল নিমাই।

শ্রীবাস বললে, 'অন্য লোক সে মদের নাগাল পাবে কি করে, যদি তুমি না বিতরণ করো।' 'তুমি যাকে বিলাও সেই সে তারে পায়।' 'আস্বাদ দূরে রহু যার গন্ধে মাতে মন। আপন বিনু অন্য মাধুর্য করায় বিস্মরণ॥' শুধু তোমার দয়া, তুমি সেই মদগন্ধেই মাতোয়ারা করে দিতে পারো। আর যদি আস্বাদের অধিকারী হতে দাও, তা হলে তো কথাই নেই, উচ্ছিষ্টই আমার মহাপ্রসাদ।

হে আর্তবান্ধব, আমাদের কথা শোনো। তুমিই তো একমাত্র নিগ্রহানুগ্রহে সমর্থ, তুমিই তো কৃপালু। আর পরদুঃখবিমোচনের ইচ্ছাই তো কৃপা। কিন্তু তুমি তো দেখছি বাঁশি বাজাতে ব্যস্ত। তোমার মধুর মুরলীরবে তুমি নিজেই বিভোর। সেই সুধালহরী ভেদ করে আমাদের আর্তনাদ কি তোমার কানে পৌঁছুবে? কই আর পৌঁছুচ্ছে? অবিদ্যার প্রভাবে আর্তি যে ঠিক ঠিক প্রকাশ করতে পারছি না। কিন্তু তুমি তো কৃপাময়, সর্বশ্রুতিমান, সর্বরক্ষণে সমর্থ। সুতরাং বিশ্বাস করে আছি, তুমি শুনবে। তোমার কাছে আমাদের ক্ষীণস্বরও গ্রাহ্য।

নিমাই সঙ্গীদের বললে, 'তোমরা ঘুরে-ঘুরে দেখ, খোঁজ করো, কোথায় সেই মহাপুরুষ আশ্রয় নিয়েছেন।'

নন্দন আচার্যের ঘরে নিতাই উন্মুখ হয়ে মুহূর্ত গুনছে।

হে ভুবনৈকবন্ধো, হে করুণৈকসিন্ধো, তুমি কোথায়? অধরবিম্বে মধুর, মন্দ হাসে মঞ্জুল, অমৃতনাদে শিশির, দৃষ্টিপাতে শীতল, অরুণনেত্রে বিপুল, বেণুধ্বনিতে বিশ্রুত—হে মরকতমণিনাভ নবকিশোর, কবে দেখব তোমাকে?

ফিরে এল নিমাইয়ের সঙ্গীরা, মুরারি মুকুন্দ শ্রীবাস আর নারায়ণ। বললে, 'নগর তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি, কোথাও মহাপুরুষের দেখা পেলাম না।'

'সব বাড়ি খুঁজেছ?'

'সব। বৈষ্ণব, সন্ন্যাসী, গৃহস্থ, কোনো ঘরই বাদ দিইনি। এমন কি পাষণ্ডীদের ঘরও দেখে এসেছি! কোথাও কেউ নেই।'

মনে মনে হাসল নিমাই। 'বড় গূঢ় নিত্যানন্দ।' 'দুর্বিজ্ঞেয় নিত্যানন্দ।'

'তুরীয় বিশুদ্ধসত্ত্ব সঙ্কর্ষণ নাম।
তেঁহো যার অংশ—সেই নিত্যানন্দ রাম॥'

যিনি সকলের আশ্রয়, সকলের অধ্যক্ষ, সকলের আশ্চর্য, বিশুদ্ধসত্ত্ব সঙ্কর্ষণ তাঁরই অংশ। আর সেই সঙ্কর্ষণই বলরাম। আর সেই বলরামই নিত্যানন্দ।

ত্রেতায় আবার সেই ছিল লক্ষ্মণ। আগে ছোট ভাই, এবারে বড়। ছোট-বড় দুই হয়েই কৃষ্ণের সেবা।

'নিত্যানন্দস্বরূপ পূর্বে হইলা লক্ষ্মণ।
লঘু ভ্রাতা হৈয়া করে রামের সেবন॥'

নিমাই বললে, 'চলো আমিও যাই। আরেকবার খুঁজি।'

তাই চলো।

নিমাই সোজা নন্দন আচার্যের ঘরের দিকে রওনা হল।

'ওদিকে কোথায় যাচ্ছ ?' অনুগামীরা প্রশ্ন করল।

'চতুর্ভুজ পণ্ডিতের ছেলে, আমার কীর্তনের সঙ্গী, নন্দন আচার্যের বাড়ি।' নিমাই তাকাল ভক্তদের দিকে : 'খোঁজ করেছিলে ওখানে ?'

ভক্তবৃন্দ পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। বাড়ির ভিতরে ঢুকে সবাই দেখল বিশালবপু এক সন্ন্যাসী বসে আছে। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, নলিননেত্র, জ্যোতিষ্মান মধুর মূর্তি। মাথায় নীলবস্ত্র, পরিধানেও নীলাম্বর। আনন ধ্যানসুখে পরিপূর্ণ, সদাহাস্যপ্রসন্ন।

নিমাই চিনল। এই তো সেই তার স্বপ্নের মহাপুরুষ। তার 'প্রাণের ঈশ্বর', নিত্য আনন্দের উৎসার, নিত্যানন্দ।

আর নিতাই এ কাকে দেখছে ? দণ্ড নেই, কমণ্ডলু নেই, পরনে ডোরকৌপীন নেই, নাগরবেশে এ কে মাধুর্যবারিধি ! কে এই সর্ব-প্লাবক উচ্ছলিত সুধা ! নিতাই স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইল নিমাইয়ের দিকে।

'রসনায় লেহে যেন দরশনে পান।
ভুজে যেন আলিঙ্গন নাসিকায়ে ঘ্রাণ।
এইমত নিত্যানন্দ হইল স্তম্ভিত।
না বোলে না করে কিছু, সভেই বিস্মিত ॥'

নিমাই শ্রীবাসকে বললে, 'ভাগবতের একটি বচন পড়ো।'

শ্রীবাস তখুনি কৃষ্ণবর্ণনার এক শ্লোক পড়ল :

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং।
বিভ্রদবাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাং ॥
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ।
বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্‌গীতকীর্তিঃ।

নটবরসুন্দর কৃষ্ণ বৃন্দাবনে প্রবেশ করছে। তার মাথায় শিখিপুচ্ছ, উভয়কর্ণে কর্ণিকার ফুল, পরনে পীত নীল বস্ত্র, গলায় বৈজয়ন্তী। অধর-সুধায় বেণুর ছিদ্রগুলো ভরে ভরে দিচ্ছে। আর যেখানেই পা রাখছে সেখানেই চরণচিহ্নে জাগছে রতি প্রীতি আনন্দ।

শ্লোক শুনেই নিতাই মূৰ্ছিত হয়ে পড়ল। যদি বা জ্ঞান হল, কাঁদতে লাগল, ধুলিতলে গড়াগড়ি খেতে লাগল। অদ্ভুত কৃষ্ণোন্মাদ আনন্দে লাফাতে লাগল। সাধ্যি নেই কেউ তাকে ধরে রাখে। তখন কী হল ? তখন নিমাই এগিয়ে গিয়ে স্পর্শ করল নিতাইকে।

স্পর্শ করতেই নিতাই নিস্পন্দ হয়ে গেল। আর নিমাই তখুনি তাকে টেনে নিল কোলের মধ্যে। আর কাঁদতে লাগল অনর্গল।

'ভাসে নিত্যানন্দ চৈতন্যের প্রেমজলে।
শক্তিহত লক্ষ্মণ যেহেন রামকোলে॥'

নিতাইও অশ্রুবিহ্বল। আর অনুচরেরা ? তারা নিত্যানন্দময়। 'যে অনন্ত নিরবধি ধরে বিশ্বম্ভর। আজি তাঁর গর্ব চূর্ণ—কোলের ভিতর॥'

কতক্ষণ পরে দুই ভাই শান্ত হয়ে বসল। নিমাই বললে, 'আজ আমার জন্ম সার্থক, ভক্তি কাকে বলে দেখলাম স্বচক্ষে। এই কম্প আর অশ্রু, আর এই গর্জন-হুঙ্কার ঈশ্বরশক্তি ছাড়া হবার নয়। তুমিই মূর্তিমন্ত কৃষ্ণপ্রেম। তোমাকে ভজনা করলেই জীবের কৃষ্ণভক্তি মিলবে। তোমার তিলার্ধ যে সঙ্গ করবে তার পাপের বাষ্প পর্যন্ত থাকবে না। তোমাকে যখন মিলিয়ে দিলেন, তখন আর ভয় নেই, কৃষ্ণ উদ্ধার করবেন আমাকে। তুমি চতুর্দশ ভুবন পবিত্র করতে পারো, আমি তো কোন ছার ! আমি তোমার কৃপাপ্রার্থী। আমাকেও দাও কৃষ্ণপ্রেম।'

স্তুতি শুনে লজ্জিত হল নিতাই। বিনম্রবচনে বলতে লাগল, 'অনেক তীর্থ ঘুরে আসছি। যত কৃষ্ণস্থান আছে দেখেছি। স্থানমাত্র দেখি, কৃষ্ণ দেখি কই ? সবাইকে জিগগেস করি, কৃষ্ণের সিংহাসন পড়ে আছে, কৃষ্ণ কোথায় ? কোন দেশে পালাল ? 'কৃষ্ণ গেলা কোন ভিত ?' কেউ কেউ বললে, কৃষ্ণ নবদ্বীপে গিয়েছে। তাই এখানে এসেছি। শুনেছি নবদ্বীপে পতিতের ত্রাণ হবে এবার, তাই, আমি পাতকী, ছুটে এসেছি এখানে।'

ভক্ত অনুগামীর দল দেখতে লাগল ছুজনকে। কেউ বললে, মাধব-শঙ্কর। কেউ বললে, কৃষ্ণ-বলরাম। যেন ছুজনের কতদিনের নিগূঢ় পরিচয়। ঠারে-ঠোরে তাই আলাপ করছে ছুজনে। সাধ্য কি তার এক বর্ণও কেউ বোঝে!

নিতাই বলছে, কানাই, তোর চূড়া কই, বাঁশি কই?

নিমাই বলছে, কই বা তোমার লাঙল-গরু? ব্রজের খেলা দৌড়োদৌড়ি, নদের খেলা গড়াগড়ি।

নিতাই বলছে, ব্রজের খেলা বাঁশির তান।

নিমাই বলছে, নদের খেলা হরিগান।

'ব্রজের বেশ ধড়াচূড়া।' বলছে নিতাই।

'নদের বেশ কৌপীন পরা।' বলছে নিমাই।

'কেহো বলে তুইজনে বড় পরিচয়।
কিছু না বুঝিয়ে—সব ঠারে কথা কয়॥'

'এবার উঠুন।' নিমাই নিত্যানন্দকে বললে, 'নবদ্বীপের প্রতি যে আপনার করুণা হয়েছে, এই আমাদের মহাভাগ্য।'

ভূমিতল থেকে উঠে দাঁড়াল নিতাই। চলল নিমাইয়ের পিছে পিছে।

নিমাই বললে, 'কাল আষাঢ়-পূর্ণিমা, গুরুপূর্ণিমা। ভগবান ব্যাসের আবির্ভাব-তিথি। আপনার ব্যাসপূজা কোথায় হবে?'

নিমাইয়ের কাছ থেকেই অগোচরে ইঙ্গিত পেল নিতাই। শ্রীবাসকে দেখিয়ে বললে, 'আমার ব্যাসপূজা এই বামুনের ঘরে হবে।'

'কি হে শ্রীবাস, তোমার কোনো অসুবিধে হবে না তো?' নিমাই জিগগেস করল।

'না, না, অসুবিধে কী?'

'তোমার উপর বোঝা চাপানো হবে।'

'না, না, সমস্ত ঘৃত-দুগ্ধ আমার বাড়িতে আছে।' বললে শ্রীবাস, 'একমাত্র পূজার পদ্ধতি আমার জানা নেই। কারু কাছ থেকে চেয়ে

আনব পুঁথি। বরং এ তো আমার ভাগ্য। সন্নেসীর ব্যাসপূজা দেখব। আগে দেখিনি কোনোদিন।'

সকলে তখন শ্রীবাসের বাড়ি গেল।

নিমাই বললে, 'কপাট দাও। কীর্তন সুরু করো। ব্যাসপূজার অধিবাসের উল্লাসকীর্তন।'

সন্ধে হয়েছে। সমবেত কণ্ঠে কীর্তন উঠল। হাত ধরাধরি করে নাচতে লাগল নিমাই নিতাই।

কখনো বা কাঁদছে, কোলাকুলি করছে, কখনো বা পরস্পরের পা ধরতে চাইছে। কখনো গর্জন, কখনো রোদন, কখনো মূর্ছা। কখনো বা উল্লাসে মহামত্ত।

বলরাম ভাব ধরল নিমাই। বিষ্ণু-খট্টায় গিয়ে বসল। নিতাইকে বললে, 'আমাকে হল-মুষল দাও।'

হাত পাতল নিমাই। নিতাই যেন তাতে কী দিল হাতে করে। কেউ-কেউ দেখল স্পষ্ট হল আর মুষল দিল নিত্যানন্দ।

হঠাৎ আবার গর্জন করে উঠল নিমাই: 'মদ আনো, মদ আনো।'

শ্রীবাস একপাত্র গঙ্গাজল এগিয়ে দিল। তাই যেন মদ, তেমনি করে আনন্দবিভোর হয়ে খেল নিমাই।

সহসা আবার হুঙ্কার করে উঠল: 'নাড়া কই? আমার নিত্যানন্দ এসেছেন, নাড়া এখনো আসছে না কেন?'

'কে নাড়া?'

'নাড়াকে চেননা? অদ্বৈত আচার্যকে আমি নাড়া বলে ডাকি। সেই তো আমাকে ডেকে এনেছে বৈকুণ্ঠ থেকে। সে কি এখন আমাকে ছেড়ে থাকতে পারে শান্তিপুরে? তাকে ডেকে নিয়ে এস। আমি যে ঘরে ঘরে কীর্তন প্রচার করে বেড়াব। দীনহীনকেও বিলাব হরিভক্তি! নাড়া না এলে আমার ষোলকলা পূর্ণ হবে কী করে?'

বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলে নিমাই বললে, 'আমি কি কিছু চাপল্য করেছি? কিছু কি প্রলাপ বকেছি?'

'না, না,' সবাই আশ্বস্ত করল নিমাইকে : 'তুমি যেমন ছিলে তেমনিই আছ।'

'আমি বালক, আমার কোনো অপরাধ নিওনা।'

'তুমি কমনীয় কিশোর।'

২৬

সকালে ব্যাসপূজা, রাত্রে কী ভাব হল নিতাইয়ের, হুঙ্কার করে উঠে দণ্ড-কমণ্ডলু ভেঙে ফেলল।

দণ্ড-কমণ্ডলু সন্ন্যাসের চিহ্ন। যারা সন্ন্যাসী তারা যোগমার্গী, কৈবল্যকামী। তাদের ভাগবতী প্রীতি কাম্য নয়, তাদের কাম্য মোক্ষ। কিন্তু ভক্তের লক্ষ্য কৃষ্ণপাদমূল। প্রবাস থেকে ফিরে পথিক তার নিজের ঘরেই সর্বক্লেশের উপশম পায়। তখন সে ঘর আর সে ছাড়ে না। তেমনি সমস্ত কামনাক্লেশ থেকে মুক্ত হয়ে ধৌতাত্মা ভক্ত কৃষ্ণপাদমূলেই তার সমগ্র বিশ্রাম পায়। তখন আর সেই চরণাশ্রয় সে ছাড়ে না।

ভোরবেলা শ্রীবাসের ভাই রামাই পণ্ডিত খবর দিল নিমাইকে।

কী ব্যাপার, নিমাই ছুটল শ্রীবাসের বাড়ি।

গিয়ে দেখল, নিতাইয়ের বাহ্যজ্ঞান নেই, শুধু আপন মনে হাসছে।

'চলো, আমার সঙ্গে গঙ্গাস্নানে চলো।' নিতাইকে নিয়ে স্নানে চলল নিমাই। আর নিজ হাতে নিমাইয়ের ভাঙা দণ্ড-কমণ্ডলু গঙ্গায় বিসর্জন দিল।

'আজ ব্যাসপূজা। তাড়াতাড়ি স্নান করে নাও।' বিহ্বল নিতাইকে মনে করিয়ে দিল নিমাই : 'আর চাঞ্চল্য কোরো না।'

স্নান করে নিমাই-নিতাই চলল শ্রীবাসের ঘরে।

শ্রীবাস নিজেই পুজো করছে। আর সব ভাগবতেরা মিলে কীর্তন জুড়েছে, মেতেছে নৃত্যানন্দে। পূজান্তে নিতাইয়ের হাতে এক গাছা ফুলের মালা দিল শ্রীবাস। বললে, 'এই মালা নাও, মন্ত্র পড়ে ব্যাসদেবকে দাও আর প্রণাম করো।'

নিতাই নিলনা মালা।

শ্রীবাস বললে, 'শাস্ত্রের বিধান, নিজের হাতে মালা দিতে হবে। মালা পেলে ব্যাস খুশি হবেন আর তোমার আকাঙ্ক্ষা সফল করবেন।'

কিসের মালা, কোথায় ব্যাস, অভিভূতের মত নিতাই তাকিয়ে রইল।

'নাও, মালা ধরো।' শ্রীবাস আবার তাড়া দিল : 'আমি দিলে হবে না। তোমার পুজো তোমাকেই করতে হবে।'

নিতাই মালা ধরল। কিন্তু মন্ত্র কী, মনে করতে পারল না।

কত ব্যাসপূজা করেছে আগে অথচ কিছুই এখন স্মরণে নেই।

নিমাই কোথায়? তাকে ডাকো। সে এর বিহিত করুক।

আঙিনায় কীর্তনিয়াদের সঙ্গে ভিড়েছে নিমাই। দেখুন এসে নিতাই কী রকম করছে। ব্যাসপূজা করছে না।

'সে কী? পুজো করো। ব্যাসের গলায় মালা দাও।' নিমাই আদেশ করল।

মুহূর্তে হাতের মালা নিতাই নিমাইয়ের গলায় উপহার দিলে। আর তক্ষুনি নিমাই ষড়ভুজ মূর্তি ধারণ করল। আর সেই মূর্তি দেখে মূর্ছিত হল নিতাই।

'প্রভু বোলে 'নিত্যানন্দ, শুনহ বচন।
মালা দিয়া ঝাট করো ব্যাসের পূজন॥'
দেখিলেন নিত্যানন্দ—প্রভু বিশ্বম্ভর।
মালা তুলি দিলা তাঁর মস্তক-উপর॥
চাঁচর-চিকুরে মালা শোভে অতি ভাল।
ছয়-ভুজ বিশ্বম্ভর হইলা তৎকাল॥

শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শ্রীহল মুষল।
দেখিয়া বিস্মিত হৈলা নিতাই বিহ্বল॥
ষড়ভুজ দেখি মূর্ছা পাইল নিতাই।
পড়িলা পৃথিবীতলে ধাতু মাত্র নাই॥'

নিতাইয়ের গায়ে হাত বুলুতে লাগল নিমাই। বললে, 'ওঠো, কীর্তন করো। যার জন্যে তুমি এসেছে সেই প্রেমভক্তি বিতরণ করো। যাকে খুশি তাকে দাও, ঢেলে দাও সর্বঘটে। প্রেম দিয়ে পৃথিবীর পিপাসা নিবারণ করো। উদ্ধার করো বসুন্ধরা।'

বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেল নিতাই। কিন্তু সম্যক জ্ঞানে সে নিমাইয়ের দাস, নিমাইয়ের সেবক। কখনো ছোট ভাই হয়ে লক্ষ্মণ কখনো দাদা হয়ে বলরাম। আর সেবকের যে আদর করে না তার বিষ্ণুস্থানে অপরাধ। যে লক্ষ্মণমন্ত্র জপ না করে শুধু রামমন্ত্র জপ করে তার সর্বচেষ্টা অফলা।

'ভক্ত ভেদে রতিভেদ, পঞ্চ পরকার।' শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য আর মধুর। শান্ত-রতির গুণ কৃষ্ণনিষ্ঠা। আর কৃষ্ণে তার মমত্ব-বুদ্ধি নেই, শুধু পরমাত্মাবুদ্ধি। শান্ত-রতি প্রেম পর্যন্ত যায়।

দাস্য-রতির গুণ সেবা। কৃষ্ণনিষ্ঠা তো আছেই, আছে মমত্ব-বুদ্ধি। আর কৃষ্ণ আমার প্রভু আমি তার দাস, আছে আবার সেই সম্ভ্রমবোধ। আমি কি যে-সে পাত্র? আমি কৃষ্ণের কৃপাপাত্র। তাই দাস্যরতি যায় প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয় ও রাগ পর্যন্ত।

সখ্যরতিতে সমত্ববোধ, বিশ্বাস-বিস্তার। যে উচ্ছিষ্ট ফল দাস্যে দেওয়া যায় না তাই দেওয়া যায় সখ্যে। দাস্যে কৃষ্ণকে বড় মনে করে, সখ্যে সমান-সমান। তাই সখ্যরতি যায় প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ ও অনুরাগ পর্যন্ত।

বাৎসল্যরতিতে হীনত্ববোধ। কৃষ্ণই তখন অনুগ্রহের পাত্র, আশীর্বাদভাজন। কৃষ্ণ অবোধ, ভালো-মন্দ সে কী জানে কী বোঝে, আমার উপরেই তার নির্ভর, এই বুদ্ধিতে ভক্ত গরীয়ান। বাৎসল্যে

আর বিশ্বাস নয়, অনুগ্রহ। দাস্যের সেব্য সেবক নয়, বাৎসল্যে পাল্য-পালক। প্রয়োজনবোধে তাড়নভর্ৎসন। তাই বাৎসল্যরতি যায় প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগের শেষ সীমা পর্যন্ত।

মধুর রতিতে 'অতিশয় সেবা,' দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যের সেবার চেয়েও বেশি। শান্তের নিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের অসঙ্কোচ, বাৎসল্যের লালন তো আছেই, সর্বোপরি নিজাঙ্গ দিয়েও সেবন আছে। এ ভাব প্রেয়সীর ভাব, কৃষ্ণবাঞ্ছার মূর্তির বাইরে যার আর কোনো আরাধন নেই। কৃষ্ণের প্রীতিবিধানই এ ভাবের সার কথা। তা দেহ দিয়েই হোক গেহ দিয়েই হোক আর লেহ দিয়েই হোক। তাই মধুররতি যায় মহাভাব পর্যন্ত।

নিত্যানন্দের কী কথা ? নিত্যানন্দের কথা, 'চৈতন্য ঈশ্বর, মুঞি তাঁর একজন।' 'মুক্তি তাঁর, সেহো মোর ঈশ্বর সর্বথা।' 'নিত্যানন্দ অবধূত—সভাতে আগল। চৈতন্যের দাস্য প্রেমে হইলা পাগল ॥'

'মা, দেখ, দাদা এসেছে।' বাড়ি এসে নিমাই ডাকল মাকে।

'কে, বিশ্বরূপ এসেছে ?' শচী ব্যাকুল হয়ে ছুটে এল।

'দেখ, দাদাকে এনেছি। হ্যাঁ, তোমার সেই বিশ্বরূপ। আমার সেই দাদা।'

নিতাইয়ের মুখের দিকে অনিমেষে চেয়ে রইল শচী। বললে, 'নিমাই বলছে তুমি আমার বিশ্বরূপ। সত্যি, তুমিই কি আমার সেই হারানো ধন ?'

'হ্যাঁ, মা, আমিই তোমার সেই বিশ্বরূপ।' নিতাই স্নেহগাঢ় স্বরে বললে, 'আজ হতে তোমার আবার সেই দুই ছেলে।' নত হয়ে নিতাই প্রণাম করলে শচী দেবীকে।

নিতাইয়ের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করল শচী: 'বাবা, তুমিই আমার বিশ্বরূপ, আমার নিমাইয়ের বড় ভাই। আমার নিমাইকে তুমি দেখো।'

একদিন নিভৃতে শচী দেবী নিমাইকে বললে, 'কাল শেষ রাতে

আমি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি। তুমি আর নিত্যানন্দ পাঁচ বছরের ছেলে হয়ে গিয়েছ।'

'বলো কী?' খুব মজা পেল নিমাই।

'ছুটোছুটি করে মারামারি করছ দুজনে। ঠেলাঠেলি করতে-করতে, দেখলাম, দুজনে ঠাকুরঘরে গিয়ে ঢুকলে। আর অমনি ঠাকুর-ঘর থেকে দুটো নতুন ছেলে বেরিয়ে এল, ঠিক তোমাদের বয়সী। তারা কে জানো?'

'কে তারা, মা?'

'তারা কৃষ্ণ-বলরাম।'

'বলো কী? কী করল তারা?'

'তারা তোমাদের দু ভায়ের সঙ্গে মারামারি শুরু করে দিল। বললে, তোমরা কে? এখানে এসেছ কেন? এ বাড়িতে যত দই দুধ সন্দেশ আছে সব আমাদের। এতে তোমাদের কিছু ভাগ নেই।'

'উত্তরে আমরা কিছু বললাম?' নিমাই হাসতে লাগল।

'হ্যাঁ, নিত্যানন্দ বললে, সেকাল আর নেই। তখন গোয়ালার যুগ ছিল, দই-মাখন খুব খেয়েছ লুটে-পুটে! এখন বামুনের যুগ, এখন আমাদের খাবার পালা। তাই ভালয়-ভালয় এ ঘর-দোর ছেড়ে চলে যাও, আমাদের খেতে দাও। যদি না যাবে তো মার খাবে বলে দিচ্ছি।'

'তখন কৃষ্ণ-বলরাম কী বললে?'

'কৃষ্ণ-বলরাম বললে, আমাদের দোষ নেই, তোমাদের দুজনকেই তা হলে বাঁধব। বলরামেরই বেশি রাগ, আর তার যত তড়পানো সব নিত্যানন্দের উপর। ভয় দেখায়, শাসায়, আর বলে, এই দেখ, কৃষ্ণ আমার দিকে। নিতাই বলে তুমি কৃষ্ণের কী ভয় দেখাচ্ছ? গৌরচন্দ্র বিশ্বম্ভর আমার ঈশ্বর।'

'বা, দুই দিকেই দুই ঈশ্বর উপস্থিত।' নিমাই পরিহাস করে উঠল: 'তারপর?'

'এই রকম ঝগড়া করতে করতে কাড়াকাড়ি করে চার জনে সব খেয়ে ফেলল। এমন সময় স্পষ্ট নিত্যানন্দের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। যেন বলছে, মা, বড় খিদে পেয়েছে, ভাত দাও। ঐ ডাকে আমার ঘুম ভেঙে গেল। এই অদ্ভুত স্বপ্নের কী অর্থ আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।' শচী দেবী বিমূঢ় চোখে তাকিয়ে রইল।

নিমাই বললে, 'তুমি সুস্বপ্ন দেখেছ। এ কথা আর কারু কাছে বোলো না। তোমার ঘরের ঠাকুর অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। আমিও ভোগ দিতে গিয়ে দেখি নৈবেদ্যের আধাআধিই নেই। কোথায় যায়, লজ্জায় বলিনে কাউকে।'

'কেন, কোথায় আবার যাবে?'

'আমার কিন্তু সন্দেহ ছিল তোমার পুত্রবধূই ঐ আদ্ধেক ভোগ সাবাড় করে।' আবার পরিহাস করল নিমাই: 'এতক্ষণে আমার সন্দেহের নিরসন হল।'

অন্তরালে থেকে সব শুনতে পেয়েছে বিষ্ণুপ্রিয়া। স্বামীর স্নেহসরস পরিহাসে হাসল আপন-মনে।

শচী দেবী বললে, 'কিন্তু স্বপ্নের কী ব্যাখ্যা করলি?'

'ব্যাখ্যা তো সোজা। তুমি নিত্যানন্দকে একদিন নেমন্তন্ন করে খাওয়াও।'

'তবে তাই যা, নিতাইকে খেতে বলে আয়।' শচী দেবী ব্যস্ত হয়ে উঠল।

তথাস্তু। নিতাইকে গিয়ে তক্ষুনি বললে নিমাই। 'চলো আমার বাড়িতে আজ তোমার ভিক্ষে। দেখো, যেন চঞ্চলতা কোরো না।'

কে কাকে বলছে। নিতাই হাসল।

নিমাই-নিতাই দু' ভাই খেতে বসেছে পাশাপাশি। কিন্তু এ কী দেখছে শচী দেবী! দেখছে কৌশল্যার ঘরে যেন রাম-লক্ষ্মণ খাচ্ছে।

'আরবার আসি আই দুইজন দেখে।
বৎসর পাঁচের শিশু যেন পরতেখে॥

কৃষ্ণ-শুক্ল-বর্ণ দেখে ছুই মনোহর।
ছুই জনে চতুর্ভুজ—ছুই দিগম্বর॥
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম শ্রীহল মুষল।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ দেখে মকরকুণ্ডল॥'

কাঁদতে-কাঁদতে শচী ভাবাবেশে মুর্ছিত হয়ে পড়ল। তখন কোথায় কার খাওয়া। ছু' ভাই ব্যস্ত হয়ে মাকে সুস্থ করতে বসল।

কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্। কৃষ্ণো বৈ পরমদৈবতম্। কৃষ্ণই পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণানন্দ, পরম মহত্ত্ব। কৃষ্ণই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, সর্বকারণের কারণ। রসময়, রসের সদন। রস-নির্যাস-আস্বাদন। একই ঈশ্বর, ভক্তের ভাবে নানারূপ। একই বিগ্রহে ধরে নানাকার রূপ। এইরূপ আকারে স্বরূপতঃ কোনো ভেদ নেই। তাই নিমাইয়ে ভক্তরা কখনো দেখে রামসীতা, কখনো বা রাধাকৃষ্ণ, কখনো বা নৃসিংহবরাহ, কখনো বা লক্ষ্মী-রুক্মিণী। একই বৈদূর্যমণি, এক দিক থেকে দেখলে নীল, আরেকদিক থেকে দেখলে লাল। তেমনি ধ্যানভেদে বিচিত্র প্রকাশ। প্রত্যেক প্রকাশেই কৃষ্ণ শাশ্বত, পরিপূর্ণ। ঈশ্বরে দেহ-দেহী ভেদ নেই। যেমন লবণপিণ্ডের সর্বত্রই লবণ তেমনি কৃষ্ণে সমস্তই আনন্দ। যেই রস সেই কৃষ্ণ, যেই কৃষ্ণ সেই রস।

কৃষ্ণই সর্বাশ্রয়। 'কৃষ্ণ এক সর্বাশ্রয়—কৃষ্ণ সর্বধাম। কৃষ্ণের শরীরে সর্ববিশ্বের বিশ্রাম॥' সবার আশ্রয় কৃষ্ণ—কৃষ্ণে সবার স্থিতি। কৃষ্ণই সর্ব-অংশী। সর্বভূতাধিবাসঃ। সর্বভূতান্তরাত্মা। সর্বতঃ পাণি-পাদান্তং সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।

আবার কী? কৃষ্ণ লীলাপরায়ণ। লীলা পুরুষোত্তম। 'লোকবত্তু লীলা-কৈবল্যম্।' কৃষ্ণের আবার খেলা আছে। শিশু যে খেলে, কোনো কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়ে খেলে না, আনন্দের জন্যে খেলে। কৃষ্ণ যে পরম দেবতা তা সে শুধু খেলে বলে। দিব ধাতু থেকে দেবতা। দিব ধাতু দ্যুতি আর ক্রীড়া ছুইই বোঝায়। তাই যে দ্যুতি বিস্তার করে বা ক্রীড়া বিস্তার করে সেই দেবতা। কৃষ্ণ

পরমজ্যোতির্ময় বা কৃষ্ণের খেলা সমস্তোত্তম, তাই কৃষ্ণ পরমদেবতা। 'কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা, নরবপু কৃষ্ণের স্বরূপ। গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর, নরলীলার হয় অনুরূপ।' কিন্তু খেলা তো একলা হবার নয়। 'স একাকী ন রমতে।' খেলায় আবার সঙ্গী চাই। কৃষ্ণের খেলার সঙ্গীদের নাম পরিকর। আর খেলার স্থানের নাম ধাম। 'দাস সখা পিতা মাতা কান্তাগণ লৈয়া। ব্রজে ক্রীড়া করে কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥' সেই ভগবান কোথায় থাকেন? 'স ভগবান কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ?' ভগবান প্রতিষ্ঠিত নিজের মহিমায়। 'স্বে মহিম্নীতি।' নিজের মহিমায় মানে স্বরূপশক্তির মহিমায়। আর স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষই ভগবানের ধাম। যেখানে গেলে আর ফিরে আসতে হয় না তাইই কৃষ্ণের পরম ধাম। 'যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।'

কৃষ্ণ-আবেশে সমাসীন, নিমাই রামাইকে বললে, 'শান্তিপুরে যাও, অদ্বৈতকে গিয়ে খবর দাও। বলো যার জন্য এত কেঁদেছিলে, হুঙ্কার করেছিলে, সে এসেছে, প্রকাশ পেয়েছে। আর শোনো, নিত্যানন্দের আসার কথাটাও বোলো কানে-কানে। সমস্ত আগমনই তার আকর্ষণে। বোলো যেন সস্ত্রীক আসে।'

রামাই তখুনি ছুটল শান্তিপুর।

সামনে এসে দাঁড়াতেই অদ্বৈত বললে, 'কী রে, আমাকে বুঝি নিয়ে যেতে এসেছিস?'

রামাই বললে, 'সবই তো আপনি জানেন! এবার তবে চলুন।'

'কোথায় যাব?' অদ্বৈত অবাক হবার ভাব করল: 'তোরা একটা ছেলেকে নিয়ে মাতামাতি শুরু করেছিস বলে আমিও গিয়ে তোদের দলে ভিড়ব? তোরা কাকে অবতার বলছিস? কোন শাস্ত্রে নদীয়ায় অবতার এল? আমি কি তোদের মত নির্বোধ? তোর দাদা শ্রীবাসকে গিয়ে জিগগেস কর আমি কে?'

'তার আমি কী জানি! শাস্ত্রেরই বা আমি কী বুঝি?' রামাই

বললে, 'তবে ভগবান যা বলে দিয়েছেন তাই আপনার কাছে নিবেদন করছি।'

'কী, কী বলে দিয়েছেন ?'

'বলে দিয়েছেন যার জন্যে এতদিন কেঁদেছেন, পুজো করেছেন, কঠোর উপবাস করেছেন তিনিই আবির্ভূত হয়েছেন! তিনিই ডেকেছেন আপনাকে।'

'যার লাগি করিয়াছ বিস্তর ক্রন্দন।
যার লাগি করিলা বিস্তর আরাধন॥
যার লাগি করিলা বিস্তর উপবাস।
সে প্রভু তোমার লাগি হইলা প্রকাশ॥'

'ডেকেছেন ?' এ কী, অদ্বৈত যে হঠাৎ কাঁদতে শুরু করল। 'সত্যি, সত্যি এসেছেন তিনি ? আমাদের মধ্যে এসেছেন ? বৈকুণ্ঠ ছেড়ে তিনি এসেছেন এ ধূলির ধরণীতে ?' অদ্বৈত উঠে নৃত্য শুরু করল: 'ওরে শোন, তিনি এসেছেন। আমার ডাকে তিনি নেমেছেন বৈকুণ্ঠ থেকে। আমিই তাঁকে এনেছি। আমিই তাঁকে এনেছি।'

যাওয়ার উদ্যোগ পড়ে গেল। ষড়ঙ্গ পূজার সজ্জা তৈরি হল। অদ্বৈতের সঙ্গে চলল তার স্ত্রী সীতা দেবী। আর অনুগামী রামাই।

পথে আবার বেসুর ধরল অদ্বৈত। জিগগেস করল, 'কোথায় চলেছি বল তো, কার কাছে ?

রামাই বললে, 'তার আমি কী জানি।'

'তোকে কা বলে দিলেন সত্যি করে বল তো আবার শুনি।'

'শুধু বললেন যেন শিগগির আপনি একবার দেখা করেন তাঁর সঙ্গে।'

'কিন্তু উনিই যে আমার আকাঙ্ক্ষিত তা আমি বুঝব কিসে ?' অদ্বৈত আবার দ্বিধায় পড়ল। বললে, 'শোন, যদি উনি আমার মাথায় পা তুলে দেন, পা তুলে দেবার ওঁর সাহস হয়, তবেই বুঝব তিনি আমার প্রাণেশ্বর।'

রামাই বললে, 'তার আমি কী জানি। আমার যদি ভাগ্যে থাকে দেখব সেই অপূর্ব দৃশ্য।'

'দেখবি ?' যেন বিশ্বাস্য নয় এমনি জিজ্ঞাসা অদ্বৈতের।

'কেন দেখব না ? আপনার জন্যেই তো তাঁর আসা। আপনারই তো হুকুম এবার যেন ভক্তি বিতরণ করেন ঘরে ঘরে।'

চিত্ত আর্দ্র হল অদ্বৈতের। তবু যেন ঘোর কাটে না।

নবদ্বীপে পৌঁছে বললে, 'আমি যাব না নিমাইয়ের কাছে। তুমি গিয়ে তাঁকে বলো যে আচার্য আসেনি।'

'আপনি তা হলে কোথায় যাবেন ?' রামাই অবাক মানল।

'আমি সস্ত্রীক নন্দন আচার্যের বাড়িতে লুকিয়ে থাকব। দেখি তিনি কী করেন। দেখি তিনি আমাকে ডাকান কি না।'

নন্দন আচার্যের বাড়িতে অদ্বৈতকে পৌঁছে দিয়েই রামাই ছুটল বাড়িতে। নিমাই এখন কোথায় ?

দেখ গিয়ে 'ত্রিদশের রায়' তোমাদের বিষ্ণুখট্টায় এসে বসেছেন।

অদ্বৈত এসেছে, অন্তরে জেনেছে নিমাই। চলো যাই শ্রীবাসের বাড়ি। সেখানে গিয়ে হুঙ্কার ছেড়ে বসেছে বিষ্ণুখট্টায়। বললে, 'ওরে, নাড়া এসেছে। নাড়া এসেছে আমাকে পরীক্ষা করতে।' 'নাড়া চাহে মোর ঠাকুরাল দেখিবারে।' নন্দন আচার্যের বাড়ি লুকিয়ে রয়েছে। কতক্ষণ থাকবে ?

নিত্যানন্দ নিমাইয়ের মাথায় ছাতা ধরেছে, গদাধর কর্পূর-তাম্বুল জোগাচ্ছে, চামর দোলাচ্ছে নরহরি। মুকুন্দ মুরারি শ্রীবাস করজোড়ে দাঁড়িয়ে।

এমন সময় রামাই এসে উপস্থিত।

'আমাকে পরীক্ষা করবার জন্যে নাড়া পাঠিয়েছে তোমাকে ?' বললে নিমাই, 'ওকে গিয়ে বলো নন্দন আচার্যের বাড়িতে আর লুকিয়ে থাকতে হবে না। বলো আমি ডেকেছি। শিগগির যেন চলে আসে।'

আবার ছুটল রামাই।

সত্যি? আমি এসেছি, নন্দনের বাড়ি রয়েছি, কেউ না বললেও টের পেয়েছেন? অভিভূতের মত এগিয়ে চলল অদ্বৈত। অনুগামিনী সীতাও চলল সঙ্গে।

শ্রীবাসের ঘরে এসে দাঁড়াল দুজনে। কই নিমাই কোথায়? এ যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বসে। আর এ তো শ্রীবাসের ঘর নয়, এরই নাম বুঝি বৈকুণ্ঠ।

দিব্যদর্শন হল অদ্বৈতের। জ্যোতির্ময় দেবতারা নিমাইয়ের স্তুতি করছে, অগণন ঋষি দাঁড়িয়ে আছে করজোড়ে। পৃথ্বী ও আকাশ এক হয়ে গিয়েছে। সর্বত্র বন্দনার সুধাক্ষরণ।

ঈশ্বর্য দেখতে চেয়েছিল, অদ্বৈত ঐশ্বর্য দেখল।

'আমাকে চিনতে পারছ?' বললে নিমাই, 'আমি ক্ষীরোদসাগরে নিদ্রামগ্ন ছিলাম। তোমার হুঙ্কার আমার ঘুম ভাঙিয়েছে। জীবের দুঃখ সহ্য করতে না পেরে জীবোদ্ধারের উদ্দেশ্যে আমাকে তুমি ডেকে এনেছ। কার সাধ্য তোমার ডাক না শোনে!'

সস্ত্রীক কাঁদতে লাগল অদ্বৈত। বললে, 'আমার শক্তি কী তোমাকে আকর্ষণ করি? তুমি নিজ করুণায় অবতীর্ণ হয়েছ। জীবের দুঃখ তুমিই ভালো জানো। আর তুমি ছাড়া কে আছে তাকে তুলবে পাপপঙ্ক থেকে? আজ আমার সব আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হল, তোমার দর্শন পেলাম। জন্মকর্ম সফল হল। যদি অনুমতি করো তো চরণ-যুগল পুজা করি।'

পায়ের কাছে বসল দু'জনে, অদ্বৈত আর সীতা। অশেষ-বিশেষে চৈতন্যচরণ পুজা করতে লাগল। পুজার শেষে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

তখন নিমাই কী করল? অদ্বৈতের মনোবাসনা পূর্ণ করল। তার মাথার উপরে পা রাখল।

'সর্বভূত-অন্তরাত্মা শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
চরণ তুলিয়া দিল অদ্বৈত মাথায়॥'

'নাড়া !' ডাকল নিমাই, 'এখন একবার নৃত্য করো। আমি দেখি।'

অদ্বৈত নাচতে লাগল।

আর সকলে কীর্তন ধরল। অদ্বৈতও যোগ দিল কীর্তনে। আর তপস্যা নয়, ধ্যান-জ্ঞান নয়, এখন শুধু নৃত্যগীতে কৃষ্ণভজন।

নিমাই আপন গলার মালা অদ্বৈতকে দিয়ে দিল। বললে, 'বর চাও, বর নাও।'

অদ্বৈত বললে, 'যে বর চেয়েছিলুম তা তো পেয়ে গেছি। আর কিছুই আমার চাইবার নেই।

'না, আছে।' নিমাই বললে জোর দিয়ে।

'তবে এই বর দাও যে প্রেমভক্তি তুমি দিতে এসেছ তা যেন সর্বলোকে পায়—সে অধিকারে যেন কোনো উচ্চ-নীচ ভেদ না থাকে। ভক্তিতে চণ্ডালে-ব্রাহ্মণে মূর্খে-পণ্ডিতে যেন তারতম্য না থাকে। নির্বিশেষে সকলে যেন পায় সে করুণা।'

নিমাই বললে, 'তথাস্তু।'

কৃষ্ণের ঐশ্বর্যও মধুর। মাধুর্যই ভগবত্তার সার। আর কারুণ্যই সেই মাধুর্যের প্রতিবিম্ব। স্বতন্ত্র পুরুষ হয়েও কৃষ্ণভক্তপরবশ। 'অহং ভক্ত-পরাধীনঃ।' 'লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বরস্বভাব!' কৃষ্ণ যদি করুণ না হয় তবে ক্রন্দন শুনবে কে? 'কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে। গুরু-অন্তর্যামি-রূপে শিখায় আপনে।' কৃষ্ণের এত করুণা যে নিজেই নিজতত্ত্ব শিখিয়েছেন। হয় গুরুর মধ্য দিয়ে, নয়তো স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সাক্ষাৎ ভাবে, অন্তরঙ্গ সম্বন্ধে। যেমন অর্জুনকে কৃপা করলেন নিজের থেকে। সর্বগুহ্যতম কথা আবার শোনাই তোমাকে। আমাতে মন ঢালো, আমাকেই খুশি করো। আমি যে তোমাকে আগে থেকেই ভালোবেসে ফেলেছি। আর ভালোবাসা ছাড়া কী আছে খুশি করবার! এই তো সংসারে সর্বোত্তম কথা—পরমং বচঃ।

২৭

শান্তিপুরে ফিরে গেল অদ্বৈত। কিন্তু শান্তি কই?

আবার জেগেছে অবিশ্বাস। যা দেখে এলাম সব সত্যি তো? না কি ছায়াবাজি?

টিঁকতে পারল না। আবার চলল নবদ্বীপ। হাজির একেবারে শ্রীবাসের আস্তানায়।

এ কি, স্বয়ং প্রভু এখানে! আর যেখানেই নিমাই, সেখানেই কৃষ্ণকথা।

অদ্বৈতকে দেখে উঠে দাঁড়াল নিমাই। কোথায় অবিশ্বাস? পূর্ণ-প্রসন্ন মনে অদ্বৈত প্রণাম করল নিমাইকে। নিমাইও ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। প্রণাম করল অদ্বৈতকে।

'সীতাপতির জয় হোক।' পরিহাস করল নিমাই: 'লোকাভি-রাম সীতাপতি যখন এসেছে তখন আর আমাদের ভয় কী।'

অদ্বৈতের স্ত্রীর নাম সীতা। সেই ইঙ্গিতে এই পরিহাস।

'কই—এখানে রঘুনাথ কোথায়?' অদ্বৈত প্রতিধ্বনি করল: 'এখানে তো যদুনাথ বসে।'

'তা তুমি যদি শান্তিপুরে থাকো, আমার নবদ্বীপ চলে কি করে?' নিমাই আবার সরস ইঙ্গিত করল।

তার মানে, তুমি যদি শান্তরসেই ক্ষান্ত থাকো, আমার এই নবধা ভক্তি তবে কে আস্বাদ করে? দ্বীপ যদি জলের মধ্যে আশ্রয়, ভক্তিও তাহলে সংশয়ের মধ্যে স্থিরস্থিতি।

তাৎপর্য বুঝতে পেরেছে শ্রীবাস। উৎফুল্ল হয়ে বললে, 'কই আর থাকতে পারলেন শান্তিপুর। তোমার আকর্ষণে চলে এসেছেন

নবদ্বীপ। যে নবদ্বীপে এখন নিত্যানন্দের অবস্থিতি। আর কে না জানে, ভক্তিই নিত্য আনন্দের উৎস।'

'তারি জন্যেই তো শ্রীতে যার বাস সেই শ্রীবাস এখানে চরিতার্থ।' অদ্বৈতও খেই ধরল।

'শ্রী মানে লক্ষ্মী তো?' বললে শ্রীবাস, 'লক্ষ্মী আর কোথায়? এখন তো বিষ্ণুপ্রিয়া।'

নিমাই হাসল, বললে 'শ্রীশব্দের আরেক অর্থ ভক্তি। তোমরা সকলে যেখানে উপস্থিত, সেখানে শ্রী নেই—ভক্তি নেই—এ হতেই পারে না।'

'শ্রীবাস ঠিকই বলেছে।' অদ্বৈত বললে, 'ভক্তি তো বিষ্ণুর প্রিয়া। সুতরাং শ্রী এখানে বিষ্ণুপ্রিয়া রূপে বিরাজ করছে। বিরাজ করছে তোমার ঘরণী হয়ে।'

ভক্তিই শ্রেষ্ঠ অভিধেয়। অভীষ্টকে পাবার জন্যে যা করতে হয় তাই অভিধেয়। এক কথায়—কর্তব্য। অভীষ্ট কে? অভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণ। গীতায় বলেছে শ্রীকৃষ্ণ, আমাকে পেলে আর পুনর্জন্ম হয় না। মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে। ব্রহ্মের আনন্দ অনুভূত হলে থাকে না আর ভয়লেশ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ন বিভেতি কদাচন। ভগবানকে জানলেই জন্মমৃত্যুর পার হওয়া যায়, তা ছাড়া পার হবার আর পথ কই? তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

কিন্তু ভগবানকে জানবার উপায় কী?

একমাত্র ভক্তিই উপায়। ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ। ভাগবতে বলছে শ্রীকৃষ্ণ, একমাত্র ভক্তিতেই জানা যায় আমাকে। গীতাতেও সেই কথা। ভক্ত্যা মামভিজানাতি। সেই কথা আবার বেদান্তে। বিদ্যৈব তু তন্নির্ধারণাৎ। বিদ্যাই মুক্তির একমাত্র উপায়। বিদ্যা অর্থ জ্ঞানান্বিতা ভক্তি। ভক্তি দিয়ে শুধু জানা নয়, ভক্তি দিয়ে দেখা যায়, প্রবেশ করা যায় তত্ত্বে, স্বরূপের উদ্ঘাটনে। ভক্ত্যাত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবম্বিধোঽর্জুন। জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ।

এখন নবদ্বীপ, নববিধা ভক্তির সাধনের কৌশল কী ?

শ্রবণ। বারে বারে শোনো কৃষ্ণকথা। অভ্যাস করো বলতে। শুধু নামের অক্ষরের উচ্চারণেই ভক্তি জাগবে। 'নববিধা ভক্তি পূর্ণ হয় নাম হতে।'

স্মরণ। বারে বারে ভাবো কৃষ্ণকে। তার লীলাচিন্তন করো। একমাত্র ভগবৎস্মৃতিই ভক্তি।

তারপরে পাদসেবন করো। অর্চন-বন্দন করো। নয়তো বন্ধুতা করো, না পারো, দাসত্বের বোঝা তুলে নাও। আত্মনিবেদন করো। গলিয়ে ঢেলে দাও নিজেকে।

অন্য বাঞ্ছা, অন্য পূজা রেখো না। অন্যাভিলাষিতাশূন্যতায় চলে এস। সর্বোপাধিবিনির্মুক্ত হয়ে সেবা করো।

'ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥
তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নামসঙ্কীর্তন।
নিরপরাধ নাম হৈতে হয় প্রেমধন ॥'

'শচীদেবী আমাকে পাঠিয়েছেন।' একজন লোক এসে বললে।

'কী খবর ?' ব্যস্ত হল শ্রীবাস।

'অদ্বৈত আচার্যকে তিনি নিমন্ত্রণ করেছেন। যেন ওঁর ওখানে উনি বিশ্রাম করেন।'

'কী আনন্দ।' উথলে উঠল অদ্বৈত: 'স্বয়ং শ্রীভগবানের সঙ্গে জগজ্জননীর হাতে আজ প্রসাদ পাব।'

'আমি দেখতে পাব না সে দৃশ্য ?' শ্রীবাস বললে, 'আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে। আর যদি গিয়ে পড়ি, আমিও না কোন দুটি প্রসাদ পাব ?'

'বা, তুমি যাবে কোন্ সুবাদে ?' বললে অদ্বৈত, 'তোমার নেমন্তন্ন হয় নি।'

'তা ছাড়া তুমি গেলে দু'জনের রান্না রাঁধতে এঁর কষ্ট হবে।' নিমাই বললে সস্নেহে।

'আমাকে বলছেন ?' চমকে উঠল অদ্বৈত : 'বা, আমি রাঁধতে যাব কেন ? আপনার স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া রাঁধবে।'

'হ্যাঁ, তাঁর কষ্ট হবে।' মমতামাখানো স্বরে বললে নিমাই।

'হোক কষ্ট। শাশুড়ি-বৌয়ে খাটবে। খাব আমরা তুজনে। ছাড়ব না।' শ্রীবাস উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

লোক ছুটল শচীকে খবর দিতে।

ভোজন পরে হবে, আগে দর্শন করতে দাও। সেই তরুণারুণ-করুণাময় বিপুলায়তনয়নকে দেখতে দাও চোখ ভরে। যার নয়ন তরুণ-অরুণ, করুণাময়, বিপুল ও আয়ত, সেই বিশ্ববিমোহনকে তুই চোখে আস্বাদ করি। নেত্ররসায়নকে দেখে শীতল করি নেত্র।

অদ্বৈত শ্রীবাসের কানে কী বলছে অস্ফুটে।

'কী বলছে অদ্বৈত ?' জিগগেস করল নিমাই!

'বলছে, নিত্যানন্দকে যে রূপ দেখিয়েছিলে তা কেন দেখাচ্ছ না ?' বললে শ্রীবাস।

'বা, এই যে আমাকে দেখছ, এই তো আমার যথার্থ রূপ।' সরল কণ্ঠে বললে নিমাই, 'আর এই রূপ—এই গৌররূপই তো অদ্বৈতের প্রিয়। কি, ঠিক নয় ?'

অদ্বৈত ফাঁপরে পড়ল। যদি বলে, ঠিক, তা হলে অন্যরূপ আর দেখা হয় না। আর যদি বলে, না, শ্যামসুন্দরকেই দেখতে চাই, তা হলে গৌররূপে অনাদর আসে।

'গৌররূপের মত প্রিয় আমাদের আর কিছু নেই, তবে স্বরূপে সেই যে শ্রীকৃষ্ণ তা একবার এখন দেখতে চাই।' অদ্বৈত বললে।

'কি করে কী দেখানো যায় তার কিছুই আমি জানিনা।' নিমাই বললে কুণ্ঠিতের মত, 'কিছুই আমার ইচ্ছাধীন নয়। যদি শ্যাম-সুন্দরকে দেখতে চাও, চোখ বুজে হৃদয়ে কৃষ্ণকে ধ্যান করো। কৃষ্ণই কৃপা করে দেখাবেন তাঁর নিজ রূপ।'

অদ্বৈত চোখ বুজল।

এ কি, চোখ যে একবার বুজল, আর খোলে না দেখি। অনড় কাঠ হয়ে গেছে অদ্বৈত। বসে বসেই অচেতন হয়ে পড়েছে।

'আচার্যের এ কী হল?' সবাই ব্যস্ত-ব্যাকুল হয়ে উঠল।

'বোধহয় হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করছে।' বললে নিমাই, 'তাই আনন্দে নিস্পন্দ।'

'চিত্রং তদেতৎ চরণারবিন্দং
চিত্রং তদেতৎ নয়নারবিন্দম্।
চিত্রং তদেতৎ বদনারবিন্দং
চিত্রং তদেতদ্বপুরস্য চিত্রম্॥'

'আচার্যের কী ভাগ্য!' বললে শ্রীবাস, 'গৌররূপ তো দেখছেই, দেখল আবার শ্যামরূপ।' চেতনা ফিরে পাচ্ছে অদ্বৈত।

আর সঙ্গে-সঙ্গে বলছে গদ্গদ হয়ে, 'এই যে এতক্ষণ দেখছিলাম জ্যোতির্ময় শ্রীমূর্তি, সে কোথায় গেল? সেই নয়নোৎসব কোথায়? সেই বিমুগ্ধহাসমধুর কোথায় লুকোল? দৈবতং জীবিতঞ্চ, প্রাণের দেবতা ও বল্লভকে কোথায় পাব?'

'তুমি কাকে দেখলে বলো স্পষ্ট করে।' সবাই ঘিরে ধরল অদ্বৈতকে।

'আর কাকে!' অদ্বৈত ইঙ্গিত করল গৌরাঙ্গকে: 'যিনি এই সামনে বসে আছেন সেই করুণাবলোকনকে। সব, সব তাঁর কীর্তি।'

'বা, আমি কী করলাম?' সরল সাজল নিমাই।

'আমি যেই চোখ বুজলাম উনি আমার হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করলেন।' বলতে লাগল অদ্বৈত, 'প্রবেশ করে শ্যামরূপ ধরলেন। বহুল জলদের ঘনীভূত কান্তি কারুণিক কিশোরমূর্তি। দেখা দিয়ে আবার চলে এলেন বাইরে। বাইরে এসে দেখ আবার ধরেছেন নিজরূপ।'

'তুমি বসে বসে ঘুমুলে আর স্বপ্ন দেখলে, তাতে আমার কী দোষ?' মৃদু-মৃদু হাসতে লাগল নিমাই।

গভীর নিশীথে বনে বনে কেন ঘুরে বেড়াচ্ছ? ব্রজের তরুলতা

জিগগেস করল গোপবালাদের। আমরা একটি চোরকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। তার নাম কী? চোর বলেই তো তার নাম করব না। কিন্তু তোমাদের উপর তার মন নেই, তাকে খুঁজলে তোমাদের মানের লাঘব হবে। জানি লক্ষ্মীর কটাক্ষে সে কোথাও বিভোর-বিবশ হয়ে আছে, আমাদের দিকে সে চাইবে কেন? আমাদের সঙ্গে তার সম্বন্ধ কী? সে লক্ষ্মীর সেব্য, বনচরীদের প্রতি কেন তার আকর্ষণ হবে? তবু যে চোর, তাকে ধরতে হবে বৈ কি। খুঁজে বার করতে হবে।

তোমাদের কথা বিশ্বাস করি না, বললে তরুলতা। তোমরা কার কথা বলছ বুঝতে পারছি। কিন্তু সে তো সুশীল, তার নামে অযথা অপবাদ কেন?

সে সুশীল? খুব চিনেছ তাকে। সে সব চেয়ে পাকা চোর। তার মত দৃঢ়, সাহসী আর কেউ নেই। শোনো, আকাশ থেকে নিবিড়নীল মেঘমালার কান্তি পর্যন্ত হরণ করেছে। কত বজ্র দিয়ে সুরক্ষিত সেই কান্তি। সেই চোরের হাত থেকে সেই কান্তিরও নিস্তার নেই। আমরা তো সামান্যা। অবলা অখলা, আমাদের মনোরত্ন চুরি করে পালাবে সে আর এমন কী বেশি কথা। জগতে যত মাধুর্য আছে সমস্তের পরিপাক হচ্ছে কন্দর্পে। বলতে পারো বা চন্দ্রে, পদ্মে, হংসে, মৃগে, মীনে, পুষ্পপল্লবে। সকলের মাধুর্য চুরি করে এই চোর নিজ মাধুর্যের সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে। সে কোথায় পালাল বলতে পারো?

কী করে বলব? যে চুরি করে সে কি কখনো ধরা দেয়? আর চোর যত দূরে থাকে ততই ভালো।

কত দূরে?

দূরেই হোক আর অদূরেই হোক, তাকে দেখতে পাবে না। সে বড় চতুর। সে লুকিয়ে থাকবে।

কোথায় লুকোবে? তার মাথায় ময়ুরপুচ্ছের চূড়া। দূর হতে দেখলেও তাকে চিনতে পারব।

চিনেই বা লাভ কী! ধরবে কী করে? তোমরা পিছু পিছু ছুটবে আর সে ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে ধরা দেবার জন্যে? কেন, সেও ছুটতে পারবে না?

না, সেটি হবার জো নেই। এ অন্যরকম চোর। এ বিলাসী। আর বিলাসে তার গতি অলসমন্থর। জানোনা বুঝি, সে চলে, আবার থমকে-থমকে দাঁড়ায়।

তাই বুঝি? কিন্তু তার গায়ের রঙ তো কালো। আর এই রাতও কালো। তাতে আবার বনের আঁধার। যদি কোনো কুঞ্জের আড়ালে সে লুকিয়ে থাকে দেখবে কি করে?

বলো কী? আঁধার কি তাকে লুকোতে পারে? বরং আঁধারই তাকে দেখে মুখ লুকোবে। কোটি চন্দ্র-সূর্যের জ্যোতি তার সর্বাঙ্গে।

তাই যদি হয়, এ বৃথা প্রয়াস ছাড়ো। শেষকালে ঐ চোরই তোমাদের ধরে নিয়ে পালাবে। রাত্রি অবসন্ন হোক, প্রভাতে তাকে অন্বেষণ করো।

আমাদের নিয়ে সে পালাবে কী! তার আরেক গুণের কথা জানোনা বুঝি? সে আবার আমাদের অপাঙ্গ দৃষ্টিপ্রসঙ্গে একেবারে বিবশবিভোর। তাই যদি পথ জানো তো বলে দাও, কোথায় আমাদের সেই সৌন্দর্য-মাধুর্যের অফুরন্ত সমুদ্র?

'পুণ্ডরীক! পুণ্ডরীক!' একদিন হঠাৎ উচ্চরোলে কান্না জুড়ল নিমাই: 'তোর বিরহ আমি আর সহ্য করতে পারছিনা। বাপ রে, বন্ধু রে, একবার দেখা দে। একবার কাছে আয়। আমার নয়ন ও হৃদয় শীতল কর।'

কে এই পুণ্ডরীক?

সবাই ভাবল, পুণ্ডরীক বলতে কৃষ্ণকেই ইঙ্গিত করছে। নিমাইয়ের এ কাতরতা কৃষ্ণ ছাড়া আর কারু জন্যে নয়।

কিন্তু ঐ শোনো। নামে আবার নতুন বিশেষণ দিচ্ছে।

'পুণ্ডরীক, ও বাপ বিদ্যানিধি, দেখা দে। আমার নয়ন-মনের তৃষ্ণা দূর কর।'

তবে এ পুণ্ডরীক নিশ্চয়ই কোনো প্রিয়ভক্ত, বিদ্যানিধি তার উপাধি।

'কার জন্যে কাঁদছেন ? যদি কোনো ভক্ত হয় তো বলুন ডেকে দি। আপনার এই বিলাপে বুক ফেটে যাচ্ছে আমাদের।' ভক্তদল মিনতি করল।

'তোমরা বিদ্যানিধিকে চেন না ? চট্টগ্রামের চক্রশালার জমিদার, কৃষ্ণপ্রেমে পরিপূর।' বললে নিমাই। 'কৃষ্ণভক্তি-সিন্ধুমাঝে ভাসে নিরন্তর। অশ্রুকম্প-পুলক-বেষ্টিত কলেবর ॥'

'চট্টগ্রামের লোক ?'

'হ্যাঁ, এখানে, নবদ্বীপেও তার একখানা বাড়ি আছে। বাইরে বিলাসী, অন্তরে দীনাতিদীন। কেউ তাকে, তার আসল রূপকে চেনে না। দারুণ গঙ্গাভক্ত। পাদস্পর্শভয়ে গঙ্গাস্নান করে না, সমস্ত দেবার্চনের আগে গঙ্গাজল পান করে। দিনের বেলায় লোকেরা গঙ্গায় নেমে কুলকুচো করে, দাঁত মাজে, চুল ধোয়, এসব দেখে ভীষণ যন্ত্রণা পায়। তাই গভীর রাতে, গঙ্গা যখন নির্জন, তখন সে আসে দর্শন করতে। কিন্তু কবে আমি তাকে দর্শন করব ? তাকে ছাড়া আমার স্বাস্থ্য নেই, শান্তি নেই।'

'সে তো এখন চট্টগ্রামে। সে আসবে কি করে ?'

'আসবে, শিগগিরই আসবে।' বললে নিমাই, 'আমাকে ছেড়ে সে পারবে না থাকতে। কিন্তু এলেও তাকে চিনবে কি তোমরা ? তাকে তোমরা বিষয়ী মনে করবে। মনে করবে বা সংসারদাস। আসল ভক্তকে চেনে কয়জনে ?'

কদিন পরে ঠিক পুণ্ডরীক চলে এল নবদ্বীপ।

এসে থাকল গুপ্তভাবে। একমাত্র মুকুন্দ দত্ত খবর পেল। মুকুন্দ দত্তর বাড়ি চট্টগ্রাম—হয়তো বা সেই সুবাদে।

এদিকে নিমাইয়ের কান্নার বিরাম নেই : 'বাপ বিদ্যানিধি, দেখা

দে। কেন এসেও আসছিস না আমার কাছে? তোকে ছাড়া প্রাণে বাঁচি কি করে?'

এসেছেন বলছেন, তবে কোথায় সে? ভক্তের দল পরস্পরের দিকে তাকাল জিজ্ঞাসু হয়ে।

গদাধরের সঙ্গে মুকুন্দের গাঢ়তম বন্ধুতা। তাই মুকুন্দ গদাধরকে বললে চুপি চুপি, 'ভাই, নবদ্বীপে একজন বড় ভক্ত এসেছেন, দেখতে যাবে?'

'বা, নিশ্চয় যাব।' গদাধর লাফিয়ে উঠল: 'ভক্ত দেখতে আমার বড় লালসা। কিন্তু কে সে মহাজন?'

'আমাদের গ্রামের এক জমিদার, আর এরই নাম বিদ্যানিধি।'

'নিশ্চয় যাব। এখুনি যাব।'

গদাধরকে মুকুন্দ নিয়ে গেল পুণ্ডরীকের বাড়ি। এই দেখ, এই আমাদের বিদ্যানিধি।

দেখে শ্রদ্ধাভক্তি উড়ে গেল গদাধরের। এ সে কী দেখছে, কাকে দেখছে?

দেখল খাটে পুরু বিছানার উপরে পুণ্ডরীক বসে আছে, চারধারে নরম বালিশের স্তূপ, মাথায় চন্দ্রাতপ। গায়ে বিলাসবেশ, সুরূপ সুন্দর, পাশে রূপোর পানের বাটা, তাম্বুলরাগে অধর রক্তবর্ণ। দিব্য গন্ধে আমোদ করছে ঘর। পাশে দাঁড়িয়ে ময়ূরপুচ্ছের পাখা দিয়ে চাকর ব্যজন করছে। কেশভারের সংস্কারটিও মনোরম। এ বৈষ্ণব ভক্ত কোথায়? এ যে মহাভোগী। ঐহিক সুখে অনুরক্ত।

পুণ্ডরীক গদাধরের পরিচয় জানতে চাইল।

'ইনি মাধব মিশ্রের পুত্র। আজন্ম বিরক্ত।' বললে মুকুন্দ, 'ভক্তি-পথের যাত্রী। চিরকুমার।'

আর গদাধর ভাবছে পালাতে পারলে বাঁচি। বাটা থেকে কেমন পান তুলে-তুলে খাচ্ছে দেখ। চুলে আমলকীর সুগন্ধ মেখেছে। পানে পর্যন্ত সুবাসের স্পর্শ।

মুকুন্দ বুঝতে পেরেছে গদাধর পুণ্ডরীকের বৈষ্ণবত্বে সন্দিহান হয়েছে। এতটুকুও মূল্য দিতে প্রস্তুত নয় এমনি ভঙ্গি করেছে আড়ষ্ট। এখন সে কী করে? সুস্বরে ভাগবতের একটি শ্লোক আবৃত্তি করল। ভক্তিমহিমার সেই প্রসিদ্ধ শ্লোক। লোকবালঘ্না রুধিরাশনা পূতনার কথা। তার ধাত্রীগতি লাভ করার করুণার কাহিনী।

'রাক্ষসী পূতনা—শিশু খাইতে নির্দয়া।
ঈশ্বর বধিতে গেলা কালকূট লৈয়া॥
তাহারেও মাতৃপদ দিলেন ঈশ্বরে।
না ভজে অবোধ জীব হেন দয়ালুরে॥'[১]

শোনামাত্রই বিদ্যানিধি কাঁদতে লাগল অঝোরে। মূর্ছিত হয়ে খাট থেকে পড়ে গেল মাটিতে। যদি বা জ্ঞান এল, ধুলোয় গড়াগড়ি দিতে দিতে বিলাপ করতে লাগল। 'কৃষ্ণ রে ঠাকুর রে কৃষ্ণ রে মোর প্রাণ। মোরে সে করিলে কাষ্ঠ পাষাণ সমান।'

গদাধর গতবুদ্ধি, হতচেতন।

উঠে দাঁড়িয়ে বিদ্যানিধি গর্জন করতে লাগল, লাথি দিয়ে ভাঙতে লাগল জিনিসপত্র। দুহাত দিয়ে ছিঁড়তে লাগল জামাকাপড়, আবরণ-আভরণ। কোথায় পানের বাটা, কোথায় বা সুগন্ধের ঝারি। কোথায় বা দুগ্ধফেনের শয্যা, ময়ূরপুচ্ছের পাখা। আর রূপবান সেই রাজপুত্রের সর্ব-অঙ্গ ধূলিধূসর।

গদাধর ভয়ে কাঁপতে লাগল। এহেন ভক্তকে আমি অবজ্ঞা করলাম। ভক্তদ্রোহী হলাম। যার শরীরে তিলমাত্র ধাতু নেই, যে অবিচ্ছিন্ন আনন্দসমুদ্র, তাকে আমি চিনলাম না। ভেবেছিলাম, যে কৌপীন পরে সেই বুঝি ভক্ত, আর যার মাথায় সুগন্ধি তেল, সে পাষণ্ড ছাড়া কিছু নয়।

'মুকুন্দ!' হুঙ্কার দিল গদাধর: 'তুমিই আমাকে দেখালে কাকে বলে বৈষ্ণব, কাকে বলে ভক্তপ্রধান। বিদ্যানিধিকে দেখলে ত্রৈলোক্য পবিত্র হয়, আমিও হয়েছি। শোনো, আর কথা নেই, আমি বিদ্যা-

নিধির থেকে মন্ত্র নেব। তাঁকে মনে মনে এতক্ষণ যে অবজ্ঞা করেছি, তাঁর শিষ্য হয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করব। তাঁর শিষ্য হলে তিনি নিশ্চয়ই আমার সব দোষ ক্ষমা করবেন।' অবিরল ধারায় কাঁদতে লাগল গদাধর।

গদাধরকে কোলে ধরলেন পুণ্ডরীক। বললেন, 'এ তো পরম সন্তোষের কথা। যে শৈশব থেকেই ভক্ত, তাকে দীক্ষা দিতে পারার মত সৌভাগ্য বা ক'জনের হয়? আগামী শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে তোমার সঙ্কল্পসিদ্ধি হবে। তার আগে আমার গৌররায়কে একবার দেখে আসি।'

'তাঁকে আর দেখেননি আগে?' জিগগেস করল গদাধর।

'না, কই আর দেখলাম!'

'দেখেননি, পরিচয় নেই, তবে যাবেন কেন?'

'যাব কেন? সে যে আমাকে ডাকছে। আমাকে টানছে। সে ছাড়া যে গতি নেই, ইতি নেই, চোখে আলো নেই, বুকে নিঃশ্বাস নেই। সেই তো আমার মনোনেত্রের রসায়ন।'

'কবে যাবেন? কখন?'

'আজই যাব। যাব একাকী। যাব নিশিযোগে।'

২৮

রাতের অন্ধকারে একা-একা চলল পুণ্ডরীক। কেউ যেন তাকে না দেখে। দেখলেও যেন অনুমান করতে না পারে কোথায় চলেছে।

পরনে দীন বেশ, পায়ে ধুলো। বিলাস-মণ্ডন কিছু নেই।

নিমাইয়ের কাছে এসে দাঁড়াল পুণ্ডরীক। প্রণাম করবার আগেই পড়ল মূর্ছিত হয়ে।

সম্বিত ফিরে পেয়ে কাঁদতে লাগল : 'কৃষ্ণ, আমার প্রাণ, আমার সর্বস্ব, তুমি সকল জগৎ উদ্ধার করলে, শুধু আমাকেই তুমি করলে না। একমাত্র আমার প্রতিই তুমি বিমুখ। একমাত্র আমিই বঞ্চিত।'

ভক্তরা সকলে অবাক। এ কে? কার এই কাতরতা? চিত্তে কৃষ্ণপ্রীতির আবির্ভাব না হলে এমন চিত্তদ্রবতা হয় কী করে? চিত্তদ্রবতা না হলে রোমহর্ষ হয় কী করে? রোমহর্ষ না হলে কী করে প্রকাশ পায় অশ্রুকলা? আর অশ্রুকলা ছাড়া কী করে চিত্তশুদ্ধি সম্ভব?

ভক্তরাও কাঁদতে বসল।

আর, এ কী অদ্ভুত, যাকে আগে কখনো চোখে দেখেনি তাকেই নিমাই বুকে জড়িয়ে ধরল। বললে, 'পুণ্ডরীক, বাবা, তোকে আজ দেখলাম স্বচক্ষে। আমার তপ্ত হৃদয় তুই শীতল করলি, শীতল করলি চোখের পিপাসা।'

এ কে আপন জন, বুকে নিয়ে আর ছাড়তে চায় না নিমাই।

মহানন্দে কীর্তন আরম্ভ হল।

নিমাই বললে, 'এর নাম পুণ্ডরীক, উপাধি বিদ্যানিধি। কিন্তু প্রেম ছাড়া আর বিদ্যা কী! তাই আজ থেকে ওর পদবী হল প্রেমনিধি।'

স্পর্শ থেকে যখন সে মুক্ত হল তখনই সে প্রণাম করল নিমাইকে।

'চৌরাগ্রগণ্যং পুরুষং নমামি।' অনেক জন্মার্জিত পাপ তুমি হরণ করো যেমন সুসমৃদ্ধ প্রজ্বলিত আগুন কাষ্ঠস্তূপকে দগ্ধ করে ভস্ম করে বিনিঃশেষে। যা থেকে মনে ভয় আসে তাই অমঙ্গল—সেই অমঙ্গলও তুমি হরণ করো। ভয় আসে কোত্থেকে? দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশ থেকে। দ্বিতীয় বস্তু কী? আগে প্রথম বস্তুর খোঁজ নাও। তুমিই প্রথম বস্তু। দ্বিতীয় বস্তু অহং, দেহসুখ। তুমি সেই দেহাভিনিবেশ হরণ করো। কিন্তু তুমি কি চুরি করে পালিয়ে যাও? না, তুমি ধরা পড়ো, ধরা দাও। হরণ করেছ, পরে সেই শূন্যতা পূরণ করো। তুমি নিজেই সেই কারাগৃহের শূন্যতায় বন্দী হয়ে থাকো।

গদাধর বললে নিমাইকে, 'ওঁর অগম্য ব্যবহার বুঝতে পারিনি।

মনে এসেছিল অবজ্ঞা। এখন অনুমতি করুন, আমি ওঁর কাছে দীক্ষা নেব।'

সানন্দে অনুমতি দিল নিমাই। গদাধরের গুরু হল পুণ্ডরীক।

নিমাইয়ের দুই ভাব। 'কখন ঈশ্বরভাবে প্রভু পরকাশ। কখন রোদন করে বোলে মুঞি দাস।' কখনো হুঙ্কার কখনো আর্তি। কখনো বিষ্ণুখট্টায় গিয়ে বসে, কখনো আবার ধুলোয় গড়াগড়ি দেয়। কখনো ঘোষণা করে, আমিই সেই, কখনো আবার ভক্তদের গলা ধরে বলে, কিসে আমার কৃষ্ণে মতি হবে বলে দাও দয়া করে। কখনো অদ্বৈতের মাথায় পা তুলে দেয়, নিজের তত্ত্ব প্রকাশ করে, আবার কখনো দন্তে তৃণ ধরে দাস্যযোগ মেগে বেড়ায়। কখনো নিত্যানন্দের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে পা তুলে দিয়ে সকলের থেকে প্রণাম নেয়, আবার কখনো 'আমাকে কৃষ্ণের কাছে নিয়ে চলো।' বলে এমন কান্না কাঁদে, যে, যে দেখে সেই আবার কাঁদতে বসে সুর মিলিয়ে।

ভগবানের ভাব যখন ধরে তখন তা এক প্রহরের বেশি স্থায়ী হয় না, কিন্তু সেদিন শ্রীবাসের বাড়িতে নিমাই সাত প্রহরিয়া ভাব ধরল। আর-আর দিন দাস্যভাবে নাচে, আর্তি নিয়ে কীর্তন করে, আজ একেবারে সজ্ঞানে, দ্বিধাহীন ক্ষিপ্রতায় বিষ্ণুখট্টায় গিয়ে বসল। বললে, 'আমার অভিষেক করো।'

ভক্তরা গঙ্গাজল আনতে ছুটল। একশো আট ঘট ভরে উঠল দেখতে-দেখতে। আঙিনায় পিঁড়িতে বসিয়ে নিমাইকে স্নান করাতে লাগল সকলে।

শ্রীবাসের দাসীও এই স্নানসেবার সুযোগ নিয়েছে। সেও জল বয়ে আনছে ঘড়া করে কিন্তু তাতে শুধু গঙ্গাজলই নয়, মেশানো আছে কিছু নয়নের জল।

নামই তার দুঃখী।

নিমাই বললে, 'তোমার নাম বদলে গেল আজ থেকে। আজ থেকে তোমার নাম সুখী হয়ে গেল।'

দুঃখীর আনন্দ তখন কে দেখে !

স্নানান্তে নবীন বসনে-লেপনে শোভিত হয়ে নিমাই বসল আবার বিষ্ণুখট্টায়। নিত্যানন্দ ছত্র ধরল। যে যা পারল বিচিত্র উপচারে পূজা করতে লাগল। যার উপচার নেই সে দিল চন্দনলিপ্ত তুলসীমঞ্জরী।

সাত প্রহর ধরে, প্রাতে এক প্রহর কাল থেকে পরদিন সূর্যোদয় পর্যন্ত ব্যক্ত থাকল নিমাই। এরই নাম মহাপ্রকাশ।

যে যা পরতে দিচ্ছে পরছে, খেতে দিচ্ছে খাচ্ছে, যেমনটি সাজতে বলছে সাজছে। ক্লান্তি নেই বিরক্তি নেই বিকৃতি নেই।

এ মহাপ্রকাশ। একে তো শুধু বাইরে দেখছি না, হৃদয়েও দেখছি।

'শ্রীবাস, মনে পড়ে দেবানন্দের বাড়িতে সেই ভাগবত শুনতে গিয়েছিলে ?' বলতে লাগল নিমাই : 'শুনতে শুনতে তুমি কাঁদতে লাগলে বিহ্বল হয়ে, মাটিতে মূর্ছিত হয়ে পড়লে। তুমি কেন কাঁদছ, তোমার কিসের এ আবেশ, অবোধ পড়ুয়া কিছুই বুঝতে পারল না। বললে, এ লোকটা কাঁদছে কেন, হয়েছে কী ? যেমন গুরু তেমনি তার শিষ্য, যেমন কথক তেমনি তার শ্রোতা। সবাই মিলে তোমাকে তারা বাড়ির বার করে দিল। আর দেবানন্দ বারণ করল না, বাধা দিল না –'

'তুমি—তুমি কী করে জানলে ? তুমি তখন কোথায় ?'

'শোনো। তুমি বাড়ির বাইরে বসে বিরলে কাঁদতে লাগলে। তোমার আরেকবার ভাগবত শোনবার অভিলাষ হল। তোমার দুঃখ দেখে আমি তখন বৈকুণ্ঠ হতে চলে এলাম, বসলাম তোমার হৃদয়ে। হৃদয়ে বসে বসে ভাগবত শোনালাম তোমাকে। তোমার সমস্ত দেহ-মন ভাগবত হয়ে উঠল।'

সব কথা মনে পড়ল শ্রীবাসের। নতুন করে কাঁদতে বসল।

অদ্বৈতকে বললে, 'মনে পড়ে একদিন তুমি গীতার একটি

শ্লোকের সম্যক অর্থ বুঝতে পারছিলে না, সারাদিন উপবাস করেছিলে, আমি তোমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে সেই শ্লোকের অর্থ বুঝিয়ে দিয়েছিলাম ?'

'কোন শ্লোকটি বলো তো ?'

'সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্। সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।'

অদ্বৈত স্তব করতে বসল।

ডাকল গদাধরকে। নিমাই বললে, 'তোমার মনে আছে রাজভয়ে সেই পালিয়ে যাচ্ছিলে রাত্রে, খেয়াঘাটে এসে দেখলে নৌকো নেই। রাজার লোক এসে ধরবে, পরিবারের মান-ইজ্জত থাকবে না, কাঁদতে লাগলে অঝোরে। গঙ্গায় ঝাঁপ দেবে, আমি নৌকো নিয়ে হাজির হলাম। নৌকো দেখে তোমার আনন্দ আর ধরে না, কাতরে কেঁদে উঠলে, আমাকে শিগগির পার করো, আমি তোমাকে একজোড়া কাপড় ও এক টাকা বকশিস দেব। আমি তোমাকে পার করে দিলাম। কি, মনে আছে ? তোমাকে পার করে দিয়ে চলে গেলাম বৈকুণ্ঠে। কেন পার করেছিলাম জানো ? তুমি যে অসহায় হয়ে ডেকেছিলে আমাকে।'

গদাধর ভূলুণ্ঠিত হয়ে কাঁদতে লাগল।

'কই শ্রীধর কই ?' হুঙ্কার করে উঠল নিমাই : 'তাকে ধরে নিয়ে এস।'

'কে শ্রীধর ?'

'আমাকে যে নিত্যনিয়মিত কলাপাতা আর খোলা যোগায়। কবে একবার কথা দিয়েছিল তার আর খেলাপ করে নি। খোলাবেচা জ্ঞানে তাকে কেউ চিনল না এখনো।'

'কী করে শ্রীধর ?'

'সর্বরাত্রি হরি বলে, বিনিদ্র কাটায়। প্রতিবেশী পাষণ্ডারা তাকে সহ্য করতে পারে না। বলে, শ্রীধরের ডাকে কানে তালা লাগে,

ঘুমুতে পারি না। পেট ভরে খেতে পায় না, খিদের জ্বালায় রাত জেগে চেঁচায়, পাষণ্ডীরা শ্রীধরের মুণ্ডপাত করে। কিন্তু যাকে শ্রীধর প্রেমভাবে দীঘল আহ্বান করে সেই তাকে রক্ষা করে।'

শ্রীধরকে পাকড়াও করল ভক্তেরা। বিশ্বম্ভরের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিল।

'এস এস, আমাকে দেখ, বলো, আমাকে চিনতে পারো ?'

এ কী, সেই উদ্ধতের শিরোমণি, চঞ্চল যুবক—মুগ্ধ-বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল শ্রীধর।

'তোমার খোলায় কত অন্ন খেয়েছি। কত জিনিস কেড়ে খেয়েছি তোমার হাত থেকে। কি, মনে পড়ে ? চিনতে পেরেছ আমাকে ?'

'কই আর পারলাম!' শ্রীধর মুক্তধারায় কাঁদতে লাগল: 'গঙ্গাপূজা করতাম আমি, তুমি বলতে, যার তুই পূজো করছিস আমিই তার বাপ। কই আর তা বিশ্বাস করতাম! কই আর তাই চিনলাম তোমাকে।'

'এবার তবে রূপ দেখ।'

শ্রীধর দেখল গৌরাঙ্গের পা থেকে গঙ্গা নিঃসৃত হচ্ছে। দক্ষিণে বলরামকে নিয়ে বংশীহাতে দাঁড়িয়ে আছে তমালশ্যামল।

'লোকে তুলসী-চন্দন দিয়ে তোমার চরণ পায়। আমি কি পাব কলার খোলা দিয়ে ?' বলতে বলতে মূর্ছিত হল শ্রীধর।

'শ্রীধর, ওঠো, আমার স্তব করো।'

শ্রীধর উঠে স্তব করতে লাগল। সরস্বতী বসল তার রসনায়।

নিমাই বললে, 'শ্রীধর, বর চাও। তোমার দারিদ্র্য আমি দূর করব। দেব তোমাকে অষ্টসিদ্ধি।'

'প্রভু, আর কত ছলনা করবে ?' গদগদ ভাষে বললে, শ্রীধর।

'না, তোমাকে চাইতে হবে বর। আমার দর্শন যে ব্যর্থ নয় তাই প্রমাণ করতে হবে। সুতরাং প্রার্থনা করো।'

শ্রীধর বললে, 'যে প্রভুকে আমি খোলা পাতা দিয়েছি, যিনি

আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে গিয়েছেন, কলহ করেছেন, তিনিই অচঞ্চল হয়ে আমার হৃদয়ে বসবাস করুন।'

গৌরাঙ্গ বললে, 'শুধু তা কেন? অষ্টসিদ্ধি না নাও আমি তোমাকে এক রাজ্যের রাজা করে দেব।'

'রাজত্ব দিয়ে আমি কী করব? কী করব আমি প্রভুত্ব দিয়ে? আমি রাজত্ব-প্রভুত্ব চাই না। শুধু এই করো যেন সুখে দুঃখে আমি তোমার নাম করতে পারি। নামে-যশে বেশে-বাসে আমার কী হবে? তাতে অহঙ্কার ছাড়া আর পাব কী! শুধু তোমাকে ভালোবাসতে দাও প্রাণ ভরে।'

'তোমার মত বৈষ্ণব আর কে আছে?' বললে নিমাই, 'তাই বেদগোপ্য ভক্তিই তোমার প্রাপ্য। আমি তোমাকে বর দিচ্ছি, আমাতেই তোমার প্রেম হোক। কে বলে তুমি দরিদ্র, কে বলে তুমি নগণ্যের একজন!'

অশ্রুতে ভাসতে লাগল শ্রীধর।

'কলামূলা বেচিয়া শ্রীধর পাইল যাহা।
কোটি কল্পে কোটীশ্বরে না দেখিল তাহা॥'

বৈষ্ণব আচার কী? সতত শ্রীকৃষ্ণস্মরণই সার আচার। স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্তব্যো ন জাতুচিৎ। যে আচারে হৃদয়ে কৃষ্ণস্মৃতি ফুটে থাকে, ভক্তি স্ফূর্তি পায়, তাই বৈষ্ণবের সদাচার। আর যে আচারে কৃষ্ণস্মৃতি ঢাকা পড়ে, ভক্তি মুখ লুকায়, কৃষ্ণবিস্মৃতিই ঘনীভূত হয়, তাই বৈষ্ণবের অসদাচার।

'তৃণ হৈতে নীচ হৈয়া সদা লবে নাম।
আপনি নিরভিমানী, অন্যে দিবে মান॥
তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে।
ভর্ৎসনে-তাড়নে কারে কিছু না বলিবে॥
কাটিলেহ তরু যেন কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মৈলে তবু জল না মাগয়॥

এইমত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিব।
অযাচিত বৃত্তি কিম্বা শাক-ফল খাইব॥
সদা নাম লইব যথা লাভেতে সন্তোষ।
এই ত আচার করে ভক্তিধর্ম-পোষ॥'

সাধুসঙ্গই কৃষ্ণভক্তির জন্মমূল, কৃষ্ণস্মরণের প্রধান সহায়। শেষ পর্যন্ত শঙ্করাচার্যও বললেন, 'ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।' ক্ষণার্ধের সৎসঙ্গও জীবের পক্ষে সেবধি, সর্বাভীষ্টপ্রদ। 'সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ সেবধির্নৃণাম্।' সাধু কে? সৎ কে? ভগবৎ-ভক্তই সাধু, ভগবৎ-ভক্তই সৎ, মহৎ। যে সর্বত্র সমদর্শী, সমচিত্ত, যে প্রশান্ত অর্থাৎ যে ভগবানে স্থিত, যে অক্রোধ, যে শোভন-হৃদয়, যে পরদোষ গ্রহণ করে না, যে ঈশ্বরে প্রীতিমান এবং সেই প্রীতিকেই পরম পুরুষার্থ মনে করে, সংসারে থেকেও যে সংসারে অনাসক্ত, ভগবৎ-ভক্তির অনুষ্ঠানের জন্যে যে পরিমাণ অর্থের দরকার তার অতিরিক্তে যার স্পৃহা নেই, সেই সাধু। কৃষ্ণপ্রেম পাবার প্রধান সাধনও এই সাধুসঙ্গ। আর এই বৈষ্ণবাচার।

'খোলাবেচা শ্রীধর—তাহার এই সাক্ষী।
ভক্তিমাত্র নিল অষ্ট-সিদ্ধিকে উপেক্ষি॥'

এবার ডাক পড়ল মুরারির।

'মুরারি, তুমি অধ্যাত্মচর্চা ছেড়ে দাও।' বললে গৌরাঙ্গ।

'কেন, অধ্যাত্মচর্চা কি ভালো নয়?'

'ভালো কি মন্দ তা আমি বলছি না। কিন্তু অধ্যাত্মচর্চা করতে গেলে আমাকে হারাবে, আমাকে পাবে না। আমি অধ্যাত্মচর্চার ফল নই।'

'জ্ঞানমার্গে লৈতে নারে কৃষ্ণের বিশেষ।' চর্মচক্ষে যখন আমরা সূর্যের দিকে তাকাই তখন কী দেখি? দেখি নির্বিশেষ জ্যোতিঃপুঞ্জ। সূর্যের হাত পা মুখ চোখ আছে, এ আমাদের অনুভব হয় না। যেমন কাচের ঘেরাটোপের মধ্যে রয়েছে এক দীপ। দূর থেকে যদি তাকাই

তবে শুধু এক আভা দেখি, দীপ্তি দেখি, না দেখি শিখা, না বা দীপাধার, না বা ঘেরাটোপ। যদি নিকটে আসি তখন শিখা ও আধার ও আবরণ সব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এমন কি, দীপের সলতে পর্যন্ত দেখি, দেখি বা সলতের মুখের পোড়া দাগ। যে জ্ঞানমার্গের উপাসক সে শুধু ঐ আভাটাই দেখে—দেখে অদ্বয়তত্ত্বের নির্বিশেষ স্বরূপ, কিন্তু যে ভক্তিমার্গের উপাসক যে স্বয়ং কৃষ্ণকে দেখে। শুধু কৃষ্ণের কান্তি নয়, দ্যুতি নয়, দেখে কৃষ্ণের পা দুখানি।

'তুমি তো রামের হনুমান, তোমার আবার অধ্যাত্মচর্চা কী!' বললে নিমাই, 'আর তুমি যদি সেই হনুমান আমিই সেই রাঘবেন্দ্র। আমাকে দেখ।'

মুরারি তাকাল। দেখল বিষ্ণুখট্টায় আর নিমাই বসে নেই, বসে আছে শ্রীরামচন্দ্র। বামে সীতা, দক্ষিণে লক্ষ্মণ ছত্র ধরে আছে।

শ্রীধর দেখল কৃষ্ণ, মুরারি দেখল রাম।

মুরারি মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

মুরারির পদবী গুপ্ত। সে সার্থকনামা। মুরারিকে সে হৃদয়ে গুপ্ত করে রেখেছে।

'হরিদাস কোথায়! হরিদাস কোথায়!' ব্যাকুল হয়ে উঠল নিমাই।

'হরিদাস বাড়ির বাইরে বসে আছে।' ভক্তদের কে বললে।

নিজেই নিমাই ডাক দিল হরিদাসকে; 'হরিদাস আমাকে দর্শন করো।'

'তোমাকে দেখতে আমার অধিকার কী!' বাইরে থেকে বললে হরিদাস, 'আমি দীনহীন কাঙাল, আমি কি তোমার কৃপার যোগ্য? তবু তুমি যতই আমাকে কৃপা করছ আমি ততই বুঝছি আমি কত অধম, কত অকিঞ্চন।'

'হরিদাস, তোমার দৈন্যে আমি বড় ব্যথা পাই। তুমি এস আমার সামনে। আমি তোমাকে দেখি।'

হরিদাসকে ধরে সকলে নিয়ে গেল নিমাইয়ের কাছে।

'যখন তোমাকে ওরা নির্দয়ের মত মারছিল আমি চক্র হাতে নেমে এসেছিলাম বৈকুণ্ঠ থেকে।' বললে নিমাই, 'কিন্তু দুরাত্মাদের কী করে মারি, তুমি যে মনে মনে শুধু ওদেরই কুশল চিন্তা করছিলে, ওদের মঙ্গলের জন্যেই বারে বারে ডাকছিলে আমাকে। আমি যদি পাপিষ্ঠদের সংহার করতাম তবে কি তোমার এই মহত্ত্ব জগৎ জানতে পারত? বুঝত কি ভক্তের মহিমা? আমি কী করলাম? আমি তোমাকে বুকে করে রইলাম। যেমন ছিলাম প্রহ্লাদকে বুকে করে। তোমাকে কোনো ব্যথা বুঝতে দিলাম না। সমস্ত প্রহার নিজে নিলাম গা পেতে, সর্বাঙ্গে তার চিহ্ন লেগে আছে।'

হরিদাস মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

'জ্বলন্ত অনল কৃষ্ণ ভক্ত লাগি খায়।
ভক্তের কিঙ্কর হয় আপন ইচ্ছায়॥
ভক্ত বই কৃষ্ণ আর কিছুই না জানে।
ভক্তের সমান নাহি অনন্ত ভুবনে॥'

'হরিদাস, ওঠ।' ডাকল বিশ্বম্ভর: 'মনোরথ ভরি দেখ আমার প্রকাশ।'

কোথায় কী দেখবে, হরিদাস মহাবেশে অঙ্গনে গড়াগড়ি দিতে লাগল। 'কই, কই আমি তোমাকে পারলাম স্মরণ করতে? আমি দীনাতিদীন স্মরণবিহীন। তোমাকে স্মরণ করতে জানত দ্রৌপদী, জানত প্রহ্লাদ, একবারের মত জেনেছিল অজামিল। বিবসন করতে দ্রৌপদীকে সভামধ্যে টেনে নিয়ে এল দুঃশাসন। দ্রৌপদী স্মরণ করল তোমাকে, আর তুমি তার বস্ত্রে প্রবেশ করলে। তার স্মরণ-প্রভাবে তার বস্ত্র অনন্ত হয়ে উঠল।

'হরিদাস, বর প্রার্থনা করো।'

'প্রভু, যদি এই অকিঞ্চনকে আরো কৃপা করবে তবে আমাকে আরো দীন করো। যেন অভিমানের ছায়াটুকুও হৃদয়ে না

পড়ে। আর যারা তোমার ভক্ত আমি যেন তাদের উচ্ছিষ্ট পেয়ে ধন্য হই।'

'তোমার চরণ ভজে যে সকল দাস।
তার অবশেষ যেন হয় মোর গ্রাস ॥
তোমার স্মরণহীন পাপ জন্ম মোর।
সফল করহ দাসোচ্ছিষ্ট দিয়া তোর ॥
শচীর নন্দন বাপ কৃপা কর মোরে।
কুক্কুর করিয়া মোরে রাখ ভক্ত-ঘরে ॥'

নিমাই বললে, 'আর্তি বিনা প্রেমধন মেলে না। তোমার মিলল সেই প্রেমধন। হরিদাস, তোমার যত ভক্ত নিয়েই আমার ঠাকুরালি। নিরন্তর আমি তোমার দেহে-মনে বাস করছি, তোমাকে যে শ্রদ্ধা করে, জানবে সে আমারই প্রতি ভক্তিমান।' সমবেত ভক্তদের এবার লক্ষ্য করল। বললে, 'যার যা ইচ্ছা বর নাও।'

যার যা ইচ্ছা তাই যাচ্ঞা করতে লাগল। যার যেখানে রতি গাইল তারই বর্ধনা। আর ভক্তবাক্যসত্যকারী বিশ্বম্ভরের মুখে এক কথা· তথাস্তু।

বাইরে পিঁড়ায় বসে মুকুন্দ কাঁদছে। ভক্তিধর্ম মানত না, তাই নিমাই তাকে দর্শন দিচ্ছে না। প্রভু যে তাকে দণ্ড দিয়েছেন এই তো তার প্রিয়তা, তাতেই সে চরিতার্থ। কিন্তু কোটি জন্ম পরেও কি তার দর্শন পাব না? হ্যাঁ, কোটি জন্ম পরে পাবে। তাতেই মুকুন্দ সিদ্ধকাম। অন্তত কোটি জন্ম পরে তো পাব।

আর নিমাইয়ের কৃপাকটাক্ষে এক পলকেই কেটে গেল কোটি জন্ম।

অদ্বৈত বললে, 'প্রভু, সর্বোত্তম, তোমার এই ঐশ্বর্যরূপ আমরা সহ্য করতে পারছি না, তুমি আবার সেই মনোরম নররূপ ধারণ করো।'

'বেশ, আমি তবে চলে যাচ্ছি।'

নিমাইয়ের দেহ খাট থেকে মাটিতে পড়ে পেল। সে মূর্ছা আর

কাটে না। নাকে নিঃশ্বাস নেই, নাড়িতে স্পন্দন নেই, সর্ব অঙ্গ অসাড়। তবে কি নিমাই সত্যি সত্যি চলে গেল ?

সমস্ত রাত কাটল, প্রভাত হল, তবু নিমাইয়ের চেতন নেই।

তবে কি এবার শচীমাকে খবর দিতে হয় ?

প্রখর জ্যৈষ্ঠ মাস, দুপ্রহর বেলা প্রায় উত্তীর্ণ হল, তবু নিমাই নিষ্প্রাণের মত পড়ে আছে। আর কী, ভক্তরা বললে, এবার তবে কীর্তন আরম্ভ করি।

কীর্তন সুরু হল। ক্রমে ক্রমে আনন্দকলরোল।

কার্তনের গুণে নিমাই স্পন্দিত, পুলকিত হয়ে উঠল। তার ধূলি-ধূসর দেহে জাগল স্বভাবলাবণ্য। চোখ মেলল নিমাই। কুণ্ঠিত মুখে বললে, 'এ কী ? এত বেলা হয়ে গিয়েছে ? তোমরাও সবাই বসে আছ চুপ করে।'

'আর ফাঁকি চলবে না।' বললে শ্রীবাস, এবার সমস্ত জারিজুরি ধরে ফেলেছি।'

'ফাঁকি ? কিসের ফাঁকি ?' নিমাই সরলমুখে তাকিয়ে রইল।

'বা, তুমি কাল থেকে অচেতন হয়ে পড়ে আছ। তাই তোমাকে ঘিরে বসে আছি আমরা।'

'ছি ছি, আমার জন্যে তোমাদের কত কষ্ট হল বলো তো ? কত তোমাদের মূল্যবান সময় নষ্ট হল।' নিমাই অনুতপ্ত স্বরে বললে, আমাকে ক্ষমা করো।'

নিত্যানন্দ বললে, 'থাক ও-সব। চলো স্নান করে খাইগে এখন।'

'কৃষ্ণলীলামৃতসার, তার শত শত ধার,
দশ দিকে বহে যাহা হৈতে।
সে গৌরাঙ্গলীলা হয়, সরোবর অক্ষয়,
মনোহংস চরাহ তাহাতে॥'

২৯

যশোর জেলার বুঢ়ন গ্রামে যবনকুলে জন্ম হরিদাসের।

জাতিকুল নিরর্থক, যে-কোনো অবস্থায় বিষ্ণুভক্তি হতে পারে তাই বোঝাবার জন্যে এই নীচকুল নির্বাচন।

'জাতিকুল নিরর্থক—সভে বুঝাইতে।
জন্মিলেন নীচকুলে প্রভুর আজ্ঞাতে॥
অধম কুলেতে যদি বিষ্ণুভক্ত হয়।
তথাপি সে পূজ্য—সর্বশাস্ত্রে কয়॥
উত্তমকুলেতে জন্মি শ্রীকৃষ্ণ না ভজে।
কুলে তার কি করিবে, নরকেতে মজে॥
এই সব বেদবাক্য সাক্ষী দেখাইতে।
জন্মিলেন হরিদাস অধমকুলেতে॥
প্রহ্লাদ যে হেন দৈত্য, কপি হনুমান।
সেইমত হরিদাস নীচ জাতি নাম॥'

বুঢ়ন ছেড়ে বেনাপোলে এসে জঙ্গলের মধ্যে কুটির তৈরি করেছে হরিদাস। সেখানে বসে সে, কী আশ্চর্য, তুলসীর সেবা করে আর রাত্রি-দিন নাম করে তিন লক্ষ। এর মধ্যে দু লক্ষ নাম মনে-মনে, আরেক লক্ষ সশব্দে, উচ্চরোলে। কেউ শুনুক সজ্ঞানে, এরই জন্যে সরব উচ্চারণ। মানুষ হও মানুষ, নয় তো পশু-পাখি কীট-পতঙ্গ যে আছে কাছে, শোনো নামধ্বনি। দেখ মায়াবন্ধন থেকে পাও কিনা ত্রাণের উপায়।

পরমকরুণ হরিদাস। জীবমঙ্গলে নিযুক্ত করেছে নামকে।

ব্রাহ্মণের ঘরে ভিক্ষে করে খায়। নিষ্কিঞ্চনভাবে অবস্থান করে।

যে দেখে সেই আকৃষ্ট হয় হরিদাসে। এমন লোক আর হয় না। ভজন ছাড়া আর তার লক্ষ্য নেই জীবনে। চিন্তা নেই। উৎসাহ নেই। দেহ-দৈহিক নেই। শব্দে-নিঃশব্দে শুধু নাম, শুধু ভজন-পূজন। নামকীর্তনের প্রকটমূর্তি।

রামচন্দ্র খানের চোখ টাটাল। সে, যাকে বলে দেশাধ্যক্ষ, ও-অঞ্চলের জমিদার। সকলে হরিদাসকে গণ্য-মান্য করে, ভালোবাসে, এ তার অসহ্য হয়ে উঠল। কে একটা চালচুলোহীন লোক, পরের ঘরে ভিক্ষে করে বেড়ায়, বনের মধ্যে পাতার কুটিরে বাস করে, তার কি না এত প্রতিপত্তি! সকলের শ্রদ্ধাভক্তি কি না একা তারই জন্যে। আর সে এতবড় একটা জমিদার, দেশের মাথা, তার দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। দাঁড়াও, হরিদাসের জারিজুরি বার করে দি।

ওর সমস্ত জৌলুস তো সাধুতার, দুর্ভেদ্য বৈরাগ্যের। ওর সেই বৈরাগ্যের দেয়ালে যদি ছিদ্র করতে পারি, যদি ওর সংযমের বাঁধ দিতে পারি টলিয়ে, তাহলেই ও লোকচক্ষে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। ওর সর্বনাশের আর বাকি থাকবে না।

সুন্দরী গণিকা লক্ষহীরার শরণ নিল রামচন্দ্র।

বললে, 'তুমি হরিদাসকে চেন?'

'কে হরিদাস? বৈরাগী হরিদাস?'

'হ্যাঁ, ঐ জঙ্গলে যে কুটির বেঁধে বাস করে নির্জনে।'

'চিনি। নাম শুনেছি।'

'তোমাকে তার বৈরাগ্যধর্ম নাশ করতে হবে।' গম্ভীর হল রামচন্দ্র।

এক মুহূর্ত বা দ্বিধা করল লক্ষহীরা।

'কি, পারবে না? পারবে না ওর মনোহরণ করতে? ওর ভজন ভুলিয়ে দিতে?'

'পারব।' যৌবনগর্বিতা গণিকা দৃঢ় হল এবার: 'তিন দিনেই ওর মতিগতি ফিরিয়ে দেব। ঘটাব চিত্তচাঞ্চল্য।'

'বেশ, তবে আমার পাইক সঙ্গে দিচ্ছি, যথাকালে তোমাকে আর হরিদাসকে যেন বেঁধে আনে একসঙ্গে।'

'না, আগে একবার আমি নিজে গিয়ে দেখি। সঙ্গ করি।'

বিলাসবিভ্রমের সাজ ধরল গণিকা। নিশাযোগে অনাহূত দাঁড়াল এসে হরিদাসের দরজায়। দেখল কুটিরের সামনেই তুলসীমঞ্চ। কেন কে বলবে, নমস্কার করল তুলসীকে। ঘরের মধ্যে বসে আছে হরিদাস। কে জানে কেন, তাকেও নমস্কার করল লক্ষহীরা। কেউ তাকে কিছু বলে দেয়নি, শিখিয়ে দেয়নি, তবু কিসের প্রেরণায় তার এই প্রণিপাত? যার ধর্ম নষ্ট করতে এসেছে, কেন তাকে এই সংবর্ধনা? এত বর্ণাঢ্য ফুলফল থাকতে কিসের তুলসীমঞ্জরী! নিজেকেই নিজে বুঝতে পারে না লক্ষহীরা। এ বুঝি বা বৈরাগীর মাহাত্ম্য। তার ভজনস্থানের মহিমা।

লক্ষহীরা উঠে এল ঘরের দাওয়ায়। প্রদীপ্ত দীর্ঘতায় দাঁড়াল দরজা ধরে। দেখ আমি রমণীয় কিনা। লোভনীয় কিনা।

উদাসীন হরিদাস। যেন আর কিছু দেখছে। আর কিছু ভাবছে।

দাওয়ায় বসল লক্ষহীরা। যৌবনকে অনাবৃত করতে লাগল। বললে, 'ঠাকুর, প্রথম যৌবনে তুমি কী অনিন্দ্যসুন্দর! তোমাকে দেখে আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল হয়েছে। কোন নারীর না হবে! কে বলো থাকবে নিস্পৃহ হয়ে। তোমার স্পর্শের জন্যে আমি কাঙাল হয়েছি, তোমাকে না পেলে বাঁচব না কিছুতেই।'

'তোমার সঙ্গম লাগি লুব্ধ মোর মন।
তোমা না পাইলে প্রাণ না যায় ধারণ॥'

হরিদাস রুষ্ট হল না। মধুর স্বরে বললে, 'বেশ, ভালো কথা, তোমার বাসনা পূর্ণ করব। কিন্তু দেখছ আমার প্রত্যহের নিয়মিত নামসংখ্যা এখনো পূর্ণ হয়নি। নামসংখ্যা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আমি অন্য কাজ করি না। সুতরাং নামসংখ্যার সমাপ্তি পর্যন্ত অপেক্ষা

করো। নামসমাপ্তি হলেই আমি তোমার আদেশ পালন করব। তুমি ততক্ষণ শোনো আমার নামকীর্তন।

তাই শুনি। লক্ষহীরা স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

রাত্রিকাল। নির্জন বনের মধ্যে গোপন কুটির, সাক্ষাতে উপযাচিকা সঙ্গমোৎসুকা যুবতী নারী,—অথচ যুবক হরিদাস তন্ময় হয়ে নাম করে চলেছে। নামই কামকে রেখেছে ঘুম পাড়িয়ে।

রাত্রিমধ্যে নামসংখ্যার সমাপ্তি হল না। নাম করতে করতে ভোর হয়ে গেল।

প্রভাত হতে ক্লান্ত হয়ে চলে গেল লক্ষহীরা। রামচন্দ্রকে গিয়ে বললে, 'আজ শুধু মৌখিক স্বীকৃতি নিয়ে এসেছি। কাল নিশ্চয়ই তৃপ্ত হবে আকাঙ্ক্ষা।'

সন্ধ্যাগমে আবার লক্ষহীরা এসেছে হরিদাসের কুটিরে।

হরিদাস বললে, 'কাল তোমার খুব কষ্ট হয়েছে।'

'কষ্ট ?' বিভোরের মত তাকাল লক্ষহীরা।

'বা, কাল একটুও কোথাও শুতে পারোনি, ঘুমুতে পারোনি, ঠায় বসে রয়েছ নিঃশব্দে। যে আশা নিয়ে বসেছিলে, তাও পারিনি মেটাতে।' হরিদাসের কণ্ঠে কাতরতা ঝরে পড়তে লাগল : 'আমার অপরাধ নিও না। আমাকে মার্জনা কোরো।'

'প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিব।' এই বৈষ্ণবোপদেশ। 'জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণের অধিষ্ঠান।' রূঢ়কথা বলে মনে কষ্ট দেওয়া বাক্যদ্বারা উদ্বেগ আর মনে মনে অন্যের অনিষ্ট চিন্তা করা মনের দ্বারা উদ্বেগ। আর উদ্বেগ হলেই ভজনের ব্যাঘাত।

লক্ষহীরা আবার তুলসীমঞ্চকে প্রণাম করল। আবার হরিদাসকে। বসল দ্বারপ্রান্তে। বললে, 'মনোবাঞ্ছা আজকে নিশ্চয়ই পূর্ণ হবে।'

'নিশ্চয়ই হবে।' আশ্বস্ত করল হরিদাস : 'আমার সংখ্যানামকীর্তন শেষ হোক। পরে নিশ্চয়ই আমি তোমাকে অঙ্গীকার করব। তুমি ততক্ষণ আমার নামকীর্তন শোনো।'

অ—১॥১৮

কাল সমস্ত রাত্রি শুনেছে। বিরক্তি ধরেনি এতটুকু। ক্লান্তি আনেনি একবিন্দু। সে নাম ঘুমকে তাড়িয়েছে। বসিয়ে রেখেছে একাসনে।

মন্দ কি, ভুবনমঙ্গল হরিনাম আর একটু শুনি। শুধু শুনি না, বলি, জিহ্বায় উচ্চারণ করি।

'হরি হরি।' কখন হঠাৎ বলে ফেলেছে লক্ষহীরা।

আবার রাত ভোর হতে চলল, নামকীর্তনে বিচ্ছেদ নেই। 'উষি-মিষি' করে উঠল গণিকা। ঠাকুর, আর কত আমাকে ছলনা করবে?

হরিদাস বুঝতে পারল তার মনের কথা। বললে, 'তুমি ভুল বুঝো না। মোটেই ছলনা করছি না তোমাকে। এক মাসে এক কোটি নাম নেব, এই এক ব্রত নিয়েছি। আজ সেই ব্রত সাঙ্গ হবে এমনি আশা করেছিলাম। কিন্তু সমস্ত রাত ধরে নাম করেও তার পূরণ হল না। অল্পই আর বাকি আছে। কাল নিশ্চয়ই শেষ হবে। আর তখন স্বচ্ছন্দে, অবাধে আমি তোমার সঙ্গ করব।'

রামচন্দ্রকে সব বললে ফের লক্ষহীরা।

আবার সন্ধ্যা হতেই হরিদাসের ঘরের দুয়ারে অতিথি হল।

যথারীতি প্রণাম করল তুলসীকে, হরিদাসকে, আর নাম শুনতে-শুনতে ক্ষণে-ক্ষণে বলে উঠতে লাগল: 'হরি-হরি! হরি-হরি!'

প্রসন্ন-উজ্জ্বল মুখে বললে হরিদাস, 'আজ আমার সংখ্যানাম পূর্ণ হবে। তখন তোমার মনের বাসনাও পূর্ণ করব।'

কীর্তন করতে-করতে আজও রাত প্রভাত হল। হরিদাস বললে, 'এতক্ষণে আমার সংখ্যাপূর্তি হল। বলো, মনে এখন তোমার কিসের বাসনা?'

'কৃষ্ণসেবার বাসনা।' লক্ষহীরা হরিদাসের পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল। বললে, 'প্রভু, আমার পাপের অন্ত নেই, তবু কৃপা করে নিস্তার করুন আমাকে। আমি আমার নিজের বুদ্ধিতে আসিনি, রামচন্দ্র খান আমাকে পাঠিয়েছে—'

'আমি সব জানি।' বললে হরিদাস, 'তার জন্যে রামচন্দ্রের

প্রতি আমার দুঃখও নেই, রাগও নেই। আমি বরং তোমারই জন্যে অপেক্ষা করেছিলাম।'

'আমার জন্যে ?' লক্ষহীরা স্তম্ভিত হয়ে গেল : 'এক পাপাচারিণী গণিকার জন্যে ?'

'রামচন্দ্র যেদিন প্রথম তোমাকে পাঠাবার বন্দোবস্ত করল, আমি তো সেদিনই বাড়ি ছেড়ে আর কোথাও চলে যেতে পারতাম। কিন্তু গেলাম না কেন ? গেলাম না, শুধু তোমাকে উদ্ধার করব বলে।'

'সেইদিন আমি যাইতাঙ এ স্থান ছাড়িয়া।
তিনদিন রহিলাঙ তোমা-নিস্তার লাগিয়া॥'

'তবে কৃপা করে বলুন, কী করে আমার ভবক্লেশ দূর হবে।'

'তোমার যা-কিছু আছে ঘরের দ্রব্য, সব ব্রাহ্মণকে দান করে দাও। তারপর আমার এই কুটিরে এসে বাস করো।'

'আপনার কুটিরে ?' লক্ষহীরা আকাশ থেকে পড়ল।

'হ্যাঁ, নইলে আর কোন ঘর আছে তোমাকে আশ্রয় দেবে ? এখানে থেকে সর্বদা হরিনাম করবে আর তুলসী সেবা করবে।' হরিদাস বললে উদারস্বরে : 'আর এতেই পাবে তুমি কৃষ্ণচরণ। আর তাতেই ভববন্ধনের অবসান।'

এই উপদেশ দিয়ে হরিদাস বেনাপোল ছেড়ে চলে গেল চাঁদপুর, সপ্তগ্রামের কাছাকাছি।

আর, কী করল লক্ষহীরা ?

সমস্ত গৃহবিত্ত ব্রাহ্মণদের দান করল। মাথা মুড়ল। একবস্ত্রে ঘর ছাড়ল। ঘর ছেড়ে চলে এল হরিদাসের কুটিরে। দিনে-রাত্রে তিন লক্ষ নাম করতে লাগল।

কিন্তু জীবনধারণের উপায় কী ? উপায় চর্বণ আর উপবাস। ফল ? ফল প্রেমানন্দ।

'তুলসী-সেবন করে চর্বণ উপবাস।
ইন্দ্রিয় দমন হৈল প্রেমের প্রকাশ॥

প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হৈলা পরম মহান্ত।
বড় বড় বৈষ্ণব তাঁর দর্শনেতে যান ত॥
বেশ্যার চরিত্র দেখি লোকে চমৎকার।
হরিদাসের মহিমা কহে করি নমস্কার॥'

মহৎকৃপাই কৃষ্ণভক্তির মূল। মহতের কৃপা ছাড়া ভক্তি অলভ্য। 'মহৎ কৃপা বিনা কোন কর্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়।' কৃষ্ণভক্তির উন্মেষ তো দূর-স্থান, মহতের কৃপা ছাড়া সংসারবন্ধনেরও ক্ষয় নেই।

শুধু সাধুসঙ্গেও হবে না, যদি সাধুকৃপা না লাভ হয়। সাধুসঙ্গ হল অথচ কোনো অপরাধের দরুণ সাধুকৃপা লাভ হল না, তাহলে পাব না ভক্তিফল। তবে সঙ্গ থেকেই কৃপালাভের সম্ভাবনা। আর যদি কোনো সাধুভক্তের কৃপায় কারুর মঙ্গলোদয় হয়, হরিকথায় শ্রদ্ধা জাগে, আর সে যদি সংসারে অত্যন্ত বিরক্তও না হয় আসক্তও না হয়, তাহলেই তার ভক্তি সিদ্ধিপ্রদ। আর কী সে সিদ্ধি? সেই সিদ্ধি প্রেম। 'ভক্তিফল প্রেম হয়—সংসার যায় ক্ষয়।' তাই ভগবৎকৃপাও ভক্তকৃপাসাপেক্ষ।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ বলছেন শ্রীকৃষ্ণ, 'আমার ত্রিগুণাত্মিকা অলৌকিকী মায়া নিতান্ত দুস্তরা। একমাত্র আমারই শরণাগত হয়ে যারা আমাকে ভজনা করে, শুধু তারাই এই মায়া উত্তীর্ণ হতে পারে।'

আর, প্রহ্লাদ বলছে তার গুরুপুত্রকে, যে পর্যন্ত নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষদের চরণধূলি দ্বারা অভিষেক না হয়, সে পর্যন্ত মানুষের মতি ভগবৎচরণ স্পর্শ করতে পারে না। আর শ্রীকৃষ্ণচরণে মতি হলেই সমস্ত অনর্থের অপগম।

সুতরাং মহৎকৃপা ছাড়া ভগবানে রতি হয় না, আর ভগবানে রতি না হলে অনর্থনিবৃত্তি, সংসারনিবৃত্তিও হবার নয়।

চাঁদপুরে বলরাম আচার্যের ঘরে এসে উঠল হরিদাস। হিরণ্য দাস

আর গোবর্ধন দাস মুলুকের দুই মজুমদারের পুরোহিত বলরাম। রঘুনাথ দাস তখন বালক, পাঠশালার ছাত্র। প্রায়ই সে আসে হরিদাসের কাছে, যে নির্জনে পর্ণশালায় বসে কীর্তন ছাড়া আর কিছু জানে না। হরিদাসের কৃপা রঘুনাথের উপর গিয়ে পড়ল, যার ফলে পরবর্তী কালে নিমাইয়ের কৃপা পেল রঘুনাথ।

একদিন বলরাম বহু মিনতি করে হরিদাসকে মজুমদারদের সভায় নিয়ে গেল। হরিদাসকে দেখে দু ভাই, হিরণ্য আর গোবর্ধন, পায়ে পড়ে প্রণাম করল, সম্মানিত আসন দিল বসতে। পণ্ডিতসভায় অনেক সজ্জন বিদ্বান উপস্থিত, স্বভাবতই নাম-মাহাত্ম্যের কথা উঠল। কেউ বললে, নামই মোক্ষলাভের উপায়। হরিদাস, তুমি প্রত্যহ তিন লক্ষ নাম কর, তুমিই বল নামের ফল কী ?

হরিদাস বললে, 'পাপক্ষয় আর মোক্ষ, এরা নামের প্রত্যক্ষ ফল নয়। নামের প্রত্যক্ষ ফল কৃষ্ণপ্রেম। কৃষ্ণপ্রেম হলে আর পাপ কোথায়, মোক্ষই বা কতদূর! সূর্য উঠলে অন্ধকার যেমন চলে যায়, তেমনি প্রেমোদয় হলে আর পাপ থাকে না, মুক্তিও পাওয়া যায় সর্বত্র। মোক্ষ আর পাপক্ষয় নামের আনুষঙ্গিক ফল। কিন্তু যে ভক্ত, কৃষ্ণ দিতে চাইলেও মুক্তি সে ছোঁয় না।'

মুক্তি ? মজুমদারদের আরিন্দা, খাজনা আদায়ের কর্তা, গোপাল চক্রবর্তী জিগগেস করল,—মুক্তি হয় কিসে ?

মুক্তি তো তুচ্ছ ফল। মাত্র নামাভাস থেকেই মুক্তিলাভ করা যায়।

যেমন করেছিল অজামিল। সে মহাপাপী, কিন্তু যে মুহূর্তে পুত্রকে ডাকবার ছলে আভাসমাত্র চার অক্ষর 'নারায়ণ' উচ্চারণ করেছে, সেই মুহূর্তেই তার পাপরাশি ভস্ম হয়ে গেছে। কোটিজন্মকৃত পাপেরও ঘটেছে প্রায়শ্চিত্ত। বিষ্ণুদূতরা চলে আসতেই তাদের সঙ্গলাভ হবার দরুণ তার চিত্তে নির্বেদ উপস্থিত হল। ইন্দ্রিয়বর্গকে বিষয় থেকে প্রত্যাহরণ করে আত্মাতে সে মনঃসংযোগ করল। তারপর চিত্তের

একাগ্রতায় দেহ থেকে আত্মাকে বিমুক্ত করে ভগবানে নিযুক্ত করল। চলে গেল বৈকুণ্ঠে। যযৌ যত্র শ্রিয়ঃপতিঃ।

নামাভাসই বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির হেতু।

'নামাভাসে মুক্তি হয় সর্বশাস্ত্রে দেখি।
শ্রীভাগবতে তাহাঁ অজামিল সাক্ষী॥
হরিদাস কহে—কেনে করহ সংশয়।
শাস্ত্রে কহে—নামাভাসমাত্রে মুক্তি হয়॥'

কিন্তু গোপালের এসব যুক্তিহীন ভাবুকতা সহ্য হল না। হরিদাসকে সে উপহাস করে উঠল। উপস্থিত পণ্ডিতদের সম্বোধন করে বললে, 'ভাবুকের কথা শুনুন সকলে। কোটিজন্ম ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন করেও যে মুক্তি পাওয়া যায় না, এই ভাবুকের কথায় তা কিনা মাত্র নামাভাসেই পাওয়া যাবে অনায়াসে। নির্বুদ্ধিতার স্পর্ধা আর কতদূর যেতে পারে? তপস্যা-টপস্যা সব চুলোয় গেল, শুধু ছল করে নাম করলেও নাকি মুক্তি!'

'আমাকে দোষ দেবেন না।' বিনীত কণ্ঠে বললে হরিদাস, 'এ স্বয়ং শাস্ত্রের কথা।'

'নামাভাসমাত্রেই যদি মুক্তিলাভ হয়, ভক্তরা তবে তা হাত বাড়িয়ে নেয় না কেন?' ক্রুদ্ধ-ভঙ্গি করল গোপাল; 'কেন তবে তারা কষ্ট করে সাধন-ভজন করে?'

'বলেছি তো, ভক্তিসুখের কাছে মুক্তি অত্যন্ত তুচ্ছ।' বললে হরিদাস, 'সাযুজ্যমুক্তিতে কি আনন্দ নেই? আছে। কিন্তু তাতে আনন্দের বৈচিত্র্য নেই, চমৎকারিতা নেই। যে ভক্তির এই আনন্দ-চমৎকারিতার স্বাদ পেয়েছে, সে আর ব্রহ্মানন্দকে চায় না! সমুদ্র পেলে কে আর চায় গোষ্পদকে?'

কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান হারাল গোপাল। সে বাজি ধরল। বললে, 'বেশ, বাজি ধরো, যদি শাস্ত্রের প্রমাণে নামাভাসে মুক্তি না হয়, তাহলে তোমার নাক কেটে দেব।'

'স্বচ্ছন্দে।' হরিদাস এক কথায় রাজি হয়ে গেল।

কিন্তু যদি শাস্ত্র-প্রমাণে বিপরীত সাব্যস্ত হয়, তাহলে কী হবে? গোপাল কী করবে? সে দিক দিয়ে কোনো সর্ত আরোপ করল না হরিদাস। হরিদাসের মনে কোনো ক্রোধ নেই, কাঠিন্য-কার্পণ্য নেই।

সভাস্থ সকলে হাহাকার করে উঠল। নামমাহাত্ম্যকে অবজ্ঞা করছে গোপাল, আর নামমূর্তি স্বয়ং হরিদাসকে, কী না জানি অমঙ্গল হয় গোপালের!

বলরাম খেপে উঠল, গোপালকে লক্ষ্য করে বললে, 'তুমি এক মহাপণ্ডিত মহাতার্কিক এসেছ। যারা ঘটাকাশ পটাকাশ করে, যাদেরকে সকলে ঘট-পটিয়া বলে, তাদের একজন হয়ে তুমি ভক্তির কী বুঝবে?'

মজুমদাররা দু ভাই আরো চটল। চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দিল গোপালকে।

সমস্ত সভা হরিদাসের পায়ে পড়ল। আমাদের কোনো দোষ নিও না।

'বা, তোমাদের কী দোষ! অজ্ঞ ব্রাহ্মণ, তারই বা কী দোষ!' করুণ নেত্রে গোপালের দিকে তাকাল হরিদাস: 'তার মন তর্কনিষ্ঠ। কিন্তু নামমাহাত্ম্য তো তর্কের গোচর নয়। নাম চিৎস্বরূপ, প্রকৃতির অতীত, অপ্রাকৃত। তাই প্রাকৃত জগতের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তর্ক করে নামমহিমা আয়ত্ত করা যায় না। সে আয়ত্তির বিষয় নয়, আস্বাদের বিষয়। আর যেখানে বিষয় অপ্রাকৃত, সেখানে শাস্ত্রের উক্তি ছাড়া কিছু নেই নির্ভর করবার।'

'তর্কের গোচর নহে নামের মহত্ত্ব।
কোথা হৈতে জানিবে সে এইসব তত্ত্ব?'

'কিন্তু আপনাকে কী রকম অপমান করল গোপাল—'

'না, না, আমার জন্যে কারুর কিছু দুঃখ পেতে হবে না।' অদোষদর্শী হরিদাস বললে, 'কৃষ্ণ সকলের কুশল করুন।'

হিরণ্য দাস গোপালকে বারণ করে দিল, তার বাড়িতে যেন না ঢোকে। যদিও গোপালের দোষ হরিদাস ধরেনি, তবুও ভগবান তাকে শাস্তি দিলেন। গোপালের কুষ্ঠ হল, নাক খসে পড়ল, হাতের আঙুল কোঁকড়া হয়ে গেল।

এ কী অঘটন!

ভক্ত অজ্ঞের দোষ ক্ষমা করে, কিন্তু ভগবান ভক্তনিন্দা সইতে পারে না।

'যদ্যপি হরিদাস বিপ্রের দোষ না লইল।
তথাপি ঈশ্বর তারে ফল ভুঞ্জাইল॥
ভক্তের স্বভাব—অজ্ঞের দোষ ক্ষমা করে।
কৃষ্ণের স্বভাব—ভক্তনিন্দা সহিতে না পারে॥'

গোপালের কথা জেনে ব্যথায় ম্লান হয়ে গেল হরিদাস। বলরামের থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল শান্তিপুর। অদ্বৈতের সঙ্গে মিলতে।

৩০

অদ্বৈতের সঙ্গে মিলল হরিদাস। দণ্ডবৎ প্রণাম করল। অদ্বৈত তাকে বদ্ধ করল আলিঙ্গনে।

নির্জনে গঙ্গাতীরে ছোট একটি ঘর বা গোফা তৈরি করে দিল। এখানে বসে তুমি ভাগবতের আর গীতার ভক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যা শোনাও।

ভক্তি দশ রকম। এক সাধন-ভক্তি আর ন'রকম সাধ্যভক্তি। যতক্ষণ পর্যন্ত রতি বা প্রেমাঙ্কুর না জন্মায়, ততক্ষণ সাধন-ভক্তি। আর সাধ্যভক্তি রতি, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব আর মহাভাব।

রতি হচ্ছে ভালোবাসার উদয়-উষা। রতি গাঢ় হলেই প্রেম। শ্রীকৃষ্ণে মনোগতি অবিচ্ছিন্না—অনন্যমমতাই প্রেমভক্তি। প্রেম পরম কাষ্ঠায় পৌঁছে যখন চিত্তকে দ্রবীভূত করে, তখন তা স্নেহ। স্নেহ গাঢ় হয়ে যখন বক্রতা বা কুটিলতা অবলম্বন করে নবতন মাধুর্য আস্বাদের লোভে, তখন তা মান। মান যখন গাঢ় হয়ে সম্ভ্রম বা সঙ্কোচবোধ বর্জন করে, তখন তা প্রণয়। প্রণয়ের উৎকর্ষে কঠিন দুঃখও যখন সুখের মত অনুভূত হয়, তখন তা রাগ। রাগ যখন নতুন বৈচিত্রী ধারণ করে প্রিয়কে নতুনতরো অনুভবে আনন্দিত করে, তখন তা অনুরাগ। অনুরাগে মাধুর্যতৃষ্ণার উপশম নেই। 'তৃষ্ণা-শান্তি নহে তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তর।' অনুরাগের উৎকর্ষে যখন অশ্রুকম্প ইত্যাদি সাত্ত্বিক চিহ্ন দেহে ফুটে ওঠে, সমস্ত বিধিনিষেধকে নস্যাৎ করে দেয়, তখন তা ভাব। আর ভাবে যখন প্রিয়মিলনহেতু আনন্দের উন্মত্ততা জাগে, তখনই তা মহাভাব।

আর গীতা কী বলে ?

গীতা বলে, মৎকর্মপরমো ভব। আমার প্রীতির জন্যে কাজ করো। শ্রবণ কীর্তন অর্চন-বন্দন করো। যদি তা না পারো, আমাতে যুক্ত হয়ে সর্বকর্মফল ত্যাগ করো। অভ্যাসের চেয়ে জ্ঞান বড়, জ্ঞানের চেয়ে ধ্যান বড়, ধ্যানের চেয়ে আরো বড় কর্মফলের পরিহার। আর সেই ত্যাগেই পরা শান্তি।

ভগবানের প্রিয় হও।

কে ভগবানের প্রিয় ?

যে কাউকে দ্বেষ করে না, সকলের প্রতি যে মিত্রতাভাবাপন্ন, দয়ালু, মমত্ববুদ্ধিহীন, নিরহঙ্কার, সুখে-দুঃখে সমচিত্ত, যমী, সদানন্দ, সমাহিতচিত্ত ও সংযতস্বভাব, দৃঢ়বিশ্বাসী আর ঈশ্বরে শরণাগত, সেই ভগবানের প্রিয়। যে কাউকে উদ্বিগ্ন করে না, বা যাকে কেউ উদ্বিগ্ন করতে পারে না, যার হর্ষ, অমর্ষ, ভয়, উদ্বেগ, কিছু নেই, যে নিস্পৃহ, অনলস, শুচিসুন্দর ও উদাসীন, যার মন পীড়িত বা ব্যথিত হতে জানে

না, বা যে ফল কামনা করে কর্মারম্ভ করে না, সেই ভক্ত, সেই ভগবানের প্রিয়। যে হৃষ্ট হয় না, দ্বিষ্ট হয় না, যে বীতশোক বীতাকাঙ্ক্ষ, শুভাশুভ বিচার করে কাজে প্রবৃত্ত হয় না, অর্থাৎ যার কর্ম পুণ্য বা পাপদ্বারা প্ররোচিত নয়, যার শত্রু-মিত্রে, শীতে-উষ্ণে, সুখে-দুঃখে, মানে-অমানে, নিন্দা-স্তুতিতে সমবুদ্ধি, যে সংযতবাক, যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট, গৃহাদিতে মমতাভিমানশূন্য, অথচ যে স্থিরমতি, সেই ভক্তিমানই ভগবানের প্রিয়। ভগবানের প্রিয়ত্ব-অর্জনে যত্নপর হও।

হরিদাস অদ্বৈতকে বললে, 'তুমি আমাকে কেন রোজ খেতে দিচ্ছ? এখানে প্রকাণ্ড কুলীন-সমাজ, মহা-মহা বিপ্র সব উপস্থিত, আমার মত নগণ্য-নীচকে আদর করতে তোমার ভয় হয় না? কে জানে, তোমার হাতের সেবা নিতে আমারই বোধ হয় অপরাধ হচ্ছে।'

অদ্বৈত বললে, 'তুমি খেলে কোটি ব্রাহ্মণভোজনের সমান হয়।'

'কী যে বলো।'

'আমি যা করছি, সব শাস্ত্রমত।'

সহজ কথা নয়, অদ্বৈত শ্রাদ্ধপাত্র ভোজন করাল হরিদাসকে।

বেদবিদ ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কাউকে শ্রাদ্ধের অন্ন ভোজন করাতে নিষেধ আছে শাস্ত্রে। হরিদাস ভক্তিযোগে ব্রাহ্মণাধিক হয়ে উঠেছে। তাই তাকে তার পিতৃশ্রাদ্ধের অন্ন খাওয়াতে দ্বিধা করল না অদ্বৈত।

কিন্তু অদ্বৈতের আত্মীয়রা রুষ্ট হল। তারা জলস্পর্শ করলে না। কাজেকাজেই সবান্ধবে অদ্বৈতও উপবাসী রইল সেদিন।

পরদিন গিয়ে আত্মীয়দের ফের অনেক অনুনয় বিনয় করল অদ্বৈত। না খাও, সিধে নাও, নিজেরা রান্না করে খাও। এ প্রস্তাবে রাজি হল কুটুম্বেরা। কিন্তু আগুন কই? আগুন ছাড়া রাঁধি কি করে?

দারুণ বৃষ্টি সুরু হয়ে গেছে। আর সেই বৃষ্টিতে সারা গাঁয়ের আগুন নিবে গেল। শুধু সেই গ্রামে নয়, পার্শ্ববর্তী গ্রামেও। কুটুম্বেরা আগুন পেলনা কোথাও। ফলে রান্না করা হলনা। ব্রাহ্মণের

দল অভুক্ত রইল। ক্রমে বাড়তে লাগল খিদের তাড়না। একটা কিছু বিহিত না করলে যে মারা যাই।

কুটুম্বেরা বুঝল এ অদ্বৈতের কাণ্ড। তারই প্রভাবে ঘটেছে এ অঘটন। কিন্তু উপায় কী? উপায় নেই, নিয়ে এস গত কালের বাসি ভাত। তাই খাব। খিদের জ্বালা দুঃসহ হয়ে উঠেছে।

সবাইকে নিয়ে অদ্বৈত হরিদাসের গোফায় এসে উপস্থিত হল।

সকলে দেখল হরিদাসের গোফায় আগুন জ্বলছে মৃৎপাত্রে। গ্রামে সমস্ত আগুন নির্বাপিত কিন্তু হরিদাসের আগুন অনির্বাণ।

শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের জন্যে অদ্বৈত যখন গঙ্গাজল-তুলসীতে পূজা করছে তখন একই উদ্দেশে হরিদাস নামকীর্তন করছে তার গোফাতে। অদ্বৈতের হুঙ্কার হরিদাসের কাতরতা। 'দুই জনার ভক্ত্যে চৈতন্য কৈল অবতার।'

একদিন হরিদাস গোফায় বসে উচ্চকণ্ঠে সঙ্কীর্তন করছে, এক পীতজ্যোতি নারী তার অঙ্গনে এসে দাঁড়াল। অঙ্গ-গন্ধে আমোদ হয়ে উঠল দশদিক।

এ নারী আর কেউ নয়, স্বয়ং মায়াদেবী। বহিরঙ্গ মায়া। যার কাজই হচ্ছে জীবকে বিভ্রান্ত করে ক্ষণিক ইন্দ্রিয়সুখের দিকে টেনে নেওয়া।

আর, ভক্তিই কৃষ্ণ-উন্মুখিনী। ভক্তিই চিত্তবৃত্তিকে টেনে নেয় কৃষ্ণের দিকে। শাশ্বত আনন্দের আকরের দিকে।

এ নিয়ে তর্ক তুলতে চাও? এ তর্কাতীত, চিন্তারও অগোচর! হরিদাসের আচরণও অচিন্ত্য। যা অচিন্ত্য তার নির্ণয় হয় না তর্কে।

'তুমি বন্দনীয়, বরণীয়।' হরিদাসকে প্রণাম করে যুক্তকরে বললে মায়াদেবী, 'তোমার সঙ্গ করতে আমি এসেছি। রূপে-গুণে তোমার মত অগ্রগণ্য আর কে আছে? দীনে দয়া করাই যদি সাধুস্বভাব হয় তা হলে সদয় হয়ে আমাকে অঙ্গীকার করো। আমাকে অস্বীকার কোরো না।'

যে লাস্যে হাস্যে মুনির ধৈর্যনাশ হয় তাই দেখাতে লাগল মায়া। কিন্তু হরিদাস নির্বিকার। কামকটাক্ষ তাকে কী করবে? সে কৃষ্ণাবেশে ভরপুর।

সেই পুরোনো কথাই বললে ফের হরিদাস। বললে, 'প্রত্যহ আমি এক মহাযজ্ঞ করছি। তার নাম সংখ্যানাম-সঙ্কীর্তন। সে কীর্তন সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আমি অন্য কাজ করি না। সুতরাং তোমার অপেক্ষা করা ছাড়া পথ নেই। তুমি দ্বারে বসে শোনো আমার নামধ্বনি। নাম শেষ হলেই তোমার প্রীতিসাধন করব।'

প্রতীক্ষায় তীক্ষ্ণ হয়ে দ্বারদেশে বসল মায়া।

আগের মতই প্রভাত হয়ে গেল রাত্রি। রাত্রিই যদি চলে যায়, মায়া থাকে কী করে?

তিন-তিন দিন ঘুরে গেল মায়া। যে সব হাবভাবে ব্রহ্মারও মন টলে, তাই উদ্বারিত করল। কিন্তু এ সব অরণ্যে রোদন ছাড়া কিছু নয়। কৃষ্ণনামাবিষ্ট হরিদাসের মনে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য নেই।

'আর কতদিন আমাকে বঞ্চনা করবে?' মায়া আহতের মত বললে, 'রাত্রিদিনেও তোমার নাম সাঙ্গ হবে না?'

'কী করব, নিয়ম করেছি, তা ভাঙি কি করে?'

'আশ্চর্য, কতশত দেবতাকে মোহাচ্ছন্ন করলাম, আর তোমার কাছে হার মানতে হল?' মায়া বললে শ্রদ্ধাপ্লুত হয়ে, 'তুমি মহাভাগবত, তোমাকে দেখে আর তোমার নাম গান শুনে আমার চিত্তশুদ্ধি হয়েছে। মন এখন কেবল কৃষ্ণ নাম বলতে উৎসুক। আমাকে কৃষ্ণনাম উপদেশ করো। দীক্ষা দাও কৃষ্ণনামে।'

'এর আর দীক্ষা কী, উপদেশ কী!' হরিদাস বললে, 'শুধু কৃষ্ণ সঙ্কীর্তন করো।'

'কৃষ্ণ-কৃষ্ণ।' মায়াদেবী বললে, 'শিবের থেকে রাম নাম পেয়েছিলাম, এখন তোমার থেকে পেলাম কৃষ্ণনাম। রামনাম তারক, কৃষ্ণনাম পারক।'

'মুক্তিহেতুক 'তারক' হয় রামনাম।
কৃষ্ণনাম 'পারক' হয়ে করে প্রেমদান॥'

তারকাজ্জায়তে মুক্তিঃ প্রেমভক্তিশ্চ পারকাৎ। ভগবানের যত নাম আছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে রাম আর কৃষ্ণ। রামনাম তারক, কৃষ্ণনাম পারক। রামনাম ত্রাণ করে কৃষ্ণনাম পার করে, মানে, প্রেম দেয়। যে মুক্তি চাও সে রামনাম করো আর যে প্রেম চাও সে কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলো। রামনামে শুধু কাশীবাসের ফল আর কৃষ্ণনামে ঋদ্ধিবৃদ্ধির সমাগম। প্রেমের সমুচ্ছ্বাস, অখণ্ড পরমানন্দ। যে কৃষ্ণ নাম করে সে প্রেমবিহ্বল হয়ে কখনো কাঁদে, কখনো নাচে, কখনো গান গায় কখনো বা মূর্ছিত হয় ভূতলে। 'অশ্রুপাতঃ ক্বচিন্নৃত্যং ক্বচিৎ প্রেমার্তিবিহ্বলঃ। ক্বচিত্তস্থ মহামূর্ছা মদ্‌গুণো গীয়তে ক্বচিৎ।'

মায়া দেবী আবার বললে, 'আমাকে সেই কৃষ্ণনাম দাও, কৃষ্ণ-নামই সেবা করব আমি, আমাকে ভাসিয়ে দাও প্রেমবন্যায়।'

'কৃষ্ণনামে দেহ সেবোঁ, কর মোরে ধন্যা।
আমারে ভাসায় যৈছে এই প্রেমবন্যা॥'

মায়াদেবী হরিদাসকে প্রণাম করল। নামরসে যার চিত্ত নিমগ্ন, দেহভোগের প্রলোভন তাকে কী দেবে? ইন্দ্রিয়সুখের চেয়েও তীক্ষ্ণ-তর নামসুখ। যে নাম পেয়েছে, তাকে কাম আর টলাতে পারে না। নামের কাছে কাম হতমান, নতশির। ব্রহ্মা টলতে পারে, কিন্তু নামনিবিষ্ট নামনিষিক্ত ভক্ত নির্বিচল।

হরিদাস বললে, 'কৃষ্ণকীর্তন করো।'

কৃষ্ণনাম এমনিতেই মধুর, আর, আহা, প্রেমিক ভক্তের মুখে আরো মধুর।

মায়াদেবী নাম-প্রেম চাইবে, তাতে আর বিস্ময় কী। শ্রীকৃষ্ণ পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়েছেন এই নাম-প্রেমের আকর্ষণে।

কিন্তু প্রেমের জন্যে শুধু নাম নয়, সাধুকৃপারও প্রয়োজন।

'সাধুকৃপা' নাম বিনে প্রেম নাহি হয়।' সাধুকৃপা সম্বল করে নামাশ্রয়ী হলেই তবে প্রেম মেলে।

মায়া পরাভূত হল। দ্রবীভূত হল নাম-প্রেমে।

ক্ষণকালের জন্যেও গোবিন্দনামে বিরতি-বিরক্তি নেই, হরিদাস কখনো নাচে, কখনো হাসে, কখনো মত্ত সিংহের মত ডাক ছাড়ে, কখনো উচ্চস্বরে কাঁদে, কখনো বা পড়ে থাকে মূর্ছিত হয়ে। এ সব দেখে কাজীর সহ্য হল না, মুলুকপতির কাছে গিয়ে নালিশ করল। বিহিত করুন।

'যবন হয়ে হিন্দুর আচার করছে?' মুলুকপতি খেপে উঠল: 'নিয়ে এস হরিদাসকে।'

হরিদাসকে ধরে নিয়ে গেল।

হরিদাসের মুখে আর কথা নেই—শুধু কৃষ্ণ-কৃষ্ণ।

'কেন, তোমার এই দুর্মতি কেন?' না চটে মোলায়েম সুরেই বললে মুলুকপতি, 'কত ভাগ্যে তুমি যবন হয়েছ, কেন তুমি হিন্দুর আচার পালন করবে? যা বলছি, শোনো, কৃষ্ণ নাম ছেড়ে দাও।'

'ঈশ্বর তো একজনই। যে নামেই ডাকুন, তিনি সাড়া দেন।' হরিদাস বললে মধুরস্বরে, 'কোরাণে-পুরাণে কোনো ভেদ নেই।'

'তবে কৃষ্ণ নাম ছেড়ে আল্লার নাম ধরো।'

'প্রভু যাকে যে ভাব দেবেন, সে সেই ভাবে থাকবে, সেই ভাবে চলবে। আমার কাছ থেকে যদি তিনি কৃষ্ণনাম, হরিনাম শুনতে চান, তবে অন্য নাম বলি কি করে? অন্য নামের আর প্রয়োজন কী?'

মুলুকপতি ঠাণ্ডা হল। সত্যিই তো, যার যেমন খুশি, যার.যেমন রুচি, সে তেমনি ডাকবে ঈশ্বরকে। তিনি যেমন প্রেরণা দেবেন, তেমনিই তুলতে হবে প্রতিধ্বনি।

কিন্তু কাজী রাজি হল না। বললে, 'অসহ্য। হরিদাসকে যদি শাস্তি না দেন, তাহলে মুসলমান-সমাজের অপমান হবে। আপনি

থাকতে কেউ সইবে না ও-অপমান। মুসলমানের মুখে কিসের কৃষ্ণনাম, কিসের হরিনাম ?'

'শুনছ ?' হরিদাসকে লক্ষ্য করল মুলুকপতি : 'ঐ পাপ নাম ছেড়ে দাও। নিজেদের নাম বলো। আল্লা-আল্লা বলো।'

'যা আল্লা, তাই হরি। তিনি যাকে দিয়ে যা বলাবেন, সে তাই বলবে।' বললে হরিদাস।

'যদি হরিনাম না ছাড়ো, তাহলে শাস্তি হবে প্রচণ্ড।' দলের প্ররোচনায় ক্ষিপ্ত হল মুলুকপতি।

'তা হোক।' দৃঢ় অথচ আর্দ্রস্বরে হরিদাস বললে, 'যেমন অপরাধ, তেমনি শাস্তি দেবেন ঈশ্বর।'

'শাস্তি হবে না, যদি হরিনাম ছাড়ো।'

'দেহ টুকরো টুকরো করে কেটে ফেললেও ছাড়ব না হরিনাম।' নির্বিচল দাঁড়িয়ে রইল হরিদাস।

'খণ্ড খণ্ড হই দেহ যদি যায় প্রাণ।
তভো আমি বদনে না ছাড়িব হরিনাম ॥'

হরিদাস চোখ বুজল। দেখতে লাগল সেই লোচনরসায়ন লীলাকিশোরকে।

'একে বাইশ বাজারে নিয়ে যাও।' হুকুম দিল মুলুকপতি : 'প্রত্যেক বাজারে নিয়ে গিয়ে বেত মারো। বেত মেরে মেরে একে শেষ করে দাও।'

'বাইশ বাজার লাগবে না।' কাজী বললে, 'দু তিন বাজার ঘুরলেই বাছাধন অক্কা পাবেন।'

একেক বাজারে নিয়ে যাচ্ছে হরিদাসকে, আর রাজার পাইক বেত মারছে সর্বাঙ্গে। যত মারছে, তত কৃষ্ণ-কৃষ্ণ হরি-হরি বলছে হরিদাস। আর হরিনামের গুণে এতটুকুও ব্যথা পাচ্ছে না। 'নামানন্দে দেহদুঃখ না হয় প্রকাশ।' নামানন্দে নেই কোনো দেহানুভূতি।

'আহা, আস্তে মারো, অল্প করে মারো।' বাজারের লোকেরা

পাইকদের পা ধরে অনুনয় করে : 'বলো, কিছু না হয় টাকাকড়ি দিচ্ছি তোমাদের, হরিদাস ঠাকুরকে ছেড়ে দাও।'

পাইক-পেয়াদারা ছাড়ে না, ব্যায়ামের আরামে মেরে চলে অবিশ্রান্ত।

'তোমরা কেন কাঁদছ, কেন দুঃখ করছ!' শোকার্ত জনতাকে উদ্দেশ করে সান্ত্বনা দেয় হরিদাস : 'যেকালে আমার শরীরে কষ্ট নেই, কেন তোমাদের মনোদুঃখ? সকলে কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলো। নামই সমস্ত ব্যাধির আরাম, সমস্ত ব্যথার উপশম। নামই নিত্য আনন্দের খনি। নামেই সর্ব-অনর্থের নাশ, নামেই সর্বশুভোদয়।'

'কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব জগত-নিস্তার ॥'

নম্ ধাতু থেকে নাম হয়েছে। নম্ ধাতুর অর্থ নামানো। তাই যা নামায়, নামিয়ে আনে, তাই নাম। কাকে নামায়? ভগবানকে নামায়। শুধু তাই নয়, যে নাম করে তাকেও নামায়। ভগবানকে নামায় তাঁর ধাম থেকে মর্তের ধূলিতে আর ভক্তকে নামায় তার অভিমান থেকে দীনতায়।

নামেই কৃষ্ণবশীকরণী শক্তি, নামের মুখ্য ফলই হচ্ছে কৃষ্ণপ্রেম। নাম জড়বস্তু নয়, চিদ্‌বস্তু। আগুনের শক্তি না জেনেও আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে। তেমনি নামের শক্তি না জেনেও অক্ষর উচ্চারণ করলেই ভক্তি জন্মায়। নাম থেকেই সে ভগবদ্‌বিষয়িনী বিদ্যা, সর্বপুরুষার্থপ্রদ সাধন।

কলির সাধন একমাত্র হরিনাম। যে একথা মানে না তার উদ্ধার নেই সংসার থেকে। কর্ম, যোগ বা জ্ঞান—এ তিনের প্রয়োজন নেই কলিকালে, একমাত্র হরিনামই উপায়, হরিনামই গতি। যারা কর্মী তারা ফল চায়, যারা জ্ঞানী তারা মুক্তি চায়, যারা যোগী তারা চায় সাজুয্য আর তুমি যদি প্রেম চাও, তুমি শুধু নামকীর্তন করো। গোবিন্দ-গোবিন্দ বলে ডাকো। দূর থেকে দ্রৌপদী গোবিন্দ-গোবিন্দ

বলে ডেকেছিল, সেই ডাক কৃষ্ণের কাছে চিরপ্রবৃদ্ধ ঋণরূপে রয়ে গেছে। সে ডাকের স্মৃতি মুছে যায় না কৃষ্ণের হৃদয় থেকে, সে ঋণের কখনো পরিশোধ হয় না।

এত প্রহার তবু প্রাণ যায় না হরিদাসের। যেমন প্রহ্লাদের যায়নি, সমস্ত অসুর-আঘাত ব্যর্থ হয়েছে। হরিদাস বরং কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করছে, 'প্রভু, এরা নির্বোধ, এদেরকে দয়া করো, দুর্গতি থেকে ত্রাণ করো এদের। আমার জন্যেই তো এদের দুর্গতি। তোমাকে ভজনা করে কি আমি অন্যের দুর্গতির কারণ হব ?'

বাইশ বাজারে ঘোরাচ্ছে হরিদাসকে, বাইশ বাজারে মারছে, তবু হরিদাস জ্ঞান পর্যন্ত হারাচ্ছে না। বরং হাসছে মৃদু-মৃদু।

'ও কী, তোমার যে কিছু হচ্ছে না!' পাইক-পেয়াদারা অস্থির হয়ে উঠল : 'তাহলে আমাদের কী হবে ?'

'তোমাদের কী হবে মানে ?' বিস্মিত হল হরিদাস।

'এত প্রহারেও তোমার প্রাণ গেল না। উলটে কাজীর হাতে আমাদেরই প্রাণ যাবে।' পাইক পেয়াদারা হাহাকার করে উঠল।

'আমি বাঁচলেই তোমাদের অমঙ্গল!' হরিদাস বললে, 'তা হলে, দেখ, এই দণ্ডে আমি দেহ ছাড়ছি।'

এই বলে হরিদাস ধ্যানসমাহিত হল, আবিষ্ট-অচেষ্ট দেহে শ্বাস-টুকুও রইল না। পাইক-পেয়াদারা ভাবল প্রাণ নেই হরিদাসে।

ধরাধরি করে হরিদাসের দেহ মুলুকপতির কাছে নিয়ে গিয়ে ফেলল মাটিতে।

শাস্তির চরম হয়ে গিয়েছে। মুলুকপতি বললে, 'একে এখন তবে কবর দাও।'

'তাহলে তো ওর সদ্গতি হবে।' কাজী আপত্তি করল : 'কবর না দিয়ে ওকে ভাসিয়ে দাও নদীতে। নদীতে ফেললেই ওর দুঃখ অটুট হয়ে থাকবে।

সবাই ধরাধরি করে হরিদাসকে ফেলতে গেল নদীতে। যেই

ফেলবে, অমনি হঠাৎ হরিদাস ধ্যানানন্দে নিশ্চল হয়ে বসল জলের মধ্যে। তার দেহে বিশ্বম্ভর প্রবেশ করল। কার শক্তি আছে হরিদাসকে আর নড়ায়। বলবন্ত স্তম্ভের মত বসে আছে বিনিশ্চল।

চক্ষের পলকে পাইক-পেয়াদার দল পালিয়ে গেল।

কৃষ্ণানন্দসুধাসিন্ধুর মধ্যে বসে রইল হরিদাস।

সমাধি-অন্তে হরিদাস তীরে এসে উঠল। কৃষ্ণনাম বলতে বলতে চলে এল ফুলিয়ায়। মুসলমানদের কানে খবর গেল। দল বেঁধে সবাই দেখতে এল হরিদাসকে। মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতে লাগল সকলে।

স্বয়ং মুলুকপতি এসে হাজির। যুক্তকরে সসম্ভ্রমে বললে, 'তুমি পীর, তুমি সিদ্ধ, তোমাকে আমি চিনতে পারিনি। আমার সমস্ত দোষ ক্ষমা করো।'

হরিদাস মিলল এসে অদ্বৈতের সঙ্গে।

গোফায় বসে তিন লক্ষ নাম নেয় হরিদাস। 'ক্ষণেকো গোবিন্দ নামে নাহিক বিরতি।' নামই সর্বভক্তিসার। নামই হরিলীলা-শিখরিণী সুধা। নামই মধুরাদ্ভুতগাঢ়দুগ্ধ। জ্ঞান আর সিদ্ধি তুলাতে তুলিত হয়, কিন্তু প্রেমের তুলনা নেই, কৃষ্ণপ্রেমের তুলনা নেই। নৈব তুলিতং তু তুলায়াং। কৃষ্ণনাম তুলিতং ন তুলায়াং।

'মুখে লইতে কৃষ্ণ নাম নাচে তুণ্ড অবিরাম
আরতি বাঢ়য়ে অতিশয়।
নাম-সুমাধুরী পাঞা ধরিবারে নারে হিয়া
অনেক তুণ্ডের বাঞ্ছা হয়॥
কি কহিব নামের মাধুরী!
কেমন অমিয়া দিয়া কে জানে গড়িল ইহা
কৃষ্ণ এই দু আখর করি॥
আপন মাধুরীগুণে আনন্দ বাড়ায় কানে
তাতে কালে অঙ্কুর জনমে।

বাঞ্ছা হয় লক্ষ কান যবে হয় তব নাম
মাধুরী করিয়ে আস্বাদনে ॥
কৃষ্ণ তু আখর দেখি জুড়ায় তপত আঁখি
অঙ্গ দেখিবারে আঁখি যায়।
যদি হয় কোটি আঁখি তবে কৃষ্ণরূপ দেখি
নাম আর তনু ভিন্ন নয় ॥
চিত্তে কৃষ্ণনাম যবে প্রবেশ করয়ে তবে
বিস্তারিত হৈতে হয় সাধ।
সকল ইন্দ্রিয়গণ করে অতি আহ্লাদন
নামে করে প্রেম-উন্মাদ ॥
যে কানে পরশে নাম সে তেজয়ে আন কাম
সব ভাব করয়ে উদয়।
সকল মাধুর্যস্থান সব রস কৃষ্ণনাম
এ যতুনন্দন দাস কয় ॥'

বহু লোক এসে সমবেত হয় গোফাতে, কিন্তু কেউ তু দণ্ড ঠাণ্ডা হয়ে বসতে পারে না। সর্বাঙ্গে জ্বলতে থাকে সকলে। ব্যাপার কী? কিছু নির্ণয় করতে পারে না হরিদাস। কই, তার তো কিছু জ্বালা-যন্ত্রণা নেই।

বৈদ্য এসে বললে, 'গোফার নিচে এক মহানাগের বাসা। তারই বিষের জ্বালায় কেউ তিষ্ঠোতে পাচ্ছে না। সাপ নিয়ে বাস করা নিরাপদ নয়।' হরিদাসকে লক্ষ্য করে বললে, 'আপনি এস্থান ত্যাগ করুন।'

'হ্যাঁ, তাই চলুন। অন্যত্র গোফা তৈরি করে দেব আমরা।' ভক্ত-দল বললে, 'আমরা এখানে কেউ বসতে পাচ্ছি না জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছি।'

'কী না কী বলছ, বুঝতে পাচ্ছি না কিছু।' বললে হরিদাস, 'তবে তোমাদের যখন অসুবিধে হচ্ছে, তোমরা যখন অসুস্থ বোধ করছ, তখন ছেড়ে যাব এ জায়গা।'

হরিদাস এ জায়গা ছেড়ে চলে যাবে ! তবে আমি আর কিসের লোভে থাকি ! গভীর গর্ত থেকে উঠে মহানাগ ধীরে-ধীরে চলে গেল দেশান্তরে।

আর কারু জ্বালা নেই। নামাস্বাদনে নেই আর চঞ্চলতা।

এক ব্রাহ্মণ তেড়ে এল। 'নাম করছ তো করো কিন্তু চেঁচাও কেন ? মনে-মনে জপ করতে পারো না ? হরিনাম চেঁচিয়ে বলতে হবে, এ কার শিক্ষা ?'

'শাস্ত্রের।' সবিনয়ে বললে হরিদাস, 'উচ্চৈঃ শতগুণস্তবেৎ। উচ্চস্বরে নাম করলে শতগুণ ফল হয়। যে বলে, সে তো তরেই, যে শোনে, সেও তরে। এমন কি, পশু-পাখি কীট-পতঙ্গও ত্রাণ পায়।'

হরিনামই নিরপেক্ষ সাধন। উচ্ছিষ্টমুখেও নামগ্রহণের নিষেধ নেই। নাম অমূকলোকসুলভ। যে কথা কইতে পারে সেই নাম করতে অধিকারী। নামই সকল ন্যূনতা নিশ্ছিদ্র করে। নাম শুধু ভক্তির জীবন নয়, ভক্তিরাজ্যের মহারাজচক্রবর্তী।

অদ্বৈত হরিদাসকে বললে নিমাইয়ের কথা। নিমাইদর্শনে হরিদাস নবদ্বীপ চলল।

৩১

নিত্যানন্দ আছে শ্রীবাসের বাড়িতে। তার অহর্নিশ বাল্য ভাব। শ্রীবাসকে বাবা ডাকে, মালিনীকে মা। মালিনীর কোলে মাথা রেখে ঘুমোয়। মালিনীর শুষ্ক স্তনে মুখ দিয়ে দুধ আনে। মালিনী বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে থাকে। দেখে শিশুরূপ, শিশুশক্তি !

নিমাই কত বলে দিয়েছে শ্রীবাসের ঘরে চঞ্চলতা কোরো না, শান্ত হয়ে থেকো। কে কাকে বলছে ! তখুনি দিগম্বর হয়ে বস্ত্রখণ্ড

মাথায় বাঁধল নিতাই। লাফিয়ে লাফিয়ে ঘুরতে লাগল আঙিনায়। বাহ্যজ্ঞানের তন্তুমাত্র নেই। একেবারে এক শিশু আত্মভোলা।

নিজের হাতে ভাত মেখে পর্যন্ত খেতে পারে না। তা ছাড়া আহারের বিচার নেই, সময় নেই, স্বাদবিস্বাদ নেই। মা গো, খেতে দে—বললেই হল, আর যা মা দেবে তাতেই নিতাই পরিতৃপ্ত। কিন্তু স্নান করতে একবার গঙ্গায় নামলে উঠে আসেনা সহজে। আর কতক্ষণ জলে থাকবে, ওঠো, বেলা হল। কে কার কথা শোনে!

তখন নিমাই এসে ডাকে। আর অগ্রাহ্য করতে পারে না। নিমাই এসে কাপড় পরিয়ে দেয়।

শ্রীকৃষ্ণের ঘৃতপাত্র কাকে নিয়ে গেছে। মালিনী কাঁদতে বসল।

নিতাই বললে, 'কী হয়েছে?'

'ঘৃতপাত্র চুরি করেছে কাক।'

'দাঁড়াও, আমি বলছি কাককে—' শিশুর সারল্যে আকাশের দিকে তাকাল নিতাই।

'কত কাক উড়ছে, যেটা বাটি নিয়েছে তাকে তুমি চিনবে কী করে?'

'ঠিক চিনব।' শিশুর মতই বিশ্বাস নিতাইয়ের: 'তুমি ভেবো না, তোমার বাটি তুমি ফিরে পাবে।'

উঠোনে কতগুলি কাক বসেছে, তাদেরই একটাকে উদ্দেশ করে নিতাই বললে, 'যা, উড়ে যা, শিগগির আমার বাটি এনে দে।'

কাক তখনই উড়ে গেল আকাশে। অদৃশ্য হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরেই ঠোঁটে করে বাটি এনে হাজির। যেখান থেকে নিয়েছিল, ঠিক সেখানেই রেখে দিল কাক।

মালিনী বিস্ময়ে বাক্যহারা। এও সম্ভব নাকি?

আরো কত কী সম্ভব।

মালিনী যুক্ত করে স্তব করতে লাগল: 'তুমিই সেই লক্ষ্মণ, তুমিই সেই বলরাম—'

'মা গো, খেতে দে। খিদে পেয়েছে।' নিতাইয়ের শুধু বাল্যভাব।

বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে ঘরে বসে আছে নিমাই। বসে আছে যাতে মা দেখে খুশি হন। মার মন ভরে থাকে।

'যখন থাকয়ে লক্ষ্মী সঙ্গে বিশ্বম্ভর।
শচীর চিত্তেতে হয় আনন্দ বিস্তর॥
মায়ের চিত্তের সুখ ঠাকুর জানিয়া।
লক্ষ্মীর সঙ্গেতে প্রভু থাকেন বসিয়া॥'

কিন্তু ও কী উৎপাত! হঠাৎ সামনে আঙিনায় নিতাই এসে দাঁড়াল। আর বলা নেই কওয়া নেই দিগম্বর হয়ে গেল মুহূর্তে। ধরল বাল্যভাব।

বিষ্ণুপ্রিয়া পালিয়ে গেল।

নিমাই বললে, 'এ কী, এ রূপ কেন?'

কী উত্তর দেবে জানেনা নিতাই। বাহ্যজ্ঞান নেই, শুধু বিহ্বল আনন্দে চেয়ে থাকে অনিমেষে।

'কাপড় পরো।' নিমাই আদেশের সুরে বললে।

অসহায়ের মত তাকাল নিতাই। কী করে কাপড় পরতে হয় তা যেন তার জানা নেই।

নিমাই তখন নিজের হাতে নিতাইকে কাপড় পরিয়ে দিল।

থালায় করে সন্দেশ নিয়ে এল শচী। পাঁচ-পাঁচটা সন্দেশ। শিশুর মত লোভোজ্জ্বল চোখে তাকাল নিতাই। একটা সন্দেশ খেয়ে আর বাকি চারটা ছুঁড়ে ফেলে দিল মাটিতে।

'এ কী, ফেলে দিলে কেন?' শচী বললে সকাতরে।

'সবগুলোকে এক থালায় করে একত্র নিয়ে এসেছ কেন?' বললে নিতাই, 'প্রত্যেককে আলাদা থালায় করে নিয়ে এস।'

'ঘরে আর সন্দেশ নেই।' বললে শচী।

'না, আছে।'

'এই পাঁচটিই ছিল। যে কটি ছিল, তুমি আমার বিশ্বরূপ, তোমাকেই এনে দিয়েছি। আর পাব কোথায়?'

'আমি বলছি আছে, পাবে।' হুঙ্কার করল নিতাই : 'ঘরে গিয়ে দেখ।'

ব্যস্ত পায়ে ঘরে গেল শচী। দেখল থালার উপরে ধুলোমাখা চারটি সন্দেশ।

'ধুলো মুছে নিয়ে এস।' বাইরে থেকে নিতাই আবার ডাক ছাড়ল : 'একটি একটি করে আমাকে খাইয়ে দাও।'

শচী হতবুদ্ধি। কোন পথ দিয়ে ঘরে এল সন্দেশ ?

'নিত্যানন্দ, বাপ, এ কী অঘটন !'

'কিছুই অঘটন নয়', সন্দেশ খেতে-খেতে নিতাই বললে, 'যা ফেলে দিয়েছিলাম, তাই আবার চেয়ে নিলাম।'

আরেকদিন ভক্তদের নিয়ে বসে আছে নিমাই, নিতাই কাছে এসে দাঁড়াল। সহাস্য মুখ, নয়নে আনন্দাশ্রু, বাল্যভাবে জ্যোতির্ময়। 'নদীয়ার নিমাই-পণ্ডিতই আমার প্রভু।' গর্জন করে উঠল।

নিজহাতে নিমাই নিতাইকে সাজিয়ে দিল বসনে, অঙ্গে মেখে দিল দিব্য গন্ধ, গলায় ঝুলিয়ে দিল ফুলমালা। তারপর সামনে আসন করে দিল। নিতাই বসলে নিমাই তার স্তব করতে লাগল।

'নামে নিত্যানন্দ তুমি রূপে নিত্যানন্দ।
এই তুমি নিত্যানন্দ রস-মূর্তিমন্ত ॥
নিত্যানন্দ পর্যটন ভোজন ব্যবহার।
নিত্যানন্দ বিনে কিছু নাহিক তোমার ॥
তোমারে বুঝিতে শক্তি মনুষ্যের কোথা ?
পরম সুসত্য তুমি যথা কৃষ্ণ তথা ॥'

বললে, 'নিতাই, প্রাণে বড় সাধ তোমার একখানা কৌপীন পাই।' বলে নিজেই উদ্যোগ করে আনাল কৌপীন। সরু ফালি করে চিরল অনেকগুলি। যত বৈষ্ণব উপস্থিত ছিল, তাদের একখানা করে বিতরণ করল। বললে, 'এ ফালি মাথায় বাঁধো। তা হলেই কৃষ্ণভক্তি নিটুট হয়ে থাকবে।'

'প্রভু বোলে এ বস্ত্র বান্ধহ সভে শিরে।
অন্যের কি দায়, ইহা বাঞ্ছে যোগেশ্বরে॥
নিত্যানন্দ প্রসাদে সে হয় বিষ্ণুভক্তি।
জানিহ কৃষ্ণের নিত্যানন্দ পূর্ণশক্তি॥
কৃষ্ণের দ্বিতীয় নিত্যানন্দ বই নাই।
সখী, সখা, শয়ন, ভূষণ, বন্ধু, ভাই॥
বেদের অগম্য নিত্যানন্দের চরিত্র।
সর্ব-জীব-জনক-রক্ষক সর্ব-মিত্র॥
ইহান ব্যভার সর্বকৃষ্ণরসময়।
ইহানে সেবিলে কৃষ্ণে প্রেমভক্তি হয়॥
ভক্তি করি ইহান কৌপীন বান্ধ শিরে।
মহাযত্নে ইহা পূজা কর গিয়া ঘরে॥'

নিজ হাতে নিতাইয়ের পা ধোয়াল নিমাই। ভক্তদের সে পাদোদক পান করতে দিল। যে পান করে সেই হরিনামরসে মত্ত হয়। নাচে গায়, ধুলোয় গড়াগড়ি দেয়। হুঙ্কার করে ওঠে।

গৌরহরিও হুঙ্কার দিয়ে উঠল। এতক্ষণ বাহ্যজ্ঞান ছিল না নিতাইয়ের, সেও প্রতিধ্বনি করল। তারপরে দুজনে কৃষ্ণকীর্ত্তনে নৃত্য করতে লাগল। ভক্তরাও যোগ দিল নির্বিচারে। লক্ষ্যও করল না কে কার গায়ে ঢলে পড়ছে, পায়ের ধুলো নিচ্ছে, গলা ধরে কাঁদছে অঝোরে। লক্ষ্য নেই কে প্রভু কে অনুচর, কে বৈকুণ্ঠের রাজা, কে বা মর্তের পূজারী। নিমাই-নিতাই কোলাকুলি করে নাচছে। পদ-তালে কাঁপছে পৃথিবী। চতুর্দিকে উঠছে সিংহনাদ। হরিধ্বনিই সিংহনাদ।

'এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' মাত্র কহে বেদ॥'

নৃত্যশেষে ভক্তপরিবৃত হয়ে বসল নিমাই। বললে, 'যে নিত্যা-নন্দকে ভক্তি করবে, জানবে সেই আমার ভক্ত। সকলে তাই নিত্যা-

নন্দের প্রতি অনুরাগী হও। 'ইহান বাতাস লাগিবেক যার গায়। তাহারেও কৃষ্ণ না ছাড়িব সর্বথায়।' তাই নিত্যানন্দের সঙ্গ করো।'

সকলে নিত্যানন্দের জয় দিয়ে উঠল।

নিতাই আর হরিদাসকে ডাকল নিমাই। বললে, আমার এক আদেশ তোমরা পালন করো।'

'করব।'

'নবদ্বীপে প্রতি ঘরে গিয়ে ভিক্ষে করো।'

'ভিক্ষে করব?'

'হ্যাঁ, নামভিক্ষা।'

'শুন শুন নিত্যানন্দ! শুন হরিদাস!
সর্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণ বোল, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা॥
ইহা বই আর না বলিবা বোলাইবা।
দিন অবসানে আসি আমারে কহিবা॥
তোমরা করিলে ভিক্ষা, যেই না বলিব।
তবে আমি চক্র-হস্তে সভারে কাটিব॥'

আর কথা নেই, প্রভুর আদেশ হয়েছে, চলো যাই, ঘরে-ঘরে দ্বারে-দ্বারে গিয়ে নাম বিতরণ করি।

নামই পাপহারক, পবিত্রকারী। সর্বব্যাধির বিনাশক, সর্বদুঃখের প্রশমক। সর্ব নারকীর উদ্ধারকর্তা। প্রারব্ধ-সংহারক অপরাধভঞ্জক। সর্বকর্মপূর্ণকারক। সর্ব বেদাধিক। সর্ব তীর্থাধিক। সর্ব সৎকর্মাধিক। নামই সর্বার্থপ্রদ, সর্বশক্তিমান। জগদানন্দ-জনক। সর্বসেব্য, স্বভাবতই পরম পুরুষার্থ।

আর গৌরাবতারের হেতুই নামপ্রচার। 'সংকীর্তন আরম্ভে মোহার অবতার। করাইমু সর্বদেশে কীর্তন প্রচার।'

'ধাতূনাম্ ইব পাবকঃ।' উদ্বর্তনে প্রক্ষালনে সোনার বাইরের

মলই নষ্ট হয়, অন্তরমল নষ্ট হয় না। আগুনে বাহ্য ও আন্তর দুই মলেরই নিরসন ঘটে। প্রায়শ্চিত্তে বাইরের পাপ যেতে পারে, কিন্তু পাপবীজ বা পাপবাসনার উচ্ছেদ হয় না। সে উচ্ছেদ একমাত্র নাম-কীর্ত্তনে। হরিনামে জননীজঠরপথ লুপ্ত হয়ে যায়, মানুষ আর জন্ম-পটলিপিতে প্রবেশ করে না। নামোচ্চারিকা রসনা শুধু বক্তাকেই রক্ষা করে না, ভগবৎখ্যাতি শুনিয়ে সমস্ত জগৎকেই পবিত্র করে। হরিনামেই অরিষ্টের শান্তি, সমস্ত উপদ্রবের নিস্তার, সমস্ত অনর্থের অপগম।

এক কথায়, হরিনামে সর্বসিদ্ধি।

তুমি ঐহিক ধনজন আরোগ্য-সৌভাগ্য চাও, নামাশ্রয় করো। পারত্রিক স্বর্গ-সাফল্য চাও, নামাশ্রয় করো। ত্রিতাপজ্বালার প্রশমন চাও, নামাশ্রয় করো, চিত্তশুদ্ধি বা পাপের উন্মূলন চাও, করো নামাশ্রয়। মোক্ষ চাও, নামাভাসেই মোক্ষ মিলবে। প্রেম চাও, নিরপরাধে নাম নাও। আর যদি বলো, ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ, কাময়ে। মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি—হে ঈশ্বর, ধনজন চাই না, কবিতা সুন্দরী চাইনা, জন্মে জন্মে আমাকে শ্রদ্ধাভক্তি দাও—তাহলেও নামাচ্ছন্ন হও। নামই বাঞ্ছাকল্পতরু।

'সকীর্তন হৈতে পাপ-সংসারনাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্বভক্তি সাধন-উদ্গম॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম প্রেমামৃত-আস্বাদন।
কৃষ্ণ প্রাপ্তি সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন॥'

নিতাই আর হরিদাসের দুজনেরই সন্ন্যাসীবেশ। দ্বারে এসে দাঁড়ালেই গৃহস্থেরা ভিক্ষে নিয়ে আসে। তখন তারা বলে, 'তোমরা কৃষ্ণ বলো—তোমাদের এই নামধ্বনিটুকুই আমাদের ভিক্ষে।'

কেউ ভিক্ষে দেয়, কেউ দেয় না। নানাজনে নানারকম বলে। বলে, 'তোমরা পাগল হয়েছ বলে কি আমরাও পাগল হব? আচ্ছা, আজ যাও, দেখি ভিক্ষের ধন আসে কিনা ভাঁড়ারে।'

কেউ কেউ বা চোর বলে, চর বলে, তেড়ে আসে, কাজীর কাছে ধরে নিয়ে যাবে বলে ভয় দেখায়। আমাদের ভয় কী! আমরা প্রভুর আজ্ঞা পালন করছি। যদি কিছু বলবার থাকে, তাঁকে গিয়ে বলো।

একদিন দুজনে যাচ্ছে পথ দিয়ে, দেখল দুটো প্রকাণ্ড লোক মাতাল হয়ে মারামারি করছে। আর পরস্পরের উদ্দেশে কদর্যকটু গালাগাল ছুঁড়ছে। পথের দুপাশে দাঁড়িয়ে গেছে কৌতূহলী জনতা।

'কিলাকিলি গালাগালি করছে—লোক দুটো কে?' দর্শকদের একজনকে জিগগেস করল নিত্যানন্দ।

'কে আবার! মায়ের পেটের ভাই।'

'জাত কী?'

'কী আবার! ব্রাহ্মণ।'

'করে কী!'

'কোটালি করত। ইদানি কাজীকে টাকা দিয়ে বশ করে নদীয়ায় যথেচ্ছাচার করে বেড়াচ্ছে।'

'কী করছে?'

'কী না করছে? হেন দুষ্কর্ম নেই যাতে ওদের অরুচি হবে। চুরি ডাকাতি তো করছেই, গৃহস্থের ঘরে আগুন দিচ্ছে। নরহত্যা করতেও পেছপা হচ্ছে না। নির্বিচারে মাংস খাচ্ছে, মদ খাচ্ছে, যা নয় তাই দিচ্ছে গালাগাল। সমস্ত দেশবাসীর ত্রাসস্বরূপ হয়ে উঠেছে।'

'চলো যাই ওদের কাছে বলি গে প্রভুর কথা।' নিতাই বললে হরিদাসকে।

'বলবে?' উৎসাহিত হল হরিদাস।

'ওরা ছাড়া কে আছে এমন সুপাত্র? যদি পাপী উদ্ধার করতেই প্রভুর অবতরণ, তবে এদের মত পাতকী আর আছে কোথায়?' নিতাই বললে উদ্বেলকণ্ঠে, 'পাতকী তারিতে প্রভু কৈলা অবতার। এমত পাতকী কোথা পাইবেন আর॥' প্রভু তো গোপনে নিজেকে

প্রকাশ করেছেন, তাঁর প্রভাব আজও লোক বুঝতে পাচ্ছে না বলে উপহাস করছে। প্রভু যদি এখন এই দুই দুরাত্মাকে অনুগ্রহ করেন তবেই তো সমস্ত সংসার তাঁর পরিচয় পায়।'

'চলো, এগোই।'

'এখন যেমন ওরা মদের নেশায় মত্ত আছে, তেমনি যদি নামের নেশায় মত্ত হয়!' নিতায়ের চোখ ছলছল করে উঠল: 'যদি এদের চোখে জল আসে! যদি কাঁদে একবার গৌর বলে। হরিদাস, যারা আজ ওদের ছায়া স্পর্শ করছে, তারা শুচি হবার জন্যে তখুনি গঙ্গাস্নান করতে ছুটছে। যদি এমন দিন আসে যখন ওদের দর্শনমাত্রই লোকে গঙ্গাস্নানের ফল পেয়েছে বলে অনুভব করবে। যদি এদের মধ্যে চৈতন্য প্রকাশ হয় তবেই তো আমি চৈতন্যকিঙ্কর নিত্যানন্দ। 'তবে হও নিত্যানন্দ চৈতন্যের দাস। এ দুইয়েরে করো যদি চৈতন্যপ্রকাশ॥'

হরিদাস তৃপ্ত চোখে তাকাল নিতাইয়ের দিকে।

'হরিদাস, তুমি এদের শুভাভিলাষ করো। যখন যবনেরা তোমাকে মারছিল তখনও তুমি তাদের মঙ্গলকামনা করেছিলে। যদি সত্যি এদেরও তুমি মঙ্গলকামনা করো তবে এরাও নিশ্চয়ই উদ্ধার পাবে।'

'তোমার যখন তাই ইচ্ছে,' বললে হরিদাস, 'বুঝতে হবে তাই প্রভুরও ইচ্ছে। আমাকে কেন মিছে ছলনা করছ? তোমার যখন একবার সঙ্কল্প হয়েছে, প্রভু তা নিশ্চয়ই পূর্ণ করবেন।'

হরিদাসকে আলিঙ্গন করল নিতাই।

এগোলো দুজনে। পথচারীরা নিষেধ করল। 'ওদের কাছে যেওনা। ওদের সন্ন্যাসী-জ্ঞান নেই, গোবধে ব্রহ্মবধে ওদের সহজ স্ফূর্তি। যদি কিছু বলতে চাও, দূর থেকে বলো, ওদের নাগালের মধ্যে গিয়ে পোড়ো না।'

গ্রাহ্য করল না, আরো এগোলো দুজনে।

সন্নিহিত হয়ে বললে, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলো।'

'বোল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন-প্রাণ॥
তোমা সভা লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
হেন কৃষ্ণ ভজ, সব ছাড় অনাচার॥'

ক্রুদ্ধ চোখে তাকাল দু ভাই। আমাদের সামনে এত বড় স্পর্ধা! আমাদেরকে উপদেশ! ধর্ তো ব্যাটাদের।

নিতাই আর হরিদাসের পিছু নিল ডাকাতেরা। নিতাই আর হরিদাস ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল প্রাণ ভয়ে। 'আথেব্যথে নিত্যানন্দ হরিদাস ধায়। রহ-রহ বলি দুই দস্যু পাছে যায়॥'

'তখনই বারণ করেছিলুম।' পথচারীরা উদ্বিগ্ন মুখে বললে, 'এখন সন্নেসীরা কী বিপদে পড়ল বলো তো।'

'সন্নেসী না আর কিছু! ভণ্ড, ভণ্ডের শিরোমণি।' নামবিমুখ পাষণ্ডের দল বলতে লাগল, 'ঠিক হয়েছে, ভগবান ভণ্ডদের উচিত শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন।'

কিন্তু যারা সদাশয়, এ দৃশ্য দেখে তারা মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগল, 'হে কৃষ্ণ, রক্ষা করো, হে কৃষ্ণ, রক্ষা করো।'

'এ যাত্রা প্রাণ বুঝি আর বাঁচে না।' ছুটতে-ছুটতে বললে নিতাই।

'তোমার জন্যেই আজ নিশ্চিত অপমৃত্যু।' বললে হরিদাস।

'আমার জন্যে?'

'তাছাড়া আর কী! নইলে মাতালকে কেউ কৃষ্ণ-উপদেশ করতে চায়?' হরিদাস হাসতে-হাসতে বললে।

'বা, তুমিই তো বললে সঙ্কল্প পূর্ণ হবার কথা।'

'সব তো আমারই দোষ। কিন্তু যাই বলো, মোটা মানুষ, ছুটতে পারছি না। এক চঞ্চলের পাল্লায় পড়ে ইহকাল বুঝি গেল।'

'আমি চঞ্চল?' হাসল নিত্যানন্দ: 'চঞ্চল তোমার প্রভু। নইলে ব্রাহ্মণ হয়ে কেউ রাজ-আজ্ঞা করে? তুমি নিজের প্রভুর

দোষ ধরছ না! চঞ্চল গৌরাঙ্গের হাওয়া আমার গায়ে লেগেছে, তাই আমার এ চাঞ্চল্য।'

ছুটছে আর হুজনে 'আনন্দ-কন্দল' করছে।

কিন্তু, হায়, ডাকাত হুটো এখনো পিছু ছাড়ছে না। কোথায় পালাবে? তোমাদের ধরব তবে ছাড়ব। ঘুচিয়ে দেব কৃষ্ণনাম।

'হুই দস্যু বোলে, 'ভাই! কোথারে যাইবা?
জগা-মাধার ঠাঞি আজি কেমতে এড়াইবা?
তোমরা না জান এথ, জগা-মাধা আছে।
খানি রহ উলটিয়া হের-দেখ পাছে॥'

পিছনে তাকাবে এমন সাহস নেই সন্নেসীদের। তারা ছুটছে আর গোবিন্দ-গোবিন্দ বলছে। বলছে, রক্ষ কৃষ্ণ, রক্ষ কৃষ্ণ।

এত মদ খেয়েছে, বেশিদূর ছুটতে পারল না হুর্বৃত্তেরা। মত্তের বিক্ষেপে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। গড়াগড়ি খেতে লাগল।

হরিদাস আর নিতাই থামল এসে বিশ্বম্ভরের সকাশে। বৈষ্ণব-মণ্ডলে কৃষ্ণকথায় রত বিশ্বম্ভর তাকাল ওদের দিকে। ওরা তখন বললে সমস্ত কাহিনী।

'কে ওরা হু ভাই?' জিগগেস করলে নিমাই!

শ্রীবাস আর গঙ্গাদাস বললে, জগাই মাধাই। হেন হুষ্কার্য নেই যা ওদের অজানা। পাতকের দীর্ঘ পতাকা বয়ে বয়ে ফিরছে।

নিমাই ক্রুদ্ধস্বরে বললে, 'এখানে একবার আসুক। ওদের খণ্ড খণ্ড করব।'

'প্রভু বলে জানো জানো সেই হুই বেটা।
খণ্ড খণ্ড করিমু আইলে মোর এথা॥'

'তাই করো। তাইই তো করবে।' নিতাই বললে অনুযোগের স্বরে, 'তোমার বড়াই খুব বোঝা গেছে! স্বভাবে যে ধার্মিক তাকে কৃষ্ণনাম নেওয়ানো সোজা। কিন্তু এ হুই দস্যু, বিকর্ম ছাড়া আর কিছু যারা জানেনা, তাদের মুখে কৃষ্ণনাম আনতে পারো তো বুঝি

তোমার মহিমা। আমাকে ত্রাণ করা সহজ কিন্তু জগাই-মাধাইকে যদি ভক্তি দিতে পারো, যদি পাপমুখে আনতে পারো কৃষ্ণনাম, তবেই জানব তুমি পতিতপাবন, পাতকীপাবন।' 'আমারে তারিয়া যত তোমার মহিমা। ততোধিক এ দোঁহার উদ্ধারের সীমা॥'

নিমাই হাসল। বললে, 'নিত্যানন্দ, তুমি যখন ওদের মঙ্গল-কামনা করছ, তখন আর ভয় নেই, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ওদের কুশল করবেন।'

'ভয় নেই।' অদ্বৈতও হুঙ্কার করে উঠল: 'দু তিন দিনের মধ্যেই জগাই-মাধাইকে নিয়ে আসব ভক্তগোষ্ঠীতে। দেখবে, তারা আর জগাই-মাধাই নেই, তারাও কৃষ্ণকীর্তনের আনন্দে নিমাই-নিতাই হয়ে উঠেছে।'

গঙ্গাতীরে বাড়ি, কিন্তু নগরের এখানে-ওখানে ডেরা বেঁধে শিকার খোঁজে ডাকাতেরা। এবার এসে ডেরা বেঁধেছে নিমাইয়ের পাড়ায়, শ্রীবাসের বাড়ির কাছে।

সবাই ভয়ে তটস্থ। পাঁচজনে একত্র না হয়ে বাইরে বেরোয় না। খুশিমত গঙ্গাস্নান করা উঠে গেল।

শ্রীবাসের বাড়িতে কীর্তন হচ্ছে, জগাই-মাধাই দেখতে এল, কী ব্যাপার! দেখল দরজা বন্ধ। ভিতরে মৃদঙ্গ-মন্দিরা বাজছে, গানের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করছে গায়কেরা। কুছপরোয়া নেই। আমরাও নাচব। মদের আবেশে শরীর টলছে, তাতে কী, নাচে তালভঙ্গ হবে না। মদ্যপানে বিহ্বল, তবু ডাকাত দু-ভাই নাচতে লাগল। তোমরা যদি না ঘুমিয়ে সমস্ত রাত নৃত্য করতে পারো, আমরা কম কী, আমরাও পারব।

ভোরবেলা ভক্তরা গঙ্গাস্নানে যাবে, দরজা খুলে দেখে, বাইরে অদূরে জগাই-মাধাই। ভয়ে পাংশু হয়ে গেল সকলে। নিমাই যাচ্ছিল পাশ কাটিয়ে, তাকে ডাকল দুভাই। বললে, 'এ তোমার কোন দল? কী গান গাইলে রাতভোর? মঙ্গলচণ্ডী? না কি ঘেঁটু মনসা? যাই গাও, আমাদের বেশ ভালো লেগেছে।'

নিমাই দাঁড়াতে চাইল না। দুর্জনসঙ্গ এড়িয়ে দূরে সরে গেল।

'শোনো নিমাই পণ্ডিত,' হাঁক পাড়ল ডাকাতেরা: 'একদিন আমাদের ওখানে তোমাকে গান শোনাতে হবে। আমাদের নিমন্ত্রণ রইল। আসা চাই কিন্তু।'

যে আমাকে ডাকে, তার কাছে আমি না গিয়ে কি পারি?

দ্রুতপায়ে গঙ্গার দিকে চলে গেল নিমাই। আর-আররাও, যে যে-পথ পেল, পালাল শশব্যস্তে।

আর যে কেউই পালাক, তুমি পালাবে কী করে? মহা-রৌরব থেকেও তুমি উদ্ধার কর। তুমিই যে কৃপার গম্ভীর অপার সমুদ্র। 'কৃপার সমুদ্র কৃষ্ণ গম্ভীর অপার।'

৩২

রাত হয়েছে। নগর ভ্রমণ করে ফিরছে নিত্যানন্দ, জগাই-মাধাই হুঙ্কার করে উঠলো: 'কে?'

'আমি অবধূত।'

'অবধূত?' নাম শুনেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল মাধাই। যে কলসী করে মদ খাচ্ছিল তারই ভাঙা একটা টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে নিত্যানন্দের মাথায় ছুঁড়ে মারল সজোরে।

নিত্যানন্দের মাথা ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল।

নিত্যানন্দ স্মরণ করতে লাগল গোবিন্দকে। গৌরহরিকে।

সে তো জেনে-শুনেই এসেছে এ অঞ্চলে। যদি পাপাত্মাদের উদ্ধারের সুযোগ হয়। যদি সমল লোহা কষিত কাঞ্চন হয়ে ওঠে।

একবার মেরে তৃপ্তি নেই মাধাইয়ের। সে আবার আরেক টুকরো ভাঙা-কলসী দিয়ে মারতে চাইল নিতাইকে।

মাধাইয়ের দুহাত চেপে ধরল জগাই। বললে, 'বিদেশী সন্ন্যেসীকে মেরে সুখ কী? কী লাভটা হবে তোর?'

নিতাইয়ের বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নেই। বললে, 'আমাকে যে মেরেছে এ আমার সহ্যের বাইরে নয়, কিন্তু তোমাদের এই দুর্গতিই আমার অসহ্য। মুখে হরিনাম বলো। তার গুণে আমার এই যন্ত্রণার নিবারণ তো হবেই, তোমাদেরও দুঃখমোচন অনিবার্য।'

মাধাই এ সব ফাঁকা কথায় কান দিতে প্রস্তুত নয়। কিন্তু জগাইয়ের শাসন সে লঙ্ঘন করবে এমন তার সামর্থ্য নেই।

ভক্তেরা কেউ কেউ গিয়ে নিমাইকে খবর দিলে। সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে তখুনি বেরিয়ে পড়ল নিমাই। নিতাইয়ের অঙ্গ থেকে রক্ত ঝরে পড়ছে এ তার সহনাতীত যন্ত্রণা।

স্বচক্ষে দেখে ক্রোধে লেলিহান হল নিমাই। উচ্চস্বরে ঘন ঘন ডাকতে লাগল চক্রকে।

সুদর্শন চক্র তখুনি আবির্ভূত হল শূন্যে। ছুটে চলল জগাই-মাধাইয়ের দিকে।

তেমনি চক্র এসেছিল দুর্বাসাকে দগ্ধ করতে।

দ্বাদশীব্রত ধারণ করেছে অম্বরীষ। ব্রত শেষে পারণের উপক্রম করছে, দুর্বাসা এসে অতিথি হল। রাজর্ষি তাকে যথোচিত সৎকার করে নিমন্ত্রণ করল ভোজনে। দুর্বাসা স্নান করতে গেল যমুনায়। দ্বাদশীমধ্যে পারণ না করলে ব্রতবৈগুণ্য হয়, আর অর্ধমুহূর্তমাত্র অবশিষ্ট, তবু ফিরছেনা দুর্বাসা। ধর্মসঙ্কটে পড়ে অম্বরীষ ব্রাহ্মণদের সঙ্গে পরামর্শ করতে গেল। ব্রাহ্মণরা বললে, জলমাত্র পান করে ব্রত সাঙ্গ করো, কেননা একমাত্র জলপানকে ভোজন ও অভোজন দুই-ই বলা হয়েছে। রাজর্ষি অচ্যুতকে স্মরণ করে জলপান করল। আর সেই মুহূর্তেই ফিরে এল দুর্বাসা। দেখ ধর্মব্যতিক্রম! অতিথিকে আহার করাবার আগেই নিজে ভোজন করেছে। দাঁড়াও, সমুচিত শাস্তি দিই। বলে নিজের মাথার জটা ছিঁড়ে কালানলতুল্য কৃত্যা

নির্মাণ করে অম্বরীষের দিকে নিক্ষেপ করল। অম্বরীষ যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে রইল নিশ্চল হয়ে। যদি রক্ষা করতে হয়, আমি যার ভক্ত আমি যার ভৃত্য, তিনি করবেন।

বিষ্ণু পাঠিয়ে দিলেন সুদর্শন। দাবানল যেমন অরণ্যস্থ সরোষ সর্পকে দগ্ধ করে তেমনি চক্র কৃত্যাকে দগ্ধ করল নিমেষে। তাতে নিরস্ত হলনা, উদ্ধতশিখ অগ্নির মত দুর্বাসার পিছে ধাববান হল। সুমেরুর মহাগুহায় গিয়ে আশ্রয় নিল দুর্বাসা, সেখানেও আবির্ভাব চক্রের। দশ দিকে, আকাশে, সাগরে, বিবরে, পাহাড়ে, যেখানে যায় সেখানেই সেই দুষ্প্রধর্ষ সুদর্শন। দুঃসহ হরিচক্র থেকে আমাকে রক্ষা করুন, স্বর্গে গিয়ে ব্রহ্মা ও শঙ্করের কাছে প্রার্থনা করল। তারা কেউই নড়লনা, শুধু বলল, যাঁর চক্র তাঁর শরণাপন্ন হও।

ভগবানের বাসস্থান বৈকুণ্ঠে উপনীত হল দুর্বাসা। হে বিশ্বভাবন, হে অনঞ্জন, আমি অপরাধ করেছি, আমাকে রক্ষা করুন। বিষ্ণুপাদমূলে লুটিয়ে পড়ল ব্রাহ্মণ।

ভগবান বললেন, আমি ভক্তাধীন, সুতরাং আমি পরবশ, অস্বতন্ত্র। তোমাকে রক্ষা করা আমার সাধ্যের অতীত। আমার ভক্তরা আমার হৃদয়, আমিও তাদের হৃদয়। তারা আমাকে ছাড়া আর কাউকে জানেনা, আমিও তাদের ছাড়া আর কাউকে জানিনা। যারা আমার জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করে আমি তাদেরকে কী করে ত্যাগ করি? সুতরাং যার দরুন এই দুর্বিপাক উপস্থিত হয়েছে তাকে গিয়ে ক্ষান্ত করো। তেজ সাধুজনের প্রতি প্রযুক্ত হলে প্রহর্তারই অনিষ্ট ঘটে। যাও, দেরি কোরোনা, অম্বরীষকে তুষ্ট করলেই বিপৎ-শান্তি হবে।

অম্বরীষের পায়ে গিয়ে পড়ল দুর্বাসা। আমাকে ক্ষমা করো।

অম্বরীষ তখন সুদর্শনের স্তব শুরু করল :

হে সুদর্শন, হে সর্বাস্ত্রঘাতী, হে অচ্যুতপ্রিয়, এই বিপ্রশ্রেষ্ঠকে রক্ষা করো। তুমিই সাক্ষাৎ ধর্ম, তুমিই সুনৃত বাক্য, তুমিই ঈশ্বরের পরমসামর্থ্য। তুমিই অখিলধর্মসেতু, বিশুদ্ধতেজা, জাগ্রত জগৎ-ত্রাণ।

খলব্যক্তিদের নিগ্রহের জন্যেই ভগবান গদাধর তোমাকে নিযুক্ত করেছেন। অতএব আমাদের কুলের সৌভাগ্যের কথা ভেবে এই বিপন্ন ব্রাহ্মণের মঙ্গল করো, তাই আমাদের প্রতি তোমার অনুগ্রহ বলে মনে করব। যদি দান করে থাকি, যজ্ঞ করে থাকি, স্বধর্মপোষণ করে থাকি, তবে এই দ্বিজের বিপদ দূর হোক। যদি সর্বাত্মা ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন থাকেন তা হলে এই বিপ্র বিপন্মুক্ত হোক।

রাজার স্তবে শান্ত হল সুদর্শন। অস্ত্রাগ্নিতাপ থেকে দুর্বাসা পরিত্রাণ পেল।

আমি অপরাধী, তবু তুমি আমার কল্যাণচেষ্টা করলে। দুর্বাসা বিনম্র হল। এই অদ্ভুত মহত্ত্ব ভক্ত ছাড়া আর কার সম্ভব? যারা ভগবানকে বশীভূত করেছে তাদের দুষ্কর বা দুস্ত্যজ কী আছে? রাজন, আমার অপরাধের প্রতি দৃষ্টি না করেও আমার প্রাণ রক্ষা করলে, তোমার মত দয়ালু আর কোথায়?

প্রসন্ন হয়ে দুর্বাসা ভোজন করতে বসল।

ভক্তরক্ষার জন্যে দুষ্কৃতকে নিধন করবার জন্যে আবার এল সেই সুদর্শন। এখন ভক্ত শান্ত হলেই ক্ষান্ত হয় চক্র।

নিতাই আকুল হয়ে উঠল। নিমাইকে বললে, 'তুমি যদি এদের বধই করো তবে আর উদ্ধার করবে কি করে?'

নিমাই স্থির হয়ে রইল।

'এ দুটি প্রাণী আমাকে ভিক্ষে দাও।' নিতাই বললে আর্ত হয়ে, 'এদের দিয়ে তোমার নামের গরিমা দেখাই।'

'আমার নাম!'

'তোমার নাম যে দীনবন্ধু পতিতপাবন অনাথশরণ তা প্রমাণ করি।'

'কিন্তু তোমার কপালে যে রক্ত।'

'ও কিছু নয়। বিশেষ লাগেনি আঘাত। ব্যথা কিছুই পাইনি সত্যি।' মিনতি করতে লাগল নিতাই: 'ওরা আমাকে আসলে

মারতে চায়নি, শুধু ভয় দেখাতে চেয়েছিল। যদি অনিচ্ছায় কেউ আঘাত করে তবে তার কি ক্ষমা নেই?'

তবু নিমাই কোমল হয়না।

তখন নিতাই বললে, 'তুমি এদের দণ্ড দিতে পারো না যেহেতু জগাই আমার প্রাণ রক্ষা করেছে।'

'জগাই তোমার প্রাণ রক্ষা করেছে? সে কি?' নিমাই বিস্মিত হল।

'মাধাই যখন দ্বিতীয়বার কলসীখণ্ড দিয়ে মারবার উদ্যোগ করে তখন জগাই তার হাত ধরে বাধা দেয়। বলে, বিদেশী সন্ন্যেসীকে বৃথা মেরে তোর লাভ কী?' নিতাইয়ের চোখ ছলছল করে উঠল: 'তাইতেই তো মাধাই আরো জখম করতে পারেনি আমাকে।'

> 'মাধাই মারিতে প্রভু রাখিল জগাই।
> দৈবে সে পড়িল রক্ত, দুঃখ নাহি পাই॥
> মোরে ভিক্ষা দেহ প্রভু এ দুই শরীর।
> কিছু দুঃখ নাহি মোর, তুমি হও স্থির॥'

'বলো কী?' সহাস্য নয়নে তাকাল গৌরহরি। পরে জগাইকে সম্বোধন করে বললে, 'হ্যাঁরে জগাই, মাধাইয়ের হাত থেকে তুই বাঁচিয়েছিস আমার নিত্যানন্দকে? তবে তো আমি তোরই হলাম।' বলে সেই অস্পৃশ্য পামর, নৃশংস দস্যুকে গাঢ়বাহুতে আলিঙ্গন করল। 'কৃষ্ণ তোকে কৃপা করুন। নিত্যানন্দকে বাঁচিয়ে তুই যে আমাকে কিনে নিলি।'

জগাইয়ের প্রতি এ উদার প্রসাদ দেখে বৈষ্ণবমণ্ডল হরিধ্বনি করে উঠল।

> 'জগাইয়ের বর শুনি বৈষ্ণবমণ্ডল।
> জয় জয় হরিধ্বনি করিলা সকল॥'

জগাই প্রভুর পায়ে পড়ল।

'তোর প্রেমভক্তি হোক।' আশীর্বাদ করল গৌরহরি: 'উঠে চোখ মেলে ছাখ আমাকে।'

জগাই দেখল শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ দাঁড়িয়ে আছেন। দেখেই মূর্ছিত হয়ে পড়ল। নিমাই পা রাখল তার বুকের উপর।

'প্রভু বলে জগাই, উঠিয়া দেখ মোরে।
সত্য আমি প্রেমভক্তি দান দিল তোরে॥
চতুর্ভুজ—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর।
জগাই দেখিল সেই প্রভু বিশ্বম্ভর॥
দেখিয়া মূর্ছিত হৈয়া পড়িল জগাই।
বক্ষে শ্রীচরণ দিলা চৈতন্যগোসাঞি॥'

তখন মাধাই ছুটে গিয়ে নিমাইয়ের পা ধরল। বললে, 'প্রভু, আমার কী হবে? আমি কার কাছে যাব? আমরা দু ভাই একসঙ্গে পাপ করলাম, আর তুমি জগাইকে উদ্ধার করবে আর আমাকে ত্যাগ করবে, একি উচিত হবে তোমার?'

'দুইজনে এক ঠাঞি কৈল প্রভু পাপ।
অনুগ্রহ কেনে, প্রভু, হয় দুই ভাগ?'

নিমাই বললে, 'তোর ত্রাণ নেই, তুই আমার নিত্যানন্দের অঙ্গ রক্তাক্ত করেছিস। আমার চাইতেও নিত্যানন্দের দেহ বড়।'

'মো হইতে মোর নিত্যানন্দ-দেহ বড়।
তোর স্থানে এই সত্য কহিলাম দৃঢ়॥'

'তাহলে আমার নিষ্কৃতি হবে কিসে?' মাধাই কাঁদতে লাগল।

'আমার ভক্তের নিকট যারা অপরাধী তাদের অপরাধ আমি খণ্ডন করতে পারি না।' বললে নিমাই, 'একমাত্র ভক্তই পারে তা মার্জনা করতে। সুতরাং তুই নিত্যানন্দকে তার রক্তপাতের বিনিময়ে দে তোর অশ্রুপাত।'

মাধাই গৌরাঙ্গের চরণ ছেড়ে নিত্যানন্দের চরণ ধরল।

নিমাই বললে, 'এবার ইচ্ছে করলে তুমি ক্ষমা করতে পারো মাধাইকে।'

নিতাই হাসল, বললে, 'তুমি আমার গৌরব বাড়াবার জন্যে

আমাকে ক্ষমা করতে বলছ। তোমার কৃপাশক্তিতেই তো আমার ক্ষমা। আমি তো কখন ক্ষমা করে বসে আছি। আমার সমস্ত সুকৃতি মাধাইকে দিচ্ছি, যত অপরাধ সব আমার, মাধাইয়ের দায় নেই। এবার প্রভু, তুমি কৃপা করো।'

'নিত্যানন্দ বোলে প্রভু কি বলিব মুঞি।
বৃক্ষদ্বারে কৃপা কর সেই শক্তি তুঞি॥
কোন জন্মে থাকে যদি আমার সুকৃত।
সব দিলুঁ মাধাইরে, শুনহ নিশ্চিত॥
তোর যত অপরাধ—কিছু দায় নাই—।
মায়া ছাড় কৃপা কর, তোমার মাধাই॥'

'তবে আর কী! মাধাইকে কোল দাও। ও-ও সফল হোক।' আদেশ করল গৌরহরি।

ভূলুণ্ঠিত মাধাইকে তুলে নিয়ে নিমাই তাকে আলিঙ্গন করল। ফলে তার দেহে প্রবেশ করল নিত্যানন্দ। সর্ববন্ধনের মোচন হয়ে গেল মাধাইয়ের।

'বিশ্বম্ভর বোলে যদি ক্ষমিলা সকল।
মাধাইরে কোল দেহ, হউক সফল॥
প্রভুর আজ্ঞায় কৈল দৃঢ় আলিঙ্গন।
মাধাইর হৈল সর্ব-বন্ধ-বিমোচন॥
মাধাইর দেহে নিত্যানন্দ প্রবেশিলা।
সর্বশক্তি সমন্বিত মাধাই হইলা॥
হেনমতে দুই জনে পাইলা মোচনে।
দুইজনে স্তুতি করে দুইর চরণে॥'

তখন বিশ্বম্ভর বললে, 'তোরা শোন, শুনে রাখ। কোটি কোটি জন্মে তোদের যত পাপ আছে, সব দায় আমার। তোদের মুখেই এখন থেকে আমি খাব, তোদের দেহেই আমার বসতি হবে। নিত্যানন্দ ঠিকই বলেছে, তোদের ছুঁলে যারা গঙ্গাস্নান করত, এখন

তোদের স্পর্শকেই তারা গঙ্গার সমান মনে করবে।' বৈষ্ণবদের দিকে তাকাল গৌরহরি : 'এ দু ভাইকে আমার বাড়িতে নিয়ে চলো, এদের সঙ্গে কীর্তন করব।'

বৈষ্ণবেরা ধরাধরি করে জগাই-মাধাইকে নিয়ে এল প্রভুর বাড়ি।

কপাট পড়ল বাইরে। অভ্যন্তরে বসল বৈষ্ণবসমাজ। বিশ্বম্ভরের দুই পাশে নিত্যানন্দ আর গদাধর। সামনে অদ্বৈত। চারপাশে পুণ্ডরীক, হরিদাস, গরুড় পণ্ডিত, রামাই, শ্রীবাস আর গঙ্গাদাস। বক্রেশ্বর পণ্ডিত আর চন্দ্রশেখর আচার্য। আর সকলের সামনে সর্ব অঙ্গে কম্প আর রোমহর্ষ নিয়ে ধুলোয় গড়াগড়ি দিচ্ছে আর অঝোরে কাঁদছে জগাই-মাধাই। মাধব আর জগন্নাথ।

চৈতন্যশক্তি কে বোঝে? দুর্ধর্ষ পাষণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে বিগলিত-বিনীত। মহাভাগবত।

'তপস্বী সন্ন্যাসী করে পরম পাষণ্ড।
এইমত লীলা তান অমৃতের খণ্ড॥
ইহাতে বিশ্বাস যার সেই কৃষ্ণ পায়।
ইথে যার সন্দেহ সে অধঃপাতে যায়॥'

কৃপা-বিতরণে কৃষ্ণের কি পক্ষপাতিত্ব আছে? না, তা নেই। পরমকরুণ কৃষ্ণ সকলের জন্যেই তাঁর করুণার ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে রেখেছেন, যার যেমন প্রবণতা, যার যেমন যোগ্যতা, সে সেই অনুসারে কুড়িয়ে নিচ্ছে। সূর্যরশ্মি সকল কাচেই পড়ছে, কিন্তু যে কাচের মধ্যস্থল স্থূল তাতেই রশ্মি সমধিক ঔজ্জ্বল্য ধারণ করে—এমন কি, কোনো দাহ্য বস্তু তাতে রাখলে তা দগ্ধ হয়ে যায়। অন্য কাচে এমনটি হয় না। রশ্মিতে পক্ষপাতিত্ব নেই, কাচেরই গুণাগুণের তারতম্য। মেঘ সর্বত্রই সমান ধারায় বর্ষণ করে, কিন্তু কোনো ক্ষেত্রে শস্য জন্মে, কোনো ক্ষেত্রে বা কণ্টক। মেঘে পক্ষপাতিত্ব নেই, শুধু ক্ষেত্রের চরিত্রের ইতর-বিশেষ। সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ। যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু

চাপ্যহম্॥ গীতায় অর্জ্জুনকে বলছেন শ্রীকৃষ্ণ : আমি সর্বভূতের পক্ষেই সমান। আমার দ্বেষ্যও নেই প্রিয়ও নেই কিন্তু যারা ভক্তিভরে আমাকে ভজনা করে তারা আমাতেই অবস্থান করে আর আমিও সে সকল ভক্তেই অবস্থান করি। এটা ভগবানের পক্ষপাতিত্ব নয়, এটা ভক্তির বস্তুগত শক্তির প্রভাব।

নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম। এ অধ্যাত্মতত্ত্বের কথা। ভগবান স্বরূপতঃ সমদর্শী, দ্বন্দ্বাতীত। কিন্তু জীব যখন ভক্তিসিক্ত হয় তখন সে বিশেষ করে ভগবানকে আকর্ষণ করে। ভক্ত ভগবানে আসক্ত হলে ভগবানও ভক্তে আসক্ত হন। এ ভক্তির কৃতিত্ব, ভগবান যেমন নির্দোষ তেমনি নির্দোষ। ভক্তির যেখানে ভগবদ্‌বশীকরণী শক্তি, সেখানে ভগবান কী করবে, গতির্ভর্ত্তা প্রভুসাক্ষী হতেই হবে! স্ফটিক যেমন নির্মল তেমনি আছে, তুমি তার কাছে রক্তজবা রাখলে সে রক্তাভ, নীলপদ্ম রাখলে সে নীলাভ। স্বরূপে স্ফটিক রক্তও নয় নীলও নয়। দুগ্ধপোষ্য সরল শিশুকে স্নেহ দেখালে সে হাসবেই, রূঢ়তা দেখালে সে ক্রুদ্ধ হবে, বিমুখ হবে। স্বরূপশুদ্ধ শিশুর মনে রাগও নেই অনুরাগও নেই। তোমার যেমন ভাব তারও তেমনি প্রত্যুত্তর। যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। আমি যদি ভালোবাসি আমাকে কি না ভালোবেসে পারবেন? আমি যদি তাঁর উপর সর্বতোভাবে নির্ভর করি, তিনি আমাকে কৃপা না করে যাবেন কোথায়?

জগাই-মাধাই দুজনে গৌরাঙ্গসুন্দরকে স্তুতি করতে লাগল। চৈতন্যচন্দ্রের আদেশে দুজনের জিহ্বায় এসে বসল সরস্বতী।

নানা অবতারে নানা পাপী-উদ্ধার করেছ, কিন্তু আমাদের দুই পাতকীর উদ্ধারই অদ্ভুততম। আমাদের উদ্ধারেই অজামিল-উদ্ধারের মহত্ত্বও অল্প হয়ে গেল। অজামিলের মুখে নারায়ণ নাম শুনে চারজন বিষ্ণুদূত এসেছিল আর আমরা রক্তপাত করা সত্ত্বেও তুমি নিজে এসে উপস্থিত হলে। তোমার মহিমা তোমার সাঙ্গোপাঙ্গ, অস্ত্র,

পারিষদ, সব তুমি গোপন করে রেখেছিলে, এখন সমস্ত ব্যক্ত হয়ে উঠল। এর নামই বোধহয় 'নির্লক্ষ্য উদ্ধার'।

পাপ অনুতাপানলে গলে গলে পড়তে লাগল অশ্রু হয়ে। জগাই-মাধাই কাঁদছে আর বন্দনা করছে।

'নির্লক্ষ্যে তারিলে ব্রহ্মদৈত্য দুই জন।
তোমার কারুণ্য সবে ইহার কারণ ॥'

বৈষ্ণবেরা বললে, 'এ দুই মদ্যপ দস্যু যে স্তুতি করছে এও তোমারই কৃপা।'

'এরা আর মদ্যপ নয়, দস্যু নয়, এরা আমার সেবক।' বললে নিমাই, 'সকলে মিলে এদের অনুগ্রহ করো। যার কাছে যত এদের অপরাধ আছে সব প্রসন্ন হয়ে মার্জনা করো। যেন আর কোনো জন্মে আমাকে এরা না ভোলে।'

জগাই-মাধাই বৈষ্ণবদের পায়ে গিয়ে পড়ল।

'জগাই মাধাই, তোমরা নিরপরাধ হলে, কিন্তু জেনো এ সমস্তই আমার নিত্যানন্দের প্রসাদ। আর ভয় নেই,' গৌরহরি অভয়ঙ্কর হাসি হাসল : 'তোমাদের সমস্ত পাপ আমি গ্রহণ করলাম।'

দেখতে-দেখতে গৌরাঙ্গের সোনার অঙ্গ কালো হয়ে গেল।

'দুই জনার শরীরে পাতক নাহি আর।
ইহা বুঝাইতে হৈলা কালিয়া আকার ॥'

চতুর্দিকে হরিধ্বনি পড়ে গেল। তারপর শুরু হল কীর্তন। জগাই-মাধাই মহানন্দে নাচতে লাগল, বলতে লাগল হরিবোল। ঘরের ভিতর থেকে বধূসঙ্গে শচীমাতা দেখতে লাগল কৃষ্ণাবেশের উল্লাস। দুই দস্যুকে দুই মহাভাগবতে পরিণত করে গণ-সহ নাচছে গৌরাঙ্গ। গায়ে গায়ে ঠেলাঠেলি করছে। 'যার অঙ্গ পরশিতে রমা পায় ভয়। সে প্রভুর অঙ্গ-সঙ্গে মদ্যপ নাচয় ॥'

নৃত্যকীর্তনান্তে সকলে মিলে গঙ্গায় গেল জলকেলি করতে। গঙ্গাস্নানের শেষে তীরে উঠে গৌরহরি সকলকে মালা-প্রসাদ-

চন্দন দিল। আর নিজের গলার মালা জগাই-মাধাইকে উপহার দিল।

চৈতন্যকৃপায় জগাই-মাধাই পরমধার্মিক হয়ে গেল। উষাকালে নির্জনে গঙ্গাস্নান সেরে প্রত্যহ দু লক্ষ কৃষ্ণনাম জপ করে। নিরবধি কৃষ্ণ বলে কাঁদে আর পূর্বের হিংসার কথা ভেবে অনুক্ষণ নিজেদের ধিক্কার দেয়। আবার চৈতন্যকৃপা স্মরণ করে, হিংসুক না হলে কি পেতাম গৌরচন্দ্রকে? পেতাম কি কৃষ্ণরস? হতাম কি কৃষ্ণের দয়িত? আবার এ জীবাধমকে প্রভু কৃপা করলেন সে কথা ভেবে আবার ক্রন্দন।

নিত্যানন্দকে নিভৃতে দেখে মাধাই তার পায়ে গিয়ে পড়ল। 'তোমাকে আমি মেরেছি, আমার কী গতি হবে? যে বিগ্রহে কৃষ্ণ শয়ন বিহার করে সেই অঙ্গে আমি রক্তপাত করেছি, আমি কোথায় যাব?'

নিতাই তাকে তুলল ধুলো থেকে। হাসিমুখে বললে, 'শিশুপুত্রে মারলে কি বাপ দুঃখ পায়? তোমার প্রহার সেই শিশুপুত্রের স্পর্শের মত। শোনো তুমি আমার প্রভুর অনুগ্রহভাজন, অতএব আমার চোখে তোমার আর দোষ নেই, তুমি নিষ্কলুষ।'

'আমার প্রভুর তুমি অনুগ্রহ পাত্র।
আমাতে তোমার দোষ নাহি তিলমাত্র ॥
যেজন চৈতন্য ভজে সে-ই মোর প্রাণ।
যুগে যুগে আমি তার করি পরিত্রাণ ॥
না ভজি চৈতন্য যবে মোরে ভজে গায়।
মোর দুঃখে সেহো জন্মে জন্মে দুঃখ পায় ॥'

মাধাই বললে, 'প্রভু, আরেক কথা। অনেক জীবের হিংসা করেছি, তারা কারা চিনি না। চিনতে পারলে জনে জনে চরণে পড়ে ক্ষমা চাইতে পারতাম। এখন আমি কী করব, দয়া করে উপদেশ দিন।'

নিতাই বললে, 'গঙ্গাঘাটের সেবা করো, মার্জনা করো, ক্ষালন করো। গঙ্গার সেবাই সর্ব অপরাধভঞ্জনী। লোকে সুখে স্নান করবে আর তোমাকে আশীর্বাদ করবে। তুমি নম্র হয়ে সকলকে নমস্কার করবে আর অপরাধ ধুয়ে যাবে তোমার।'

গঙ্গাঘাট 'সজ্জ' করতে লাগল মাধাই। যে কেউই স্নান করতে আসে মাধাই দণ্ডপ্রণাম করে আর বলে, 'জ্ঞানে-অজ্ঞানে যত অপরাধ করেছি, মার্জনা করুন। কৃষ্ণ আপনার ভালো করবেন।'

মাধাই কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলে কাঁদে আর সকলে আনন্দে গোবিন্দ-গোবিন্দ বলে।

'যাই বলো, নিমাই পণ্ডিত কীর্তি রাখল।' ইতর জনে বলাবলি করে, 'দুর্জনেরা নিন্দা করে বটে কিন্তু নিমাই সামান্য মানুষ হলে জগাই-মাধাই কি সন্ন্যেসী হয়ে যায়?'

জগাই স্থির হয়ে বসে জপ করে আর মাধাই কোদাল হাতে ঘাট তৈরি রাখে। তোমরা দু' ভাই গৌর-নিতাই। আমরা দু' ভাই জগাই-মাধাই।

সদা হৃদয়কন্দরে স্ফূরতু বঃ শচীনন্দনঃ। শচীনন্দনঃ হরিঃ।

আর হরিশব্দের একটি অর্থ যখন সিংহ তখন শচীনন্দন হরি অর্থ চৈতন্যসিংহ।

> 'চৈতন্যসিংহের নবদ্বীপে অবতার।
> সিংহগ্রীব সিংহবীর্য সিংহের হুঙ্কার॥
> সেই সিংহ বসুক জীবের হৃদয়কন্দরে।
> কল্মষ-দ্বিরদ নাশে যাহার হুঙ্কারে॥'

সিংহের গর্জন শুনে যেমন হাতি পালায় তেমনি চৈতন্য-হুঙ্কারে পাপতাপ অদৃশ্য হয়। ভক্তিবিরোধী কর্মের নাম কল্মষ। চৈতন্য-হুঙ্কারে কল্মষ নষ্ট হয়ে যায়। আর যে গুহায় সিংহ বাস করে সে গুহায় হাতি আসে না। তেমনি যে হৃদয়ে চৈতন্য স্ফুরিত হয়েছে সে হৃদয়ে ভক্তিবিরোধী কর্মের বাসনাও অন্তর্হিত।

'অতএব পুনঃ কহোঁ উর্দ্ধবাহু হৈয়া।
চৈতন্য নিত্যানন্দ ভজ কুতর্ক ছাড়িয়া ॥'

ভগবানের বহু গুণের মধ্যে করুণাই জীবের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ। করুণাই জীবের সঙ্গে ভগবানের সংযোগসেতু। ভগবান শুধু রসিক-শেখর হলে জীবের লাভ কী, যদি না তিনি পরমকরুণ হন? এই করুণার মধ্যেই ভগবানের অনুভব। আর এই করুণা গৌর-নিতাইয়ে বেশি অভিব্যক্ত। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণভজনের সঙ্গে গৌর-নিতাইয়েরও ভজন করো।

তাঁরা দু ভাই কৃষ্ণ-বলাই।
তোমরা দু ভাই গৌর-নিতাই ॥
আর, আমরা দু ভাই জগাই-মাধাই ॥

৩৩

শ্রীবাসের বাড়ি দরজা বন্ধ করে রাত্রিতে কীর্তন করছে নিমাই। গয়া থেকে এসে অবধি করছে। নিরবচ্ছিন্ন ভাবে করছে এক বছর। গৃহত্যাগের পূর্ব রাত্রি পর্যন্ত।

এক দিন নাচতে-নাচতে নিমাই বললে, 'আজ আমার উল্লাস হচ্ছেনা কেন?'

কে কী বলবে! একে-অন্যের দিকে তাকাতে লাগল সকলে।

'সত্যি, সুখ পাচ্ছিনা। কী হল বলো দেখি। আজ কৃষ্ণ আমার প্রতি কেন বিমুখ হলেন?' বিমর্ষ চোখে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল নিমাই।

সকলে প্রমাদ গুনল কার কী অপরাধ হয়েছে কে জানে। নিমাইয়ের চিত্তে কেন প্রসাদ নেই?

'দেখ তো কোনো অভক্ত লোক লুকিয়ে আছে কিনা।' হুঙ্কার করল নিমাই।

খোঁজাখুঁজি করে দেখা গেল শ্রীবাসের শাশুড়ি ঘরের মধ্যে লুকিয়ে আছে।

শ্রীবাসের শাশুড়ি বিষয়াসক্ত, ভগবদবিমুখ। নিমাই তার জামাইকে বিপথে নিয়ে যাচ্ছে এই তার মনোভাব। তাই নিমাইয়ের বিরুদ্ধতাতেই সে বদ্ধপরিকর। তার উপস্থিতির ফলে কীর্তন পণ্ড হোক এই তার অভিসন্ধি।

শাশুড়িকে দেখে ক্রুদ্ধ হল শ্রীবাস। হুকুম দিল বাড়ির বার করে দিতে।

শাশুড়ি চলে গেলে শান্ত হল পরিবেশ। বইতে লাগল প্রসাদ-বায়ু। নিমাইয়ের উল্লাস ফিরে এল।

'আজ আবার আমার প্রেমানুভব হচ্ছে না কেন?' নিমাই আরেক দিন প্রকাশ করল কাতরতা : 'আজ আবার কী হল?'

সবাই ত্রস্ত, হতবাক।

'নাচ জমছে না কেন? কেন সব শুষ্ক লাগছে? আজ এখানে আসতে পথে কি কোনো কুলোকের হাওয়া লাগল? না, তোমাদের কাছেই কোনো অপরাধ করেছি?'

আমাদের কাছে আবার তোমার কোন অপরাধ! অসহায়ের মত চেয়ে রইল সকলে।

'আমার প্রাণ যায়। শিগগির আমাকে প্রেম দাও।' নিমাইয়ের কণ্ঠে করুণতর আর্তি: 'প্রেম ছাড়া প্রাণ আর বাঁচেনা।'

ভক্তই ভক্তিরসের আস্বাদক। আর ভক্তের হৃদয়েই ভক্তিরস আস্বাদনীয়। সে কী রকম ভক্ত? ভক্তিনির্ধূতদোষঃ। সাধন-ভক্তিতে যার চিত্তমালিন্য তিরোহিত হয়েছে। সে কী রকম ভক্ত? যে রসিক-আসঙ্গ-রঙ্গী। রসজ্ঞ ভক্তসঙ্গে যে সুখাবস্থ। গোবিন্দপাদপদ্মই

যার জীবনীভূত। মলিনতা দূর হলে কী হবে? চিত্তে জাগবে প্রসন্ন ঔজ্জ্বল্য। আর চিত্ত প্রসন্ন আর উজ্জ্বল হলেই প্রৌঢ়ানন্দচমৎকারকাষ্ঠার আবির্ভাব।

চিত্ত অপ্রসন্ন কখন? যখন তৃপ্তির অপ্রতুল। তৃপ্তির অভাব কখন? যখন বাসনার অপূরণ।

বাসনার তৃপ্তির জন্যে জীব মায়িক আনন্দ খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু সে আনন্দে কি আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হচ্ছে? আকাঙ্ক্ষা নিত্য, মায়িক আনন্দ অস্থায়ী। নিত্য আকাঙ্ক্ষার জন্যে নিত্য আনন্দ কোথায়! নিত্য যেখানে আলোকের পিপাসা আর যেখানে সূর্যও শাশ্বত, সেখানে মায়া-মেঘের আবরণটি সরিয়ে ফেললেই অসীম বিমল-উদ্ভাস।

ক্ষুধা না থাকলে ভোজন কী! আকাঙ্ক্ষা না থাকলে আনন্দ কী! ক্ষুধা যত তীব্র, ভোজ্যরসও তত রমণীয়।

ভক্তি-বাসনা যত গাঢ় ভক্তি-রস-আস্বাদনও তত মধুর।

এদিকে নিমাইয়ের এই আর্তি আর ওদিকে অদ্বৈত প্রেমানন্দে বিহ্বল হয়ে নাচছে।

'তুমি প্রেমে ডগমগ হয়ে নাচছ আর আমি আর শ্রীবাস পাচ্ছিনা তার একতিল।' নিমাই অদ্বৈতকে লক্ষ্য করে বললে, 'অবধূত নিত্যানন্দও তোমার কাছে প্রেম পেল। পেল কত 'তিলি-মালি' অপাঙক্তেয়ের দল। আমি আর শ্রীবাসই শুধু পেলাম না কৃপাকণা। গোঁসাই, কৃপা করো, প্রেম দাও।'

অদ্বৈত ভ্রূক্ষেপও করল না। যেমন নাচছিল তেমনি নাচতে লাগল তন্ময় হয়ে।

'যদি না দাও', নিমাই গর্জন করে উঠল: 'তোমার সমস্ত প্রেম শুষে নেব বলে রাখছি। তখন কিন্তু আমার দোষ দিতে পারবে না।'

চৈতন্যপ্রেমে মত্ত অদ্বৈত কি-এক কর্কশ কথা বলে ফেলল

নিমাইকে। মুখে বাধল না এতটুকু। যেমন-কে-তেমন হাতে তালি দিয়ে নাচতে লাগল কৌতুকে।

'চৈতন্যের প্রেমে মত্ত আচার্য্য গোসাঞি।
কি বোলয়ে, কি করয়ে, কিছু স্মৃতি নাঞি॥
যে ভক্তি প্রভাবে কৃষ্ণে বেচিবারে পারে।
সে যে বাক্য-বলিবেক, কি বিচিত্র তারে॥'

অদ্বৈতের কর্কশ বাক্য শুনে নিমাই আর প্রত্যুত্তর করল না। প্রেমশূন্য শরীর নিয়ে আর কাজ কী! বলতে-বলতে সোজা ছুট দিল গঙ্গার দিকে। নিতাইয়ের লক্ষ্যের বাইরে নিমাই নয়, ত্বরিতে নিতাই পিছু নিল। নিতাইয়ের পিছনে চলল হরিদাস।

দাঁড়াল না নিমাই, গঙ্গায় ঝাঁপ দিল।

নিতাই আর হরিদাসও পড়ল ঝাঁপ দিয়ে। ধরাধরি করে নিমাইকে তীরে তুলল দুজনে।

'আমাকে কেন তুললে? প্রেমরহিত জীবনে আমার ফল কী?' বললে নিমাই।

'তাই বলে তুমি মরতে যাবে?' নিতাই বললে, 'ভক্ত কী বললে বা না বললে তাতে তোমার অভিমান হবে? নিজে মরতে গিয়ে ভক্তকে মারবে? অন্য ভাবে আর কি তাকে শাস্তি দেওয়া যায় না?'

নিমাই বললে, 'শোনো, আজ রাত আমি নন্দন আচার্যের বাড়িতে গিয়ে থাকব। এ কথা কাউকে যেন বলবে না। প্রকাশ করবে না কোথাও।'

নিমাই চলে গিয়েছে আর ফিরে এল না, শ্রীবাসের বাড়িতে ভক্তের দল কাঁদতে বসল। যেন রাসের রাত্রিতে গোপীমণ্ডল থেকে চলে গিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ। নেমে এসেছে বিরহের বিভাবরী।

হে সম্ভোগপতি, হে অভীষ্টপ্রদ, আমরা তোমার বিনাবেতনের কিঙ্করী, কোথায় আছ, আমাদের দেখা দাও। তোমার শোকনাশন

হাসি, প্রেমম্রক্ষিত কটাক্ষ, নিভৃত সঙ্কেত-ক্রীড়া স্মরণ করে আমাদের চিত্ত মথিত হচ্ছে। যখন পশুচারণ করতে করতে ব্রজ থেকে দূরে চলে যাও, তখন তোমার কমলকোমল পা দুখানি করকা ও তৃণাঙ্কুরে আঘাত পাবে সেই চিন্তায় আমাদের মন আকুল হয়ে থাকে। দিনশেষে যখন ধেনু নিয়ে ফিরে আস, তখন নিবিড় ধূলিপটলে ধূসরিত, নীলকুন্তলে ঢাকা তোমার মুখখানি আমাদের মনে মদনপীড়া উজ্জীবিত করে, কিন্তু কিছুতেই তুমি সঙ্গ দাও না। তোমার চরণকমল লক্ষ্মীসেবিত প্রণতজনের অভিলাষপূরক, সর্ব পৃথিবীর ভূষণ, আপৎ-কালে চিন্তনীয়, সেবাকালেও সুখপ্রদ, এখন তা আমাদের স্তনতটে স্থাপন করো। শব্দায়মান বেণু তোমার অধরসুধা পান করছে, যে অধরামৃতে মানুষের সার্বভৌম সুখেচ্ছারও বিস্মরণ ঘটে। সেই অধরসুধা দান করো আমাদের। তোমার কুটিলকুন্তলশোভিত মুখখানি অনিমেষে প্রাণ ভরে যে দেখব তারও উপায় নেই, খল ব্রহ্মা আমাদের চক্ষুতে পক্ষ্ম দিয়ে দিয়েছেন। তুমি গীতের গতি অবগত আছ, তোমার উচ্চগীতে মোহিত হয়ে পতি পুত্র জ্ঞাতি ভ্রাতা ও বান্ধবদের উপেক্ষা করে এসেছি, রাত্রিকালে শরণাগতা কামিনীদের তুমি ছাড়া আর কে পরিত্যাগ করতে পারে? তোমার লাভাকাঙ্ক্ষায় আমাদের চিত্ত ব্যাকুল হয়েছে, যা হৃদরোগ নাশ করে কার্পণ্য ত্যাগ করে সেই ঔষধ কিঞ্চিৎ আমাদের দান করো। তুমিই আমাদের জীবন। পাছে তোমার ব্যথা লাগে এই ভয়ে তোমার যে পাদপদ্ম আমাদের কঠিন কুচতটে সন্তর্পণে ধারণ করি তুমি সেই পা দু'খানি দিয়ে কাননে ভ্রমণ করছ, পাষাণে কি ওদের ব্যথা লাগছে না? এই ভেবেই আমাদের কষ্টের আর অন্ত নেই।

নন্দন আচার্যের বাড়িতে এসে উপস্থিত হল নিমাই আর ভগবান-আবেশে বিষ্ণুখট্টায় গিয়ে বসে পড়ল। নন্দন আচার্য ও তার পারিষদদের আনন্দ দেখে কে!

মূর্তিমান পরমমঙ্গল সমাগত, সকলে দণ্ডবৎ হয়ে পড়ল ভূতলে।

নতুন বসন এনে দিল, দিল সেবাশোভার উপকরণ। মালা, গন্ধ, চন্দন, কর্পূর-তাম্বুল। নন্দনসেবায় আনন্দিত গৌরহরি।

বললে, 'আজ তুমি এখানে আমাকে গোপন করে রাখবে।'

'সাধ্য কী, তোমাকে গোপন করি।' নন্দনের দু'চোখ জলে ভরে উঠল : 'হৃদয়ে থেকেও তো পারলে না লুকোতে। দেখা দিতে প্রকট হলে। ক্ষীরসিন্ধুর মধ্যেও বা প্রচ্ছন্ন থাকতে পারলে কই?'

সমস্ত রাত কৃষ্ণ-কথা-রসে কেটে গেল দুজনের।

'কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন!
যে রূপের এক কণ ডুবায় সব ত্রিভুবন,
সর্বপ্রাণী করে আকর্ষণ॥
চড়ি গোপী-মনোরথে মন্মথের মন মথে
নাম ধরে মদনমোহন।
জিনি পঞ্চশরদর্প স্বয়ং নবকন্দর্প
রাস করে লঞা গোপীগণ॥'

কাম-বিজয়ই রাসলীলার তাৎপর্য। সম্মোহন, মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন—এই পাঁচ ইন্দ্রিয়ার্থ যার পাঁচ শর—সেই মদনের গর্ব খর্ব হয়েছে। কৃষ্ণকে দেখে স্বয়ং মদনই সম্মোহিত। অকৈতব নির্মল প্রেমের রথেই কৃষ্ণের আরোহণ। আর, গোপীরা নির্মলতার স্বচ্ছন্দ স্রোতস্বিনী ছাড়া আর কী।

নন্দনকে নিমাই বললে, 'যাও, একাকী শ্রীবাসকে আমার কাছে নিয়ে এস।'

নন্দন নিজে গিয়ে শ্রীবাসকে নিয়ে এল।

'আচার্য কেমন আছে বলো।' জিগগেস করল নিমাই।

শ্রীবাস কাঁদতে লাগল। বললে, 'উপবাস করে পড়ে আছে। যেমন অপরাধ তেমনি দণ্ড পেয়েছে। এবার তাকে কৃপা করুন।

'চলো, আচার্যের বাড়ি চলো।'

আচার্যের বাড়ি গিয়ে দেখল আচার্য কাষ্ঠবৎ পড়ে আছে মাটিতে।

'ওঠো', বললে নিমাই, 'দেখ আমি বিশ্বম্ভর, এসেছি তোমার কাছে।'

লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে রইল অদ্বৈত। মুখে কথা ফুটল না।

'ওঠো, চিন্তা কী, আমিই তো এসেছি।' নিমাই আবার বললে।

অদ্বৈত মাটিতে মুখ গুঁজে বললে, 'প্রভু, আমি বুঝেছি আমার মত হতভাগ্য আর কেউ নেই। তুমি আমাকে শুধু কুমতি দিয়েছ। আর-সকলকে দৈন্য-দাস্য দিয়েছ আর আমাকে দিয়েছ অহঙ্কার। আর-সকলে তোমার অন্তরঙ্গ, আমিই বহিরঙ্গ। মুখে তুমি এক কথা বলো আর কাজে করো অন্যরূপ। আমাকে যে আত্মীয়তা দেখাও সে তোমার বাহ্যিক। নইলে কেন তুমি আমাকে গৌরব দেখাও? দেখিয়ে আমার দন্তের সূচনা করো? আমি তোমার কেউ নই, কেউ নই।'

গৌরহরি হাসতে লাগল। বললে, 'তুমিই আমার নিজজন। তুমি নিজজন বলেই তো তোমাকে দণ্ড দিই। যে আমার অনুগ্রহের পাত্র তার অপরাধ দেখে তাকেই তো শাস্তিরূপ আশীর্বাদ পাঠাই। জন্মজন্ম তাকে দাস করে রাখি। সব রাজ্যভার দেই সে মহাপাত্রেরে। অপরাধে শোচ্য-হাতে তার শাস্তি করি।'

অদ্বৈত বললে, 'তাই করো, আমাকে দণ্ড দাও, আমাকে দাস করে রাখো।'

'প্রাণ, দেহ, ধন মন,—সব তুমি মোর।
তবে মোরে দুঃখ দেহ, ঠাকুরালি তোর॥
হেন কর প্রভু, মোরে দাস্যভাব দিয়া।
চরণে রাখহ দাসীনন্দন করিয়া॥'

'এখন তবে ওঠো, স্নান করো। আর উপবাসে থেকো না।' বললে নিমাই, 'অপরাধ দেখি কৃষ্ণ যার শাস্তি করে। জন্মজন্ম দাস সেই—বলিনু তোমারে॥'

অদ্বৈত উঠে আনন্দে নাচতে লাগল। বললে, 'আর কী! আমি কৃষ্ণের দাস হলাম। আমি কৃষ্ণের দাস হলাম।'

কৃষ্ণের দাস হওয়া কি সোজা কথা? মুক্ত পুরুষই কৃষ্ণের দাস হতে পারে। অল্প করেই যেন কৃষ্ণের দাস হয়েছ ভেবো না। অল্প ভাগ্যে হওয়া যায় না কৃষ্ণদাস।

'আগে হয় মুক্ত, তবে সর্ব-বন্ধ-নাশ।
তবে সেই হৈতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস॥'

দাস্য ভাবের ভক্ত চার শ্রেণীর। অধিকৃত, আশ্রিত, পার্ষদ, অনুগ। ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা অধিকৃত দাস। আশ্রিত ভক্ত আবার তিন শ্রেণীর। শরণাগত, জ্ঞাননিষ্ঠ আর সেবানিষ্ঠ। যারা মুক্তি চায় যেমন কালীয়নাগ, যেমন জরাসন্ধের কারাগারে আবদ্ধ নৃপতির দল, তারা শরণাগত। যারা মুক্তি চায়না অথচ ভগবানে সমর্পিত, তারা জ্ঞাননিষ্ঠ। যেমন শৌনিকাদি ঋষি। আর যারা ভজনে আসক্ত, যেমন বহুলাশ্ব, ইক্ষ্বাকু, শ্রুতদেব, পুণ্ডরীক, তারা সেবানিষ্ঠ। যারা কৃষ্ণের কাজে নিযুক্ত, মন্ত্রী বা সারথি, অথচ যারা পরিচারক তারা পার্ষদ ভক্ত। যেমন দ্বারকায় উদ্ধব, দারুক, সাত্যকি; কুরুবংশে ভীষ্ম, বিদুর, পরীক্ষিত। এ পর্যন্ত 'পূর্ণৈশ্বর্য্য-প্রভুজ্ঞান অধিক হয় দাস্যে।' এ সমস্ত ভক্তের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণ ভগবান এই জ্ঞান বিদ্যমান। এদের রতি ঐশ্বর্যজ্ঞানমিশ্রা। অনুগের মধ্যে যারা পুরস্থ অর্থাৎ দ্বারকার, যেমন সুমন্ত্র, মণ্ডন, সুতম্ব, তারা কৃষ্ণের সেবা করছে বটে, কৃষ্ণের মাথায় ছাতা ধরে বা চামর ঢুলিয়ে, কিন্তু তাদের সেবায়ও ঐশ্বর্যবুদ্ধি। কিন্তু ব্রজস্থ অনুগ, যেমন রক্তক, পত্রক, পত্রী, মধুকণ্ঠ, কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলে জানে না, ব্রজজন নিজজন বলে জানে। তাদের কাছে কৃষ্ণ নন্দ-মহারাজার ছেলে ছাড়া কিছু নয়। তাদের প্রীতির গাঢ়তায় ভগবত্তার জ্ঞান লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বররূপে তাদের প্রভু নয়, একমাত্র সেব্য-রূপেই প্রভু। তারা কৃষ্ণের কাপড় ধুয়ে দিচ্ছে, অগুরু দিয়ে স্নানের জল সুবাসিত করে দিচ্ছে, পান

সেজে দিচ্ছে, কিন্তু কোনো কাজেই এ বুদ্ধি নেই যে কৃষ্ণ ভগবান, কৃষ্ণ রাজরাজেশ্বর। ব্রজের দাস্য শুদ্ধ মাধুর্য্যের ধারাস্নান। ব্রজের সেবা প্রাণঢালা।

তৃণের থেকে নীচ হয়ে বৃক্ষের মতন সহিষ্ণু হয়ে নিজ সম্মানলাভের অভিলাষ না করে আর অন্যের প্রতি সম্মান দেখিয়ে সর্বদা হরিকীর্তন করো। 'নাম-সূত্রে গাঁথি পরো কণ্ঠে এই শ্লোক।' আর ও-ভাবে নাম করলেই মিলবে কৃষ্ণপ্রেম।

চাপাল গোপাল খুব তেজী দুর্মুখ ব্রাহ্মণ। আসল নাম গোপাল কিন্তু বিদ্যার ঔদ্ধত্যে চপল বলে চাপাল বলে সকলে। কীর্তন সহ্য করতে পারে না, শ্রীবাসের বাড়িতে নিয়মিত কীর্তন হয় বলে তার উপর বিষম রাগ। একদিন রাত্রে শ্রীবাসের অঙ্গনে কীর্তন হচ্ছে, দ্বার বন্ধ, গোপাল দরজার বাইরে তন্ত্রপন্থী পূজার উপকরণ সাজিয়ে রাখল। সাজিয়ে রাখল কলাপাতা, তার উপরে জবাফুল, হরিদ্রা, সিঁদুর, তণ্ডুল আর রক্তচন্দন। আর এক ভাণ্ড মদ। অর্থাৎ দেখাতে চাইল শ্রীবাস মদ্যপায়ী তান্ত্রিক। শ্রীবাস একা নয়, যারা দরজা বন্ধ করে নর্তন-কীর্তন করছে, তারাও।

সাজিয়ে রেখে বাড়ি পালাল গোপাল। রাতের পথিক, ভোরের পথিক সকলে দেখ শ্রীবাসের কিসের ভজনা। আর তার সঙ্গীরা যে এত চেঁচামেচি লাফালাফি করে, তা কিসের প্রভাবে।

সকালে দরজা খুলে শ্রীবাসের চক্ষু স্থির।

লোকজন ডেকে আনল শ্রীবাস। দেখ কোন দুরাচার কী ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করেছে! আমরা নাকি মদ খাই। তন্ত্র-যন্ত্র করি।

সকলে হায়-হায় করে উঠল। বুঝতে কারু বাকি রইলনা কোন পাষণ্ডের এ দুষ্কাণ্ড! তিন দিনের দিন চাপাল গোপালের সর্বাঙ্গে কুষ্ঠ হল।

বাড়ির বাইরে চালা বেঁধে থাকতে লাগল গোপাল। নাকে কাপড় দিয়ে এক মুঠো ভাত দিয়ে পালিয়ে যায় স্ত্রী। সন্তানেরাও

কাছে ঘেঁসে না। লাঠির ভর দিয়ে অতি কষ্টে হেঁটে-হেঁটে গঙ্গাতীরে এসে গাছতলায় বসে থাকে চুপচাপ।

কে একজন বললে, 'নিমাইকে ধরো না। ইচ্ছে করলে সেই তোমাকে নির্ব্যাধি করে দিতে পারে।'

বলো কী! নিমাই পণ্ডিত তো গ্রামসম্পর্কে আমার ভাগনে। তার এত শক্তি।

গঙ্গায় স্নান করতে এসেছে নিমাই, তাকে গিয়ে ধরল চাপাল। বললে, 'তুমি নাকি মহাচিকিৎসক হয়েছ, কঠিন রোগ আরাম করতে পারো। সম্পর্কে আমি তো তোমার মামা হই, আমার এ কুষ্ঠ সারিয়ে দাও না।'

এখনো দম্ভ, এখনো মালিন্য! নিমাই রুষ্ট হয়ে বললে, 'তুমি ভক্তদ্বেষী, তোমার উদ্ধার নেই। যারা পাষণ্ড তারা তাদের দুষ্কর্মের ফল ভোগ করবেই।'

'পাষণ্ডী সংহারিতে মোর এই অবতার।
পাষণ্ডী সংহারি ভক্তি করিমু প্রচার॥'

নিমাই গঙ্গায় নামল, চাপালের দিকে ফিরেও তাকালনা। পাপীর প্রাণ যাবে না, শুধু দুঃখ ভোগ করে যাবে।

কাশীতে এসে হাজির হল চাপাল। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে পড়ল হত্যা দিয়ে।

বিশ্বেশ্বর স্বপ্ন দিল, নবদ্বীপে ভগবান গৌরাঙ্গরূপে উদয় হয়েছেন, সরল মনে তাঁর পায়ে আশ্রয় নাও, কালব্যাধি সেরে যাবে।

নবদ্বীপে ফিরে এল চাপাল। কিন্তু তখন কোথায গৌরহরি?

নীলাচল হতে বৃন্দাবন যাবার পথে জননী ও জাহ্নবীকে দেখতে ফিরেছেন প্রভু, নবদ্বীপের পরপারে কুলিয়া গ্রামে এসেছেন, সেখানে গিয়ে তাঁর পায়ে পড়ল চাপাল। আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ে বললে, 'আমাকে উদ্ধার করো প্রভু।'

প্রভু এবার করুণায় দ্রবীভূত হলেন। বললেন, 'তুমি শ্রীবাসের

কাছে যাও। তার কাছেই তুমি অপরাধী। সে যদি অনুগ্রহ করে তা হলেই তুমি রোগমুক্ত হবে।'

শ্রীবাসে শরণ নিল চাপাল।

শ্রীবাস প্রসন্ন হল। পাদোদক খেতে দিল চাপালকে। চাপাল সুস্থ হয়ে উঠল। শুধু দেহ-রোগ নয় ভক্তবিদ্বেষ রূপ যে ভবরোগ তার থেকেও উদ্ধার পেল।

জ্যৈষ্ঠ মাস। সন্ধ্যাকাল। দিগদিগন্ত ছাপিয়ে ঘনগম্ভীর মেঘ করে এসেছে।

আজ আর বুঝি কীর্তন জমল না।

শ্রীবাসের বাড়িতে জমায়েত হয়েছে ভক্তরা, সবাই বিমর্ষ হয়ে গেল। মুক্ত অঙ্গনে মুষলধারে বৃষ্টি পড়লে কীর্তন হবে কী করে?

সমবেত ভক্তদের মনোদুঃখ স্পর্শ করল নিমাইকে। এক জোড়া মন্দিরা হাতে নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল নিমাই। মমতামেদুর চোখে তাকাল মেঘের দিকে। মৃদু মৃদু বাজাতে লাগল মন্দিরা। নামকীর্তন করতে লাগল।

ধীরে ধীরে মেঘ চলে গেল দিগন্তরে।

শুধু মেঘ নয়, চলে গেল আলস্য আর জড়তা। চলে গেল অবিশ্বাস।

কীর্তন দেখবার জন্যে এক ব্রাহ্মণ শ্রীবাসের অঙ্গনের দিকে চলেছে, পৌঁছে দেখল দরজা বন্ধ। ভিতরে ঢুকতে পেলনা।

পরে গঙ্গার ঘাটে নিমাইয়ের সঙ্গে দেখা।

'তোমার দরজা বন্ধ দেখলাম। কীর্তন শুনতে পেলাম না।' ব্রাহ্মণ অভিযোগ করল।

পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চাইল নিমাই।

'শোনো।' বাধা দিল ব্রাহ্মণ: 'তোমার ব্যবহারে আমি সেদিন নিদারুণ দুঃখ পেয়েছি। আমি তা সহ্য করব না। তোমাকে শাপ দেব।'

'শাপ দেবে ?' নিমাই থমকে দাঁড়াল।

'হ্যাঁ, ব্রহ্মশাপ। এ শাপ ফলবেই।' তীব্র রাগে ব্রাহ্মণ তার পৈতে ছিঁড়ে ফেলল। বললে, 'এই শাপ দিচ্ছি, তোমার সংসারসুখের বিনাশ হোক।'

নিমাই আনন্দ করে উঠল। বললে, 'তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। আমার সংসারসুখের যদি অবসান হয় তা হলে তো আমার পরম সৌভাগ্য।'

'পরম সৌভাগ্য!'

'তা ছাড়া আর কী। সংসারসুখে আমি যদি না আর আকৃষ্ট হই তা হলে তো আমি সর্বক্ষণ তন্ময় হয়ে ভগবদভজন করতে পারব। বলতে পারব কৃষ্ণনাম।'

'আপনি যে ঐ কৃষ্ণ নাম করেন, সেও তো একরকম মায়া।' এক পড়ুয়া বললে একদিন নিমাইকে।

শোনামাত্র কানে হাত দিল নিমাই।

'কৃষ্ণনামের যে মহিমার কথা আপনি বলেন তা অতিরঞ্জিত প্রশংসা মাত্র।' আবার বললে সেই ছাত্র।

'নামে স্তুতিবাদ' শুনে নিমাই দুঃখিত হল। রুষ্ট হয়ে বললে সবাইকে, 'এর মুখদর্শন কোরো না। নামমাহাত্ম্যে যে অর্থবাদ কল্পনা করে সে ঘোরতর অপরাধী। নামাপরাধীর মুখদর্শনও অপরাধ।'

সচেলে, সবস্ত্রে গঙ্গাস্নান করতে গেল নিমাই। গঙ্গস্নানে পবিত্র হই চলো। কৃষ্ণ নেই, কৃষ্ণনামের স্বভাবমাহাত্ম্য নেই এ কথা শোনামাত্রই অপবিত্র হয়েছি আমরা। গঙ্গাই পাপদ্রাবিণী নিস্তারিণী।

চিত্তদ্রবতাই কৃষ্ণপ্রেমের মুখ্যলক্ষণ। হরিনামগ্রহণের ফলে নেত্রে অশ্রু ঝরছে, গাত্রে রোমাঞ্চ ফুটছে অথচ হৃদয় দ্রবীভূত হচ্ছেনা, সেই হৃদয় লৌহবৎ কঠিন। অনাসঙ্গ ভজনে প্রেমলাভ অসম্ভব।

'আমিও যাব গঙ্গাস্নানে।' সেই অবিশ্বাসী পড়ুয়া পিছু নিল নিমাইয়ের।

গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঘন-ঘন ডুব দিতে লাগল।

ধুয়ে গেল মনোমল। ধুয়ে গেল অবিশ্বাস।

৩৪

বুদ্ধিমন্ত খান আর সদাশিব কবিরাজকে ডাকাল নিমাই। বললে, 'আমি রমণীর বেশে নৃত্য করব। উপযুক্ত সাজসজ্জা তৈরি করো শিগগির।'

দু'জনেই মহা খুশি। জিগগেস করল, 'নাচ কোথায় হবে?'

'আচার্য চন্দ্রশেখরের বাড়ি।'

'কে কী সাজবে?'

'আমি লক্ষ্মী, বা রাধা, বা রুক্মিণী, নিত্যানন্দ আমার বড়াই, হরিদাস কোতোয়াল, শ্রীবাস নারদ, শ্রীরাম স্নাতক। গদাধরেরও লক্ষ্মীসাজ।'

'গদাধরের বড়াই কে?'

'ব্রহ্মানন্দ।' বললে নিমাই।

'পাত্র কে?'

'পাত্র স্বয়ং গোপীনাথ। সিংহাসনে গোপীনাথ।' নিমাই লক্ষ্য করল সকলকে: 'প্রকৃতি-স্বরূপে আমার নৃত্য হবে। যে জিতেন্দ্রিয় একমাত্র তারই অধিকার ও-নাচ দেখবার।'

অদ্বৈত মুখ ম্লান করল। বললে, 'তাহলে আমার যাওয়া হবে না। আমি জিতেন্দ্রিয়, এ বলতে আমার সাহস নেই।'

শ্রীবাস বললে, 'আমারও সেই কথা।'

নিমাই হাসল। বললে, 'তোমরা না গেলে আর নাচ কিসের। শোনো, কোনো ভয় নেই। তোমরা সবাই আজ মহাযোগেশ্বর হয়ে যাবে, আমকে দেখে কারু বিন্দুমাত্র মোহ হবে না।'

তা হলে আর কথা কী! সবাই চলল ফুল্ল মনে।

শচীমাতা নিয়ে চললেন বিষ্ণুপ্রিয়াকে। চন্দ্রশেখরের বাড়ি নিমাইয়ের মাসির বাড়ি—চন্দ্রশেখর তার মেসো। তবে আর বিষ্ণুপ্রিয়ার কুণ্ঠা কী! দেখি না কেমন লক্ষ্মী সাজেন তিনি, কেমন নাচেন লক্ষ্মী সেজে।

আপ্ত বৈষ্ণবদের পরিবারবর্গও চলল নাচ দেখতে।

চন্দ্রশেখরের মহাভাগ্য, তার ঘরে গৌরগোবিন্দের লীলামহিমা।

অদ্বৈত জিগগেস করল, 'আমার কোন সাজ?'

'যা তোমার ইচ্ছে। সর্বভাবের স্ফুরণ তোমাতে।' আশ্বস্ত করল নিমাই।

রামকৃষ্ণ নরহরি গোপাল গোবিন্দ—নামোচ্চারণ করে মুকুন্দ কীর্তনের শুভারম্ভ করল।

প্রথমে আবির্ভূত হল হরিদাস। পরিধানে ধটী, মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি, হাতে দণ্ড, সর্বাঙ্গে কৃষ্ণ-পুলক। সদম্ভ হুঙ্কার করছে ঘন-ঘন—কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণ সেব, বল কৃষ্ণনাম। চারদিকে ছুটোছুটি করছে।

সকলে হাসছে কাণ্ড দেখে। জিগগেস করছে, 'তুমি কে? তুমি এখানে কেন?'

'আমি বৈকুণ্ঠের কোটাল।' গোঁফে তা দিল হরিদাস: 'আমি শুধু কৃষ্ণ বলে হাঁক দিই, নিদ্রিত ভুবনকে জাগাই ঘুম থেকে।'

মুরারি গুপ্ত পাশে এসে দাঁড়াল। সে কোটালের পার্শ্বচর! তারও শরীরে গৌরহরির বিলাস-বিকাশ।

ও হরি, এ কে নামল? এ শ্রীবাস না?

কে বলবে? এ যে দেখি নারদ মুনি। কাঁধে বীণা, হাতে কুশ আর কমণ্ডলু, প্রকাণ্ড দাড়ি, সারা গায় তিলকচিহ্ন।

'তুমি এসেছ কেন ?' জিগগেস করল অদ্বৈত।

'আমি কৃষ্ণের গায়েন। আমি কৃষ্ণনাম করে বিপুল ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করি।' নারদবেশে বলছে শ্রীবাস, 'বৈকুণ্ঠে গিয়ে দেখলাম কৃষ্ণ সেখানে নেই, বৈকুণ্ঠের ঘর-দুয়ার শূন্য।'

'শূন্য ?'

'হ্যাঁ, গৃহিণী-গৃহস্থ কেউ সেখানে নেই। সারা বৈকুণ্ঠ খাঁ-খাঁ করছে।'

'কৃষ্ণ তবে গেল কোথায় ?'

'কৃষ্ণ গেল নদীয়া-নগরে। শুনলাম কৃষ্ণ নদীয়ায় গিয়েছেন।' বললে শ্রীবাস, 'তাই আমি চলে এসেছি এখানে।'

শ্রীবাসের নারদমূর্ত্তি দেখে বিহ্বল হল শচীমাতা। সকলে তার কর্ণমূলে কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলতে লাগল।

গৃহান্তরে নিমাই রুক্মিণী বেশ ধরেছে। রুক্মিণীর মত আধোমুখে জল দিয়ে মাটিতে পত্র লিখছে কৃষ্ণকে। আর ভাসছে চোখের জলে।

ভাগবতে যে সাত শ্লোকে রুক্মিণীর পত্র বর্ণনা আছে তাই নিমাই কাঁদতে-কাঁদতে পড়ছে।

'গীতবন্ধে শুন সাত-শ্লোকের ব্যাখ্যান।
যে কথা শুনিলে স্বামী হয় ভগবান॥'

হে ভুবনসুন্দর, তোমার গুণগ্রামের কথা শুনলে অঙ্গতাপ শীতল হয়। যাদের চোখ আছে তারা যদি একবার তোমাকে দেখতে পায় পলকে তাদের নিখিলার্থ লাভ হয়। তোমাকে দেখে ও শুনে আমার চিত্ত লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়ে তোমাতে আসক্ত হয়েছে। 'নির্লজ্জ হইয়া চিত্ত যায় তুয়া-ঠাম।' কূলে-শীলে-রূপে-বিদ্যায় ধনে-ধামে বয়ঃক্রমে তুমিই তোমার সমতুল। বিবাহযোগ্যা এমন কোন ধীমতী কামিনী আছে যে তোমাকে পতিত্বে বরণ করতে না অভিলাষী হবে ? আমার ঔদ্ধত্য ক্ষমা করো, আমার চিত্ত তোমাতে বিলীন

হতে চায়, আমাকে পত্নীপদ দিয়ে ধন্য করো। শৃগাল যেন সিংহের বলি না অপহরণ করে। বীরের ভাগ যেন শিশুপাল না ছোঁয়। যদি ব্রতদান ইষ্ট পূর্ত করে থাকি, যদি গুরু-বিপ্র-দেবতার অর্চনায় ত্রুটি না ঘটে থাকে, তাহলে গদাগ্রজ আমার প্রাণেশ্বর হোন। কাল আমার বিবাহের দিন স্থির হয়েছে, তুমি আজই গুপ্তভাবে চলে এস, বিলম্ব কোরো না। পরে সসৈন্যে যুদ্ধ করে চৈদ্য শাল্ব জরাসন্ধকে মন্থন করে বীর্যশুল্কে আমাকে বিবাহ করবে। বাহুবলে হরণ করে নেবে আমাকে। যদি বলো, তুমি অন্তঃপুরে থাকো, তোমার আত্মীয়বন্ধুদের নিধন না করে কী করে তোমাকে উদ্ধার করব, তাহলে বলি, বিবাহের পূর্বদিনে কুলধর্ম অনুসারে নববধূকে পুরের বাইরে অম্বিকার মন্দিরে যেতে হয়—সেই সময় তুমি আমাকে হরণ করবে। যার চরণরেণুর জন্যে স্বয়ং উমাপতি উন্মুখ, তার প্রসাদ যদি আমি না পাই, তাহলে আমি ব্রত দ্বারা কৃশ হয়ে প্রাণত্যাগ করব। হে কমললোচন, যত জন্ম তোমার চরণকমল না পাই তত জন্ম আমি মরব।

রুক্মিণী-আবেশে নিমাইয়ের কাতরতা শুনে সকলে কাঁদতে লাগল।

রমা-বেশে এবার প্রবেশ করল গদাধর। নাচতে লাগল। চারদিকে কৃষ্ণপ্রেমের ক্রন্দন।

এবার নিমাই আদ্যাশক্তির বেশ ধরে আবির্ভূত হল। সঙ্গে বুড়ি-বড়াইয়ের বেশে নিত্যানন্দ। 'বঙ্ক বঙ্ক করি হাঁটে প্রেমরসে ভাসে।'

বিশ্বম্ভরকে কেউ চিনতে পাচ্ছে না। তবে যেহেতু সে নিত্যানন্দের পিছনে, বুঝল সবাই অনুমানে।

কিন্তু কী যে ওর আসল রূপ তা কে বোঝে? কেউ ভাবল সমুদ্রোত্থিতা কমলা, কেউ বা ভাবল রঘুসিংহগৃহিণী জানকী। কেউ দেখল পার্বতী, কেউ বা বৃন্দাবনের মূর্তিময়ী সম্পত্তি। কেউ মনে করল মহেশমোহিনী মহামায়া।

স্বয়ং শচীমাতাও চিনে উঠতে পারছে না।

জগৎজননীর ভাব নিয়েছে বিশ্বম্ভর। আবার মহাযোগেশ্বরী গোকুলসুন্দরীর ভাব। গোকুলসুন্দরীই জগৎজননী।

নিত্যানন্দের হাত ধরে নাচতে লাগল গৌরসিংহ। হঠাৎ গোপীনাথকে কোলে নিয়ে খট্টার উপর উঠে বসল। বললে, 'আমার স্তব করো।'

সকলের মধ্যে জননীর আবেশ এল। কেউ লক্ষ্মীস্তব পড়তে লাগল, কেউ বা চণ্ডীস্তুতি।

'জয় জয় জগত-জননি মহামায়া।
দুঃখিত জীবেরে দেহ চরণের ছায়া॥
জগৎস্বরূপা তুমি, তুমি সর্বশক্তি।
তুমি শ্রদ্ধা, দয়া, লজ্জা, তুমি বিষ্ণুভক্তি॥
সর্বাশ্রয়া, তুমি সর্বজীবের বসতি।
তুমি আদ্যা অবিকারা পরমা প্রকৃতি॥
জগত আধার তুমি দ্বিতীয়রহিতা।
মহীরূপে তুমি সর্বজীব পালয়িতা॥
তোমার মায়ায় মগ্ন সকল সংসার।
তুমি না রাখিলে মাতা কে রাখিবে আর॥
সভে লইলাঙ মাতা! তোমার শরণ।
শুভদৃষ্টি কর তোর পদে রহু মন॥'

চন্দ্রশেখরভবন আনন্দে মুখর হয়ে উঠল। কেটে গেল বিভাবরী।

দারুণ অরুণ কখন দেখা দিল কেউ খেয়াল করে নি। চমকিত হয়ে সকলে তাকাতে লাগল চারদিকে। এ কি, রাত ভোর হয়ে গিয়েছে যে। থেমে গিয়েছে নাটনৃত্য।

ভক্তরা কাঁদতে লাগল। কাঁদতে লাগল নারায়ণীশক্তি জগজ্জননী বৈষ্ণবগৃহিণীরা। 'সবে বলে, আরে রাত্রি, কেনে পোহাইলা? হেন রসে কেনে কৃষ্ণ, বঞ্চিত করিলা॥' চারদিকে বিষ্ণুভক্তির ক্রন্দন পড়ে গেল।

তখন শচীনন্দন কী করল? সকলের মধ্যে পুত্রভাব এনে দিল। নিজে বসল জগন্মাতা হয়ে। সকলেরে স্তন্যদান করতে লাগল।

'মাতৃভাবে বিশ্বম্ভর সভারে ধরিয়া।
স্তনপান করায় পরম স্নিগ্ধ হৈয়া॥'

ভগবদ্গীতা সত্য হয়ে উঠল। 'পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।' আমি এই জগতের পিতা মাতা কর্মফলবিধাতা এবং পিতামহ।

'ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব।
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব॥
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব।
ত্বমেব সর্ব মম দেব-দেব॥'

তুমিই সঙ্কীর্তনের প্রবর্তক, তুমিই সঙ্কীর্তনের পিতা। সর্বযজ্ঞ থেকে কৃষ্ণনাম যজ্ঞই শ্রেষ্ঠ। সঙ্কীর্তনই অচ্ছিদ্র-মন্ত্র।

'আনন্দে বৈষ্ণব সব করে স্তনপান।
কোটি কোটি জন্ম যারা মহা ভাগ্যবান॥
স্তনপানে সভার বিরহ গেল দূর।
প্রেমরসে সভে মত্ত হইলা প্রচুর॥
এ সব লীলার কথা অবধি না হয়।
আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র বেদে কয়॥'

নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে যত স্থূল-সূক্ষ্ম আছে সবই চৈতন্যের রূপ। তার ইচ্ছাতেই সজ্জিত, তার ইচ্ছাতেই বর্জিত। তার ইচ্ছাতেই বেশবাস, তার ইচ্ছাতেই অনাবরণ।

'ইচ্ছায় কাচয়ে কাচ ইচ্ছায় ঘুচায়।
ইচ্ছায় করয়ে সৃষ্টি ইচ্ছায় মিলায়॥
ইচ্ছাময় মহেশ্বর—ইচ্ছা কাচ কাচে।
তান ইচ্ছা নাহি করে হেন কোন আছে॥'

লীলাশেষে যে যার বাড়ি চলে গেল কিন্তু চন্দ্রশেখরের ঘর সাত

দিন আলোকিত হয়ে রইল। যে অদ্ভুত শক্তি নিমাই প্রকাশ করল, জননীভাবে স্তনভক্তি বিতরণ, সেই শক্তি পরমজ্যোতির্ময় আকারে জ্বলতে লাগল। চন্দ্র সূর্য বিদ্যুৎ যেন একত্র জ্বলছে। যে কেউ আসছে সে ঘরে অভিভূত হয়ে যায়, চোখ ফেলতে পারে না। আচার্যের ঘরে এত আলো কেন জিগগেস করে পরস্পরকে। 'তুই চক্ষু মেলিতে—ফুটিয়া যেন পড়ে।'

কে জানে কেন? ভক্তের দল মনে মনে হাসে, কিছু প্রকাশ করে না।

সাত দিন এই জ্যোতি অচ্ছেদে জাগ্রত হয়ে রইল।

কীর্তনক্লান্ত নিমাই একদিন শ্রীবাস-অঙ্গনে বসেছে ভক্তদের নিয়ে। কী খেয়াল হল একটি আমের বীজ রোপণ করল মাটিতে। সঙ্গে-সঙ্গে বীজ অঙ্কুরিত হল, দেখতে-দেখতে গাছ হয়ে দাঁড়াল। শুধু তাই নয়, গাছ মুকুলিত হল, ফল ধরল, একটি দুটি নয়, অনেক অনেক ফল, আর নিমেষে সে ফল পরিণত হল, পরিপক্ক হল। ভক্তদের বিস্ময় আর ধরে না।

তক্ষুনি-তক্ষুনি দু'শো ফল পাড়ল নিমাই। কোনোটা লাল, কোনোটা হলদে। সে আমে আঁটিও নেই, বাকলও নেই, আঁশও নেই। কেবল অমৃতরসময়। একটা খেলেই পেট ভরে যায়।

প্রক্ষালন করে সে আমে প্রথমে কৃষ্ণভোগ হল। তার পরে গৌরহরি খেল, সর্বশেষে খাওয়াল ভক্তদের। বারো মাস, সমস্ত বছর ধরেই প্রতিদিন ফল ধরছে সে গাছে। প্রতিদিনই কীর্তনান্তে ভোগ হত যথারীতি। ভক্ত ছাড়া এ লীলার কথা কেউ জানতও না, দেখতও না।

শ্রীবাস-অঙ্গন শ্রীধাম নবদ্বীপের মধ্যে এক চিন্ময় স্থান। আমও অপ্রাকৃত আম। শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবে ভক্তদের সমস্ত ইন্দ্রিয় শুদ্ধসত্ত্বময় হয়ে ওঠে, তখন তারা শুদ্ধসত্ত্বময় ভগবদ্ধামের সব লীলা দেখতে পায়। অন্য লোক প্রাকৃত চক্ষু দিয়ে তার তত্ত্বলেশ দেখতে পায় না।

শ্রীবাস অঙ্গনে সে আম গাছ নিত্যবিরাজিত। এ পর্যন্ত তা অপ্রকট ছিল মাত্র। প্রভুর ইচ্ছায় তা এতক্ষণে প্রকটিত হল।

'আপনা লুকাইতে প্রভু নানা যত্ন করে। তথাপি তাঁহার ভক্ত জানয়ে তাঁহারে।' ভক্তের কাছে ভগবান কিছুতেই পারেন না আত্মগোপন করতে। ভক্তের কাছে ভগবান সব কিছু করতে সমর্থ কিন্তু সাধ্য নেই ভক্তের কাছে তিনি গোপন থাকেন। ভক্তির কৃপায় ভক্তের এমনই শক্তি, এমনই প্রভাব।

হে ভগবান, যা দেশ-কাল ও পরিমাণ এই তিন সীমার অতীত, যার সমানও কেউ নেই যার চেয়ে অধিকও কেউ নেই, মায়াবলে যাকে তুমি সর্বদা গোপন করতে সচেষ্ট, তোমার সেই প্রভুত্বের স্বরূপকে তোমার কোনো কোনো একান্ত ভক্ত নিরন্তর দেখতে পায়। ভক্তির এমনই অচিন্ত্য শক্তি যে সমস্ত আবরণ সরিয়ে দেখে ফেলে নিগূঢ়কে। 'ভক্তের ইচ্ছায় কৃষ্ণের সর্ব-অবতার।'

ভক্তিযোগপরিভাবিত হৃদয়সরোজে তোমার বাস। ভক্তরা যে যে রূপের চিন্তা করে তাদের কাছে তুমি সে-সে শরীরে প্রকটিত হও। তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর হয়েও ভক্তের বশ্যতা স্বীকার করো। ভক্তের অভীষ্ট রূপেই তোমার প্রকাশ। আমাদের ইচ্ছাতেই তোমার প্রেমাবতার গৌরাঙ্গরূপ।

'অদ্যাপি চৈতন্য এ সব লীলা করে।
যার ভাগ্যে থাকে সে দেখয়ে নিরন্তরে॥'

একদিন এক শিবের গায়ন এসে উপস্থিত। ডমরু বাজিয়ে শিবের গান গাইতে লাগল, নাচতে লাগল অঙ্গনে। নিমাইয়ের মহেশ-আবেশ হল। হুঙ্কার করে লাফিয়ে উঠল—আমিই শঙ্কর! বলে সেই গায়কের কাঁধে চড়ে বসল। গায়ক নাচতে লাগল গৌরকে কাঁধে নিয়ে। ভক্তদের কেউ দেখল জটা, কেউ দেখল বাঘছাল।

আরেক দিন এক ভিক্ষুক এল দুয়ারে। গৌরের নাচ দেখে,

বলা নেই কওয়া নেই, সে-ও নাচতে সুরু করল। নৃত্যে বিভোর হয়ে গেল।

গৌরহরি প্রেম দিল ভিক্ষুককে। ভাগ্যবান ভিক্ষুক কৃষ্ণপ্রেমরসে গা ভাসাল, ঢেলে দিল মন-প্রাণ।

'পাত্রাপাত্র বিচার নাহি, নাহি স্থানাস্থান।
যেই যাহাঁ পায় তাহা করে প্রেমদান॥
লুটিয়া খাইয়া দিয়া ভাণ্ডার উজাড়ে।
আশ্চর্য ভাণ্ডার—প্রেম শতগুণে বাড়ে॥'

গৌরের প্রেম-মহাজাল কেউ এড়াতে পারল না। পড়ুয়া, পণ্ডিত, কর্মী, নিন্দক—সকলে বশীভূত হল। অপরাধীরও ক্ষমা মিলে গেল। সজ্জন দুর্জন পঙ্গু জড় অন্ধ ভিক্ষুক সকলেই ডুবল প্রেমবন্যায়। মন্দির বা গঙ্গাতীর বা অন্য কোনো পবিত্র প্রশস্ত স্থানের অপেক্ষা না করে যত্র-তত্র হাটে-মাঠে-ঘাটে প্রেমদান করেছে। যোগ্যতা-অযোগ্যতার বিচার নেই, যে গৌরকে দেখেছে, তার মুখে শুনেছে হরিনাম, সেই মজেছে, মেতে উঠেছে—সেই নেচেছে কেঁদেছে হেসেছে গেয়েছে। যত পান তত পিপাসা! যত আর্ত তত মত্ত।

আরেক দিন এক জ্যোতিষসর্বজ্ঞ এসে হাজির।

তাকে সম্মান করে বসাল প্রাণগৌর। বললে, 'আমি পূর্বজন্মে কী ছিলাম গুনে বলো দেখি।'

জ্যোতিষী গুনতে লাগল। ধ্যানে দেখল মহাজ্যোতির্ময় পুরুষ। অনন্ত বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়। পরতত্ত্ব পরব্রহ্ম—স্বয়ং ভগবান।

বিমূঢ় হল জ্যোতিষী। মুখ দিয়ে কথা সরল না।

নিমাই আবার প্রশ্ন করল: 'কী হল? গণনার ফলাফল বলো।'

'পূর্বজন্মে তুমি জগৎ আশ্রয় সর্বৈশ্বর্যময় পরিপূর্ণ ভগবান ছিলে। এ জন্মেও তাই।' বললে সর্বজ্ঞ, 'আর দুর্বিজ্ঞেয় নিত্যানন্দ তোমারই এক স্বরূপ।'

'আমার সম্বন্ধে তুমি কিছুই জানো না।' বললে গৌরহরি,

'পূর্বজন্মে আমি জাতিতে গোয়ালা ছিলাম। গোপগৃহে আমার জন্ম হয়েছিল, মাঠে গোঠে গরু চরাতাম। সেই পুণ্যে এই জন্মে ব্রাহ্মণের ঘরে এসেছি।'

'তাই তো দেখলাম।' বললে জ্যোতিষী, 'দেখলাম তুমিই সেই গোপবেশ বেণুকর শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু তোমার সেই রাখালবেশেও ঐশ্বর্যের শেষ নেই। তুমি গোয়ালা হও বা ব্রাহ্মণ হও, যেই হও, আমার নমস্কার নাও।'

গৌরহরি প্রেম দিল সর্বজ্ঞকে।

একদিন নৃত্য অবসানে বসে আছে নিমাই, এক ব্রাহ্মণী এসে পায়ে লুটিয়ে পড়ল। পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে লাগল বারে বারে।

প্রচণ্ড দুঃখ হল গৌরহরির। পরস্ত্রীর স্পর্শ ঘটেছে এই তার দুঃখ। ছুটে গিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। গৌরে আবার মালিন্য কী, শুধু লোকশিক্ষার জন্যে, লোকদের সতর্ক করার জন্যেই এই আচরণ।

হরিদাস আর নিত্যানন্দ নিমাইকে তুলল জল থেকে।

সেদিন গোপীভাবে আবিষ্ট হয়ে গোপী-গোপী জপ করছে নিমাই, এক পড়ুয়া তাকে দেখতে এল। প্রশ্ন করল, 'গোপী-গোপী বলছ কেন?'

বিষণ্ণ চোখ তুলে তাকাল নিমাই।

'কৃষ্ণনাম নিচ্ছ না কেন?' পড়ুয়া বললে অভিযোগের সুরে, 'সংসারে কৃষ্ণনামই তো ধন্য। গোপী-গোপী বললে কী পুণ্য হবে?'

কৃষ্ণনাম? খেপে উঠল নিমাই। কৃষ্ণে দোষোদ্গার করতে লাগল। কম কষ্ট দিয়েছে আমাকে, গোপীকে? কুলধর্মে জলাঞ্জলি দিয়ে তাকে ভালোবাসলাম, কামগন্ধহীন ভালোবাসা, আর সে নিষ্ঠুর মথুরায় গিয়ে রাজা হয়ে বসল! সেই নির্দয়ের নাম নিতে বলছ? সেই দস্যুর? সেই কৃতঘ্নের?

একটা ঠ্যাঙা নিয়ে পড়ুয়াকে মারতে ছুটল নিমাই। পড়ুয়া প্রাণ নিয়ে পালাল।

ভক্তের দল নিবৃত্ত করল নিমাইকে।

একলা নিমাই সমস্ত দেশ ভ্রষ্ট করল। ব্রাহ্মণ মারতে ছুটেছে! আমাদের শরীরে কি তেজ নেই? এস, আমারও দল পাকাই। এই অত্যাচারের সমুচিত শাস্তি দিই। সেদিনের পণ্ডিত আজকে একেবারে গোঁসাই হয়ে বসেছে!

যারা ভাবমর্ম বোঝে না তারা নিন্দার ঝড় তুলল।

৩৫

বাড়ি ফিরে গিয়ে অদ্বৈত উলটো সুর ধরল। বিশ্বম্ভর যাই বলুক, জ্ঞানচর্চা ত্যাগ করা যায় না। জ্ঞানই সর্বশক্তি। ঘরে ধন হারিয়ে বনে গিয়ে খোঁজার কোনো মানে নেই। জ্ঞানহারা নৃত্যগীত আবার কী ধর্ম! ভক্তি যদি দর্পণ হয়, জ্ঞান হচ্ছে চক্ষু। যদি চক্ষুই না থাকে দর্পণে কোন ফল?

যোগবাশিষ্ঠ ব্যাখ্যা করতে বসল অদ্বৈত। আদ্যোপান্ত শাস্ত্র পাঠ করে বুঝলাম জ্ঞানই মূলকথা।

বাইরে এই আড়ম্বরের অর্থ কী! তা শুধু অদ্বৈতই জানে।

বিশ্বম্ভরকে ক্রুদ্ধ করতে হবে। শাস্তি নিতে হবে তার থেকে। যখন দেখবে, আমি আর ভক্তি মানছি না প্রভু আমাকে চুলে ধরে শাসন করবেন।

কেন, দণ্ডের কী প্রয়োজন?

অদ্বৈত কাঁদতে বসল। ও আমার চরণের ধূলি নেয় কেন? ও মহাবলী, গায়ের জোরে পারি না ওর সঙ্গে। ও জোর করে আমার পা চেপে ধরে। কোথায় ও আমার উপর প্রভুত্ব করবে, তা না, ও আমার সেবা করবে। এ কী বিড়ম্বনা! তাই আমি ওকে ক্রুদ্ধ

করব স্থির করেছি। ওর হাত থেকে দণ্ড নেব। প্রভুর দণ্ড পেলে আমার দেহ পবিত্র হবে।

'চলো শান্তিপুর যাই।' নিমাই বললে নিতাইকে।

'চলো।'

পথে যেতে যেতে ললিতপুর গ্রামের কাছে থামল দুজনে।

একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। নিমাই জিগগেস করলে, 'এটা কার বাড়ি?

'এক সন্ন্যাসীর।' বলল নিতাই।

'চলো সন্ন্যাসী দর্শন করি।'

নিমাই বাড়িতে ঢুকে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করল। সন্ন্যাসী দেখল এক রূপবান ব্রাহ্মণযুবক সামনে দাঁড়িয়ে। সন্ন্যাসী খুশি হয়ে আশীর্বাদ করল। বললে, 'ধন হোক, বিদ্যা হোক, বিবাহ হোক, বংশ হোক—'

নিমাই বললে, 'গোঁসাই, এ সব আশীর্বাদ নয়।'

'নয়? তবে কী আশীর্বাদ?' সন্ন্যাসী অবাক মানল।

'বলুন, তোমার কৃষ্ণের প্রসাদ হোক।'

'খুব বলেছ!' বিদ্রূপ করে উঠল সন্ন্যাসী: 'বিষ্ণুভক্তি যে চাও ধন বিনে খাবে কী!'

'যদি কর্মফলে থাকে খাওয়া আপনি মিলবে।' নিমাই বললে, 'নচেৎ নয়। নইলে লোকে সংসারে ধন-পুত্র কামনা করে, আবার ধন-পুত্রই তিরোহিত হয়। আর, কেউ তো রোগজ্বর কামনা করে না তবু তা কেন উপস্থিত হয় শরীরে? যা হাতে পেলেও চলে যায়, না চাইলেও এসে দুঃখ দেয়, সে সব পার্থিবে আমার লোভ নেই। আপনি শুধু বলুন, আমার কৃষ্ণে মতি হোক। কৃষ্ণভক্তি ছাড়া কিছু নেই বর চাইবার।'

সন্ন্যাসী খেপে গেল। আমি কাশী-গয়া অযোধ্যা-মথুরা করলাম, আর এক দুধের শিশু কিনা আমাকে ধর্ম শেখায়!

নিতাই বললে, 'না, না, আপনার সঙ্গে এই শিশুর তুলনা কী! আপনি এই অবোধকে মার্জনা করুন।'

শ্লাঘা শুনে সন্ন্যাসী তুষ্ট হল।

নিতাই বললে, 'বিশেষ কাজে চলেছি পদব্রজে। যদি কিছু খাবার দেন, স্নান করে পথে খেয়ে নেব দুজনে।'

'বেশ তো, এইখানেই স্নান করো। ভোজন করো। স্নিগ্ধ-তৃপ্ত হও।'

গঙ্গায় স্নান করে দুই বন্ধু ফলাহারে বসল। দুধের সঙ্গে আম-কাঁটাল মেখে খেল ভরপেট।

'তোমাদের মত এমন অতিথি কোথায় পাব?' নিতাইকে লক্ষ্য করল সন্ন্যাসী: 'বলো কিছু আনন্দ আনব?'

'কেন ওদের বিরক্ত করছ?' সন্ন্যাসীর স্ত্রী অন্তঃপুর থেকে বাধা দিল: 'ওদেরকে খেতে দাও।'

নিমাই নিতাইকে চুপি চুপি জিগগেস করল, 'আনন্দ কী?'

'মদ।'

'বিষ্ণু, বিষ্ণু।' নিমাই আচমন করল।

'মনে হচ্ছে সন্ন্যাসী বামাচারী। যাকে বলে গৃহস্থ সন্ন্যাসী।'

নিমাই ছুট দিল। গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। দ্রুতপায়ে অনুসরণ করল নিতাই। গঙ্গায় ভাসতে ভাসতে চলো যাই শান্তিপুর।

নিমাই বললে, 'নাড়া আবার জীবকে জ্ঞান শিক্ষা দিচ্ছে। ওই আমাকে শয়ন থেকে তুলে আনল আর ওই কিনা এখন ভক্তি লুকিয়ে রেখে জ্ঞানের সুখ্যাতি করছে। দাঁড়াও, ওকে আজ চরম জ্ঞানশিক্ষা দেব।'

নিমাই তর্জন-গর্জন করে আর মনে মনে হাসে নিত্যানন্দ।

সিক্তবস্ত্রে দুজনে অদ্বৈতের ঘরে এসে উপস্থিত হল। আরে এ যে বিশ্বম্ভর। মহত্তেজে দিগ্বিদিক আলো হয়ে উঠেছে। সকলে ভয় পেল। হরিদাস ছুটে এসে চরণে পড়ল। অদ্বৈতের ছেলে অচ্যুতও

প্রণত হল। অদ্বৈতের গৃহিণী ভীতত্রস্তমুখে দাঁড়িয়ে রইল একপাশে। কিন্তু অদ্বৈতের চাঞ্চল্য নেই। সে ছাত্রদের নিয়ে যেমন-কে-তেমন জ্ঞানচর্চা করতে লাগল।

'হ্যাঁ রে নাড়া', গর্জে উঠল নিতাই, 'জ্ঞান আর ভক্তির মধ্যে বড় কে?'

'কে না জানে?' নির্লিপ্তমুখে বললে অদ্বৈত, 'জ্ঞান বড়। বিনাজ্ঞানে ভক্তিতে কী হবে?' 'অদ্বৈত বোলয়ে, সর্বকাল বড় জ্ঞান। যার জ্ঞান নাহি তার ভক্তিতে কী কাম॥'

'কী বললে? জ্ঞান বড়?' নিমাই অদ্বৈতকে সবলে ধরে, তুলে, উঠোনে ছুঁড়ে ফেলল। তারপর দুহাতে প্রহার করতে সুরু করল।

অদ্বৈতগৃহিণী সীতাদেবী আর্তনাদ করে উঠল: 'মেরো না, বুড়োকে মেরো না। কী দোষ করল বুড়ো?'

'কী দোষ করল? ক্ষীরসাগরে শুয়েছিলাম, আমার ঘুম ভাঙাল। ঘুম ভাঙিয়ে নিয়ে এল পৃথিবীতে! ভক্তির মহাপ্রকাশ ঘটল।' নিমাই বলতে লাগল, 'এখন কিনা ভক্তির বদলে জ্ঞানের জয়গান তুলেছে।'

যত মার খাচ্ছে ততই যেন আরাম পাচ্ছে অদ্বৈত। বলছে, 'দেখ আমার প্রভুর দয়া দেখ। আমি তাঁকে ছেড়ে এলাম কিন্তু তিনি আমাকে ছাড়লেন না। প্রহারের ফুলহার পরালেন। শাস্তি দিয়ে কৃপা করলেন।' হাততালি দিয়ে নাচতে লাগল অদ্বৈত: 'কী আনন্দ! অপরাধের শাস্তি তো নয় শান্তি!' বলে প্রভুর চরণে পড়ল অদ্বৈত। দু পা মাথার উপরে তুলে ধরল।

'মোর নাম অদ্বৈত, তোমার শুদ্ধ দাস।
জন্মে-জন্মে তোমার উচ্ছিষ্ট মোর গ্রাস॥
উচ্ছিষ্ট প্রভাবে নাহি গণোঁ তোর মায়া।
করিলা ত শাস্তি, এবে দেহ পদছায়া॥'

অদ্বৈতকে কোলে নিয়ে কাঁদতে লাগল বিশ্বম্ভর। কাঁদতে লাগল

নিত্যানন্দ। কাঁদতে লাগল অচ্যুত হরিদাস সীতাদেবী। অদ্বৈত-ভবন কৃষ্ণপ্রেমময় হয়ে উঠল।

সীতাদেবীকে লক্ষ্য করে নিমাই বললে, 'মা, কৃষ্ণের নৈবেদ্য করো। ভোজন করব।'

চারজনে স্নান করে এল। অদ্বৈত বিশ্বম্ভরের পায়ে পড়ল, হরিদাস অদ্বৈতের। নিত্যানন্দ হাসতে লাগল। দেখল যেন এক 'ধর্মসেতু' তৈরি হয়েছে, বিশ্বম্ভর পড়েছে রাধাকৃষ্ণের পায়ে।

তিন জন একঠাঁই খেতে বসল, নিমাই নিতাই আর অদ্বৈত, আর কিছু দূরে হরিদাস। সীতাদেবী পরিবেশন করতে লাগল। খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, বাল্যাবেশ উপস্থিত হল নিতাইয়ের। সমস্ত ঘরে ভাত ছিটোতে লাগল। নিমাই হায়-হায় করে উঠল কিন্তু আগুনের মত জ্বলে উঠল অদ্বৈত। 'এই নিত্যানন্দ জাতিনাশ করল।' তেড়ে গেল নিতাইয়ের দিকে: 'কোত্থেকে এক মদ্যপ সন্ন্যাসীর সঙ্গ করে এসে এখানে অনাসৃষ্টি সুরু করেছে। হরিদাস, এস, ধরো অনাচারীকে।'

কিন্তু নিত্যানন্দকে ধরে কে। দু হাতের দু বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বেরিয়ে এল অঙ্গনে। শিশুদের লীলা দেখে হাসছে গৌররায়।

কিন্তু, না, অদ্বৈত ধরেছে নিতাইকে। মারামারি কোথায়, প্রভুবিগ্রহের দুই বাহু কোলাকুলি করছে পরস্পর।

'প্রভুবিগ্রহের দুই বাহু দুইজন।
প্রীত বই অপ্রীত নাহিক কোনক্ষণ ॥
তবে যে কলহ দেখ সে কৃষ্ণের লীলা।
বালকের প্রায় বিষ্ণু-বৈষ্ণবের খেলা ॥'

কৃষ্ণ ছাড়া আর কার সাধ্য প্রেম দান করে! কৃষ্ণ শুধু মানুষকেই প্রেম দেন না, পশু-পাখী কীট-পতঙ্গ বৃক্ষ-লতাকেও প্রেম দেন। 'আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে।' কৃষ্ণের মহিষীরা নয়, মহাভাববতী ব্রজাঙ্গনারাই এই প্রেমের আশ্রয়। মহিষীরা সমঞ্জসা-

রতিমতী। সকলে একসঙ্গে কৃষ্ণকে অনঙ্গবাণে বিদ্ধ করবার চেষ্টা করেও তাঁর চিত্তে দাগ কাটতে পারল না। আর ব্রজপ্রেয়সীরা? 'প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন। বেদস্তুতি হৈতে সেই হরে মোর মন॥' ব্রজাঙ্গনাদের তিরস্কারও বরামৃতস্বরূপশ্রী। আকার তিরস্কারের, বস্তু মাধুর্যময়তার।

শান্তিপুরের ওপারে অম্বিকা কালনা। সেখানে গৌরীদাস পণ্ডিতের বাড়ি। গৌরীদাস শিশুকাল থেকেই বিষয়ে অনাসক্ত। নির্জনে সাধন-ভজনে উৎসুক বলে পৈত্রিক বাস শালিগ্রাম ছেড়ে গঙ্গাতীরে কালনায় এসে রয়েছে।

একদিন হঠাৎ তার সামনে দুটি নবীন ব্রাহ্মণকুমার এসে উপস্থিত। একজনের কাঁধে একখানি নৌকোর বৈঠা।

রূপে চারদিক আলো-করা—এরা কারা?

'আপনারা কোত্থেকে আসছেন?' জিগগেস করল গৌরীদাস।

'শান্তিপুর থেকে আসছি। হরিনদী গ্রামে নৌকো চড়ে চলে এসেছি সোজা।'

'আমার কাছে কেন?'

'তোমাকে এই বৈঠাখানা দিয়ে যেতে এসেছি। এই বৈঠা দিয়েই নৌকো বেয়ে এলাম এপারে।'

'এই বৈঠা দিয়ে আমি কী করব?' গৌরীদাস তাকাল আনমনা হয়ে।

'কী করবে মানে? জীবকে ভবনদী পার করাবে।'

'কে আপনারা?' আকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করল গৌরীদাস।

'আমি নদীয়ার নিমাই পণ্ডিত। আর এ বন্ধু নিত্যানন্দ।'

'তুমি? তুমিই তবে এই ভবনদীর কাণ্ডারী?' গৌরীদাস নিমাইয়ের চরণে পড়তে গেল। নিমাই তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল, আর কে জানে, সেই সুযোগে তার হৃদয়ে প্রবেশ করল।

'আর আমার নিজের হাতে লেখা এই গীতাখানা তোমাকে দিচ্ছি—'

'প্রভু, নৌকো বাইবার শক্তি কোথায়?' দৈন্যে কোমল হয়ে গেল গৌরীদাস : 'আর আমি ভগবদ্‌গীতারই বা কী বুঝি?'

গৌরহরি হাসল। আমার বুকভরা স্পর্শ যখন পেয়েছ তখন আর তোমার কিসের অসামর্থ্য?

নিমাই নিতাইকে নিয়ে আবার ফিরল শান্তিপুর। অদ্বৈতের জ্ঞানচর্চার ইতি হয়ে গেল। হরিকীর্তনে বিহার করতে লাগল সদলে।

ভাগবতী প্রীতি কোনো বিধির কোনো বুদ্ধির অপেক্ষা রাখে না। সে স্বতঃস্ফুর্ত, নিজের রসেই উল্লাসময়। সে আর কোনো বিষয়ের দ্বারা ছিন্ন হতে জানে না। তার মধ্যে আর কোনো সুখ-বাসনার স্থান নেই। অন্য প্রসঙ্গ তার কাছে অসহ্য। নিজেকে গোপন করে রাখাই তার রমণীয়তা। জীবনের সমস্ত সদ্‌গুণের সে আশ্রয়। তার একমাত্র লক্ষ্য ভগবানের মনোহরণ, ভগবানের প্রীতিবিধান। যাতে ভগবান খুশি হন তাতেই সে নিযুক্ত-নিবিষ্ট। ভাগবতী প্রীতি স্বতঃস্বাদময়ী। অন্যতাৎপর্যহীনা।

নিমাইকে শ্রীরামচন্দ্রের ভজন শোনাল মুরারি। নিমাই খুশি হয়ে মুরারির কপালে 'রামদাস' কথাটি লিখে দিল।

গদাধর তাম্বুল যোগায় নিমাইকে। একদিন চর্বিত তাম্বুল মুরারিকে উপহার দিল নিমাই। মুরারি কতক খেল, কতক মাথায় ধরল।

নিমাই তিরস্কার করে উঠল। 'সে কী, তোমার জাত গেল! সর্বাঙ্গে আমার উচ্ছিষ্ট রাখলে।' বলেই হঠাৎ প্রসঙ্গান্তরে চলে গেল। ভক্তদ্রোহী সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে ভর্ৎসনা করতে লাগল : 'বেদান্ত নিয়ে আছে! আমাকে মানে না। আমার লীলাকর্মকে মিথ্যা বিলাস বলে। কিন্তু আমাকে যে মানে না তার

প্রকাশও নেই আনন্দও নেই। আমার বিগ্রহ সত্য, সেবক সত্য, লীলাস্থান সত্য।' পরের মুহূর্তেই বিশ্বম্ভর আবার অকিঞ্চন মূর্তি ধরল। বললে, 'মুরারি, তুমি আমার ভাই, আমার শুদ্ধ দাস। সব চেয়ে বড় কথা, তুমি আমার নিত্যানন্দকে চিনেছ। যার নিত্যানন্দে কুণ্ঠা সে দাস হলেও আমার প্রিয় নয়।' মুরারিকে আলিঙ্গন করল গৌরহরি।

'এক বোলে আর করে খলখলি হাসে—' বিহ্বল হয়ে স্বগৃহে ফিরল মুরারি। স্ত্রীকে বললে, 'খেতে দাও।'

খেতে বসে এ কী আচরণ! কী দিয়ে ভাত মাখছে, আর নিজের মুখের কাছে তুলে বলছে, 'কৃষ্ণ, খাও।' কোথায় কৃষ্ণ, সমস্ত ভাত পড়ে যাচ্ছে মাটিতে।

থালা শূন্য হয়ে যাচ্ছে, আবার ভাত ঢেলে দিচ্ছে স্ত্রী। আবার কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, আবার খাও, খাও। আবার ঝরে ঝরে মাটিতে পড়ে যাওয়া।

পরদিন সকালে নিমাই এসে হাজির।

মুরারি প্রণাম করে দাঁড়াতেই নিমাই বললে, 'মুরারি, ওষুধ দাও।'

'কার অসুখ?'

'আর কার! আমার।'

'সে কী? কী অসুখ?'

'অজীর্ণ।'

'অজীর্ণ কী করে হল? কী খেয়েছিলে?'

'কী খেয়েছিলাম? এক রাজ্যের ঘি-মাখা ভাত খাওয়াওনি কাল? তুমি দিলে ফেলি কী করে? মাটিতেই পড়ুক আর যেখানেই পড়ুক আমাকে খেতে হল সমস্ত। অজীর্ণ হবে তাতে আর দোষ কী। এখন ওষুধ দাও।' হাত পাতল নিমাই।

'আমি ওষুধের কী জানি!' মুগ্ধের মত তাকিয়ে রইল মুরারি।

'কী জানো বৈ কি। অসুখ করিয়ে দেবে, চিকিৎসা করবে না?'

'তুমি সেই ভাত খেলে কেন?'

'বা, তুমি মুখে তুলে-তুলে দিলে আর বললে খাও, খাও—খাব না?' নিমাই মুরারির হাত চেপে ধরল: 'এখন যা বলছি, শোন, ওষুধ দাও।'

'ওষুধ—ওষুধ আমি পাব কোথায়?'

'তোমার কলসীতে যে জল সেই জলই আমার ওষুধ।' নিমাই ছুটে গিয়ে মুরারির কলসী ধরল। মুরারি বাধা দিতে চাইল, কিন্তু নিমাইকে কে নিরস্ত করে। নিমাই বললে, 'এ কলসী তো জলে ভরা নয়, ভক্তিতে ভরা।'

আরেক দিন শ্রীবাসমন্দিরে বিশ্বম্ভর হঠাৎ গরুড়, গরুড় বলে ডাকতে লাগল। সে ডাক মুরারি শুনতে পেল তার বাড়ি থেকে। এই যে আমি, এই যে আমি—চিৎকার করে রাজপথে বেরিয়ে পড়ল মুরারি। পথের লোক সবাই পাগল ভাবল কিন্তু মুরারির চেতনা নেই। একছুটে শ্রীবাসের অঙ্গনে এসে হাজির হল। চেঁচিয়ে বললে, 'এই যে আপনার কিঙ্কর গরুড় এসে উপস্থিত। বলুন কেন ডেকেছেন?'

'তুমি আমার বাহন তো?' জিগগেস করল নিমাই।

'নিশ্চয়। বলুন কোথায় নিয়ে যেতে হবে? স্বর্গমর্ত পাতাল কোন ভুবনে?' মুরারি নিমাইকে কাঁধে তুলল, 'বলুন কোথায় যাবেন?' অঙ্গনে ছুটে-ছুটে ঘুরতে লাগল: 'কোথায় যাবেন?'

চার দিকে স্ত্রীকণ্ঠে হুলুধ্বনি উঠল, ভক্তকণ্ঠে হরিধ্বনি। 'গুপ্ত-স্কন্ধে চড়ে মিশ্র চন্দ্রের নন্দন। রড় দিয়ে পাক ফিরে সকল অঙ্গন॥'

যতক্ষণ সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে আছেন, লীলা করছেন, ততক্ষণ আমি আছি মহানন্দে—মুরারি মনে-মনে গণনা করছে, কিন্তু এই মলিন সংসারে ভগবান তো চিরদিন থাকবেন না, তখন আমি যাব কোথায়? কৃষ্ণের লীলা, কখন সৃষ্টি কখন সংহার কে বলতে পারে? যে সীতার

জন্যে রাবণকে সংবশে মারলে সেই সীতাকে উদ্ধার করে আবার ত্যাগ করলে অক্লেশে। যে যাদবেরা নিজপ্রাণের সমান তাদের চোখের সামনে মরতে দিল। তাই কখন লীলা সম্বরণ করেন কে জানে। তার আগে নিজেই নিজেকে শেষ করি। প্রভু অপ্রকট হবেন তবু আমি বেঁচে থাকব এ অসহ্য।

ধারালো ছুরি তৈরি করাল মুরারি। ঠিক করল গভীর রাত্রে এ ছুরি বুকে বসাবে।

সন্ধ্যাতেই বিশ্বম্ভর চলে এল। ডাকল মুরারিকে। বললে, 'আমার একটা কথা রাখবে?'

'সে কি, আপনার কথা রাখব না?' চরণবন্দনা করে দাঁড়াল মুরারি: 'এদেহ তো আপনার জন্যে।'

'বটে? তা হলে যে ছুরিখানা ধারালো করে রেখেছ তা আমাকে দাও।' নিমাই হাত পাতল।

'সে কী কথা? কে তোমাকে বললে?' মহা অপ্রস্তুত মুরারি।

আমাকে আবার কে বলবে? নিমাই হাসল: 'যে ছুরি ধারালো করেছ, তা জানি আর ছুরি কোথায় লুকিয়ে রেখেছ তাও জানি।'

'সর্বভূত-অন্তর্যামী জানে সর্বস্থান।' মুরারি আর কী করবে, সলজ্জমুখে ছুরি বার করে দিল।

'মুরারি, তোমার এ কী ব্যবহার!' নিমাই বললে স্নেহস্বরে, 'আমি কী অপরাধ করেছি যে আমাকে ফেলে চলে যেতে চাও? তুমি গেলে আমি কার সঙ্গে খেলব? কে আমার বাহন হবে?'

মুরারি কাঁদতে লাগল।

তাকে কোলের কাছে টেনে নিল নিমাই। বললে, 'আমার মাথা খাও, এ প্রতিজ্ঞা তুমি ছাড়ো। আমার বিরহ তুমি সইতে পারোনা অথচ তোমার বিরহ আমাকে সইতে বলো! এরূপ বুদ্ধি আর করবেনা কখনো।'

নগরভ্রমণে বেরিয়েছে নিমাই। সার্বভৌমের পিতা মহেশ্বর

বিশারদের জাঙ্গালে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাড়িতে এসেছে। দেবানন্দ ভাগবত পড়াচ্ছে কিন্তু নিজে ভক্তিহীন।

'তোমাকে লোকে মহা-অধ্যাপক বলে, কিন্তু তুমি ভাগবতের মর্ম-অর্থই জানো না। দাও পুঁথিখানা দাও,' নিমাই হাত বাড়াল : 'ছিঁড়ে ফেলি।'

'ছিঁড়ে ফেলবে ?'

'নিশ্চয়ই। চারিবেদ দধি, ভাগবত নবনী। আর তুমি দেখছি শুষ্ক কাঠ,' বললে নিমাই, 'গুরু যেখানে ভক্তিশূন্য সেখানে শিষ্যদের কী দশা! যে গ্রন্থের তাৎপর্য না জানে তার কিসের অধ্যাপনা!'

বাক্যদণ্ড গ্রহণ করে আধোমুখে দাঁড়িয়ে রইল দেবানন্দ। 'চৈতন্যের দণ্ড যে মস্তকে করি লয়। সেই দণ্ড তার তরে ভক্তিযোগ হয়॥'

শ্রীধরের ঘরে এল বিশ্বম্ভর। একখানা মাত্র ভাঙা ঘর, দুয়ারও ভাঙা। অঙ্গনে নাচতে লাগল নিমাই। হঠাৎ তার চোখ পড়ল, দরজার কাছে এক লৌহপাত্র আর তাতে জল। ক্লান্ত হয়েছে নিমাই, স্নিগ্ধ হবার জন্যে সে লৌহপাত্র মুখে তুলে ধরল, বললে, 'জল খাব।'

এ কী অসম্ভব কথা! আমি যে নরকে যাব। শ্রীধর কেঁদে পড়ল। আমাকে সংহার করবার জন্যেই তোমার এ কৌশল নাকি?

'বৈষ্ণবের জল খেলে বিষ্ণুভক্তি হয়।' এক ঢোঁকে সমস্ত জল খেয়ে নিল নিমাই। 'আমার দেহ আজ শুদ্ধ হল। কৃষ্ণের চরণে ভক্তি হল এতদিনে।'

'দাস বই কৃষ্ণের দ্বিতীয় আর নাই।' তুমি সেই কৃষ্ণদাস। যে বিচক্ষণ সে সর্বপাপবিশুদ্ধির জন্যে বৈষ্ণবের অন্ন প্রার্থনা করবে, তার অভাবে অন্তত জল চেয়ে খাবে। আর লৌহপাত্রে এ শুধু পানীয় জল নয়, বৈষ্ণবের নির্মল ভক্তি, জীবনের পরমার্থ।

'কৃষ্ণ রে, ঠাকুর মোর, অনাথের নাথ—' শ্রীধর মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

সেদিন নগরের প্রান্তে চলে এসেছে নিমাই, মদের গন্ধ নাকে এল। সেটা শুঁড়ি-পাড়া, মদ তৈরি হচ্ছে। মদের গন্ধে বারুণীর স্মরণ হল, বলরামভাব ধরল নিমাই।

শ্রীবাসকে বললে, 'শ্রীবাস, চলো যাই, ওদের দেখে আসি।'

'সে কি, ওখানে যাবেন কী!' শ্রীবাস থমকে দাঁড়াল।

'কেন, ওখানে গেলে কী হয়? লোকে আমার কলঙ্ক রটাবে? না, না, কিছু হবে না। চলো ভিড়ি গিয়ে মাতালের দলে।'

শ্রীবাস বিশ্বম্ভরের পায়ে পড়ল, না, না, ওখানে যেতে নেই।

'সে কি, স্থান সম্পর্কে কি আমার কোনো বিধি আছে, না, নিষেধ আছে?'

'না, তা নেই। তুমি সর্বগামী, সর্বস্থায়ী।' করজোড়ে বললে শ্রীবাস, 'তুমি জগতের পিতা, ক্ষয় করতেও তুমি রক্ষা করতেও তুমি। তবু, তুমি যদি আমার কথা না শোনো, না শুনে মদ্যপের ঘরে গিয়ে ওঠ, তাহলে আমি গঙ্গায় ডুবে প্রাণত্যাগ করব।'

শচীনন্দন হাসতে লাগল। হার মানল ভক্তের কাছে। 'ভক্তের সঙ্কল্প প্রভু না করে লঙ্ঘন।' বললে, 'তোমার যাতে ইচ্ছা নেই তাতে আমি যাব না। বেশ ফিরে চলো।'

রাম-ভাব সম্বরণ করে পথে নামল নিমাই।

কিন্তু এ কি, এ কারা আসছে! সকলের মুখেই যে হরি-হরি। সকলের পা-ই যে নৃত্যপাগল।

'এই যে মাতালের দল।' বললে শ্রীবাস, 'তোমাকে দেখে এরা নিজেরাই বেরিয়ে এসেছে।'

'নিমাই পণ্ডিত, তুমি খুব ভালো।' বললে এক মাতাল, 'খুব ভালো গান গাও তুমি। গাও না একখানা।'

'তুমি খুব ভালো নাচো। একটু নাচো না দেখি।' বললে আরেক মাতাল।

'এই দেখ, আমরাও সকলে হরি-হরি বলছি।' মাতালের দল

হাততালি দিয়ে নাচতে লাগল গোল হয়ে। নিমাইও নাচতে লাগল। 'আর কে না জানে তুমিই আমাদের হরি।'

আনন্দে কাঁদতে লাগল শ্রীবাস।

'যে দেখিল চৈতন্যচন্দ্রের অবতার।
হউক মদ্যপ তবু তারে নমস্কার॥
মদ্যপেরে শুভদৃষ্টি করি বিশ্বম্ভর।
নিজাবেশে ভ্রমে প্রভু নগরে নগর॥'

এবার কৃপা ভগবানের অধীন নয়, এবার ভগবান কৃপার অধীন। গৌরের অনুসন্ধান ছাড়াও গৌরকৃপা জীবকে এবার কৃতার্থ করবে। 'এই দেখ চৈতন্যের কৃপা মহাবল। তাঁর অনুসন্ধান বিনা করয়ে সফল॥'

কৃষ্ণকথা অমৃতের চেয়েও মধুর। তা ভক্তের জীবন। সংসারদাহের শ্রাবণসিঞ্চন। এমন কি কৃষ্ণ-বিরহ-জ্বালারও শান্তি। কৃষ্ণকথা শ্রবণমঙ্গল, সর্বকল্মষের অপঘাত। অর্থ বিচার করতে হয় না, শোনামাত্র বলামাত্রই সুখসঞ্চার। সর্বদেশে সর্বকাল পরশ্রী আর ব্যাপ্তি, মোক্ষ-স্বর্গও যার কাছে অকিঞ্চিৎ। এমন কথা যারা বলে এমন নাম যারা উচ্চারণ করে তারাই সর্বার্থপ্রদাতা।

গোপীনাথের সেবক সারঙ্গদেব গৌরের চরণে আত্মসমর্পণ করল। বললে, 'বুড়ো হয়েছি, একজন শিষ্য দরকার। নইলে ভবিষ্যতে কে সেবা করবে গোপীনাথের?'

'ভালো কথা।' বললে নিমাই, 'একজন শিষ্য বেছে নাও।'

'সৎ শিষ্য পাই কোথা? আপনি একটি যোগাড় করে দিন।'

'তোমার শিষ্য তুমি নেবে। আমি তার কী জানি।'

রাগ হল সারঙ্গের। বললে, 'বেশ, আমিই নেব। কাল প্রত্যূষে যার মুখ প্রথম দেখব তাকেই শিষ্য করব।

ভয়ে-ভয়ে বিনিদ্র রাত কাটাল সারঙ্গ। এ কী বললাম! প্রভু না জানি কাকে আমার ঘাড়ে চাপান! প্রত্যূষে গঙ্গাতীরে চোখ

বুজে মালা জপছে সারঙ্গ, হঠাৎ কী একটা জিনিস তার কাছে এসে ঠেকল। চোখ চেয়ে সারঙ্গ দেখল একটি এগারো-বারো বছরের বালকের মৃতদেহ। সগুমুণ্ডিত মাথা, গলায় শুভ্র উপবীত, পরনে পট্টবস্ত্র। সারঙ্গের হৃদয়ে বাৎসল্য জাগল, মনে পড়ল গত দিনের সংকল্প। কিন্তু এ তো মৃত, একে শিষ্য করব কী করে?

মৃত কি জীবিত, এ প্রশ্নে তোমার অধিকার নেই। চোখ মেলে প্রথম যখন একে দেখেছ একেই তোমাকে মন্ত্রদীক্ষা দিতে হবে।

কানে মন্ত্র দিতেই মৃত বালক জেগে উঠল।

সরগ্রামের গোস্বামী-বাড়ির ছেলে, পৈতের দিন রাত্রে সাপে দংশন করে। মৃত ভেবে গ্রামের খড়ে নদীতে ফেলে দেয়। নতুন বর্ষার জলে ভাসতে-ভাসতে গঙ্গায় এসে পড়েছে। চলো তোমাকে দিয়ে আসি তোমার বাপ-মার কাছে।

'যারা আমাকে ভাসিয়ে দিয়েছে তাদের কাছে আমি আর যাব না।' বললে সেই বালক, 'যে আমাকে তীরে তুলেছে ছাড়ব না সেই গুরুর শ্রীচরণ।'

'চলো সারঙ্গের নতুন শিষ্য দেখে আসি।' বললে গৌরহরি। সারঙ্গের বাড়ি এসে সারঙ্গকে জিগগেস করলে, 'কেমন শিষ্য পেলে? মনের মত?'

আনন্দ-উজ্জ্বল চোখে কাঁদতে লাগল সারঙ্গ।

৩৬

'সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরং। দ্বিভুজং মৌলিমালাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরং।' যাঁর চোখ প্রফুল্ল পদ্মের মত আয়ত, যাঁর বর্ণ মেঘের মত শ্যামল, যাঁর বসন বিদ্যুতের মত পীত, যিনি দ্বিভুজ, যিনি

মাল্যবেষ্টিত মুকুট ধারণ করে আছেন এবং যিনি বনমালী সেই ঈশ্বরকে, শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি।

নবদ্বীপের এক ব্রহ্মচারী, ভাত খায়না, শুধু দুধ খেয়ে দিন কাটায়, একদিন ধরল শ্রীবাসকে। বললে, 'আমাকে একদিন পণ্ডিতের নাচ দেখাও। নয়ন সফল করি, কৃতকৃত্য হই।'

না, একে বাড়ির ভিতর নিয়ে যেতে আপত্তি কী! নির্দোষ নিঃসঙ্গ সাধু, কঠোর ব্রহ্মচর্যে অবস্থিতি, ওর নিশ্চয়ই অধিকার আছে দর্শনে। শ্রীবাস বললে, 'বেশ, নিয়ে যাব তোমাকে। কিন্তু তুমি একটু গোপনে থাকবে।'

যথা আজ্ঞা, ব্রহ্মচারী বাড়ির ভিতর ঢুকে এক কোণে দাঁড়িয়ে লুকিয়ে দেখতে লাগল।

'কৃষ্ণ রাম মুকুন্দ মুরারি বনমালী'—গায়ন্ত সবাই নৃত্য করছে। মধ্যস্থলে বৈকুণ্ঠনায়ক গৌরাঙ্গ।

হঠাৎ বিশ্বম্ভর বলে উঠল, 'আজ কেন প্রেম হচ্ছে না? বাড়ির মধ্যে নতুন লোক কেউ আছে?'

ভয় পেল শ্রীবাস। বললে, 'আছে। কিন্তু সে এক সদাচারী ব্রাহ্মণ, নিষ্পাপ ব্রহ্মচারী। পয়ঃপান করে জীবনধারণ করে। তোমার নৃত্য দেখতে তার সশ্রদ্ধ অভিলাষ।'

'শিগগির তাকে বাড়ির বার করে দাও।' হুঙ্কার করল গৌররায়: 'ওর ভক্তি নেই, শরণাগতি নেই। শুধু পয়ঃপানে ভক্তি হয় না, হয় না কঠোরাচারে। চাই শরণাগতি, চাই সর্বসমর্পণ।' 'চণ্ডালেহো মোহোর শরণ যদি লয়। সেহো মোর, মুঞি তার, জানিহ নিশ্চয়॥'

ব্রহ্মচারী বাড়ির বার হয়ে গেল। মনে-মনে ভাবল, যা দেখলাম, তাই আমার মহাভাগ্য। কী অপূর্ব নৃত্য, কী অপূর্ব ক্রন্দন! তারপর অপরাধের অনুরূপ শাস্তি পেলাম। শাস্তিও মনোরম! 'এ শাস্তি কৃপার নামান্তর।'

এই মেনে-নেওয়ার বুদ্ধি সেবকের বুদ্ধি। সেবকই ভগবানের

দণ্ড অপ্রতিবাদে সহ্য করে। গৌরসুন্দর ডেকে আনল ব্রাহ্মণকে। তার মাথার উপর পাদপদ্ম রাখল। বললে, 'তপস্যাই শ্রেষ্ঠ নয়, বিষ্ণুভক্তিই শ্রেষ্ঠ।'

রাত্রিকালে শুধু শ্রীবাসের ঘরে কীর্তন হচ্ছে, মুষ্টিমেয় অন্তরঙ্গ ছাড়া আর কেউ তা সম্ভোগ করতে পারছে না। ক্রমে ক্রমে নদীয়ার সর্বত্র রব উঠল, আমরাও শুনতে চাই। কেউ বলে, যদি ভক্তি থাকে নিশ্চয়ই একদিন শুনতে পাবে। আবার কেউ বলে, দেরি নেই, ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে কীর্তন করবেন গৌরহরি।

কত লোক দেখা করতে যায় নিমাইয়ের সঙ্গে। সকলকেই নিমাই বলে, 'কৃষ্ণনাম বলো। বলো হরয়ে নমঃ, কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ, বলো, গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন। নিজ-নিজ দুয়ারে আত্মীয়-পরিজন মিলে হাততালি দিয়ে কীর্তন করো। সকলের কৃষ্ণভক্তি হোক। কৃষ্ণনাম ছাড়া আর কিছু নেই বলবার।'

প্রতি ঘরে কীর্তনের রোল উঠল। মৃদঙ্গ-মন্দিরা বাজতে লাগল।

খোলাবেচা শ্রীধরও নাম করতে-করতে পথে বেরিয়ে পড়েছে। রাস্তার লোকেরা যোগ দিল সেই আনন্দনৃত্যে। প্রেমরসে বিহ্বল হয়ে শ্রীধর মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগল। 'দেখ দেখ খোলাবেচা শ্রীধরও বৈষ্ণব হল!' সকলে করল বলাবলি : 'পরনে আস্ত কাপড় নেই, পেটে ভাত নেই, ভিক্ষে করে খায়, তারও কিনা অকালে দুর্গোৎসব, নামানন্দের লহরী।'

সার-বিধি কৃষ্ণস্মৃতি। কৃষ্ণস্মৃতিই ভজনের প্রাণ, সাধন-ভক্তির মূল। কৃষ্ণস্মৃতিহীন ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান অভীষ্টসিদ্ধির উপযোগী নয়। কিন্তু নামকীর্তন? নামীকে স্মরণে না রেখেও নাম উচ্চারণ করলে কৃপালাভ ঘটবে। নাম আর নামী অভেদ। নামীর মত নামও স্বপ্রকাশ, পরমস্বতন্ত্র। একমাত্র নামেরই সর্বাভীষ্টপূরণী শক্তি। নামই পরমধর্ম। নামই ভগবৎস্বরূপ।

যার মুখে একবার কৃষ্ণনাম শোনা যায় সেই বৈষ্ণব, যার মুখে

নিরন্তর কৃষ্ণনাম বিরাজিত সে বৈষ্ণবতর, যাকে দর্শন করলেই আপনা-আপনি মুখে কৃষ্ণনাম স্ফুরিত হয় সে বৈষ্ণবতম।

সচ্চিদানন্দসান্দ্র শ্যামসুন্দরই নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ! গৌরাঙ্গই গোপীভাবাবিষ্ট কৃষ্ণ। রাধারসবিলাসী, রাধারসবিনোদী, রাধা-মাধুরীধুরিততনু, রাধাপ্রেমভরাতিমত্ত। গৌরাঙ্গই কন্দর্পদর্পহারী হরি, আনন্দই তার রূপ। আনন্দস্বরূপ হয়েও মূর্ত, সর্বব্যাপী হয়েও পরিচ্ছিন্ন। গৌরাঙ্গেরই সর্বাতিশায়ী মাধুর্য।

একদিন কাজী পথে বেরিয়েছে, শুনতে পেল হরিনামের কোলাহল। পথে বেরিয়েছে 'নগরিয়া'রা আর মৃদঙ্গ-মন্দিরা বাজাচ্ছে। এতদিন যা নালিশ শুনেছিল কাজী তাহলে তা সত্যি? ধরো ধরো অনাচারীদের। হুকুম দিল কাজী। সমস্ত হিন্দুয়ানির যে মূল, পারো তো নিমাই আচার্যকে ধরে আনো।

নগরিয়ারা 'আথেব্যথে' পালাতে লাগল। যাকে কাছে পেল কাজীর লোকেরা প্রহার করল। মৃদঙ্গ ভেঙে ফেলল। ঘরে-দ্বারে করল নানা অনাচার।

'আজ এই পর্যন্ত থাক।' উচ্চে ঘোষণা করল কাজী: 'কিন্তু বলে যাচ্ছি আবার যদি কেউ নগরে প্রকাশ্যে হরিনাম করে তার জাতি মারব।'

সকলের মাথায় বাজ পড়ল। এখন উপায় কী!

কেউ বললে, 'মনে মনে হরিনাম করব। বেদবাক্য লঙ্ঘন করলে এরকমই শাস্তি হয়। উপায় নেই।'

'নিমাই পণ্ডিত যে অহঙ্কার করেন এবার তা চূর্ণ হবে।' বললে কেউ।

'এবার নিত্যানন্দের রঙ্গ বেরুবে।'

'চলো তবে প্রভুস্থানে গিয়ে সব গোচর করি। জানাই দুঃখের কথা।'

'প্রভু, কাজীর হুকুমে আমাদের নগরকীর্তন বন্ধ হয়ে গেল।

অনুমতি করুন আমরা নবদ্বীপ ছেড়ে অন্যত্র চলে যাই।' নগরিয়ারা কাঁদতে বসল: 'যদি কীর্তনই না করতে পারি তা হলে বেঁচে থেকে সুখ কী!'

কথা শুনে নিমাই রুদ্রমূর্তি ধরল। হুঙ্কার করে বললে, 'কাজী কৃষ্ণকীর্তন বন্ধ করবে? অসম্ভব। আমি নিজে কীর্তন নিয়ে বেরুব নগরে। দেখি কী করে বন্ধ করে আমাকে। ভাই নিতাই, নগরে ঘোষণা করে এস আমি আজ সন্ধ্যায় পথে-পথে কীর্তন করব। সকলকে বলো খেয়ে-দেয়ে বিকেলে আমার বাড়িতে যেন একটি দীপ হাতে করে আসে। তোমরা তিলার্ধও ভয় কোরো না। কৃষ্ণের রহস্য আজ দেখবে সকলে।'

'কীর্তনের বাধ শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রোধে হইলেন প্রভু রুদ্রমূর্তিধর॥
হুঙ্কার করয়ে প্রভু শচীর নন্দন।
সর্ব নবদ্বীপে আজি করিমু কীর্তন॥
দেখ আজি কাজির পোড়াও ঘর-দ্বার।
কোন কর্ম করে দেখোঁ রাজা বা তাহার॥
প্রেমভক্তি বৃষ্টি আজি করিব বিশাল।
পাষণ্ডীগণের হইব আজি কাল॥
ভাঙ্গিয়া কাজির ঘর কাজির দুয়ারে।
কীর্তন করিমু, দেখোঁ কোন কর্ম করে॥'

তবে আর ভয় কী। স্বয়ং প্রভু অবতীর্ণ হবেন। স্বয়ং প্রভু সম্মুখীন হবেন। চারদিকে হুলুস্থূল পড়ে গেল।

ঘরে-ঘরে দেউটি জ্বলে উঠল। প্রভু কোন পথ দিয়ে যাবেন ঠিক নেই, তাই সব পথই আলোকিত হল। দ্বারে দ্বারে বসল পূর্ণকুম্ভ, দাঁড়াল কলাগাছ। স্ত্রীলোকেরা বেশভূষায় মন দিল, ভিড় করল বাতায়নে। শিশুরাও মাতল রঙ্গে-ভঙ্গে। যারা কীর্তনে বেরুবে প্রত্যেকে হাতে করে জ্বলন্ত মশাল নিল, কটিতে তেলের ভাণ্ড বাঁধা,

গলায় ফুলের মালা, অঙ্গে চন্দনের প্রলেপ। প্রভুকেও সাজিয়ে দিল গদাধর। বদনে অলকা-তিলকা, ললাটে ফাগুবিন্দু, চোখে কাজল। মাথায় চূড়া বাঁধল, চূড়া ঘিরে মালতীর মালা। সর্বাঙ্গে চন্দনশোভা, কাঁধে বুকে শুক্ল যজ্ঞসূত্র। পরিধানে পট্টবস্ত্র গলায় চাদর। দাঁড়ালেন যেন জ্যোতির্ময় কনকবিগ্রহ। 'মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোঃ মধুরং মধুরং বদনং মধুরং। মধুগন্ধি-মধুস্মিতমেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং॥'

কীর্তনের দল কয়েক সম্প্রদায়ে ভাগ হল। প্রথমদলের কর্তা অদ্বৈত, মধ্যদলের হরিদাস, তৃতীয়দলের শ্রীবাস, চতুর্থদলের গৌরহরি। নিত্যানন্দের দিকে তাকাল নিমাই, তুমি কোন দলে ?

'আমি তোমার পাশটিতে।' বললে নিতাই।

স্বতন্ত্র নাচিতে প্রভু, মোর কোন শক্তি।
যথা তুমি তথা আমি এই মোর ভক্তি॥'

'নিতাই যদি দক্ষিণে আমি বামে।' বললে গদাধর।

চলল মুরারি মুকুন্দ শ্রীবাস গঙ্গাদাস চন্দ্রশেখর বাসুদেব। চলল রামাই চক্রেশ্বর জগদীশ জগদানন্দ। চলল শ্রীধর নন্দন আচার্য শুক্লাম্বর গোপীনাথ। আরো কত কত লোক, হাজারে-হাজার। 'এতেক লোকের সে হইল সমুচ্চয়। সরিষাও পড়িলেও তল নাহি হয়॥'

'চোরের আছিল চিত্ত—এই অবসরে।
আজি চুরি করিবাঙ প্রতি ঘরে ঘরে॥
সেহ চোর পাসরিল আপন বেভার।
'হরি' বই মুখে কারো না আইসে আর॥'

নাচতে-নাচতে গাইতে-গাইতে চলল গৌরহরি। হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন। দেখতে-দেখতে কত সম্প্রদায় যে হয়ে গেল তার ঠিক-ঠিকানা নেই। কেউ একা-একা নাচছে, কেউ বা দশে-পাঁচে। জগাই-মাধাই উদ্ধারের দিন ক'টা লোক দেখেছিল ? আজ নবদ্বীপের তাবৎ লোক নিমাইয়ের

কীর্তন দেখতে জড়ো হল। সকলেই আনন্দবিহ্বল, সকলের মুখেই হরিধ্বনি। প্রভুর নৃত্য—সে এক 'অপূর্ব বিকার।' সে-কম্প সে-ঘর্ম সে-পুলক কেউ দেখেনি। দেখেনি সে-অশ্রু। সর্বাঙ্গ পদ্মনয়নের জলে ভিজে যাচ্ছে। 'ক্ষণে হয় প্রভু-অঙ্গ সব ধুলাময়। নয়নের জলে ক্ষণে সব পাখালয়॥' সে কারুণ্য দেখে পরম লম্পটও মাটিতে পড়ে কাঁদছে। 'তুয়া চরণে মন লাগহুঁরে।' সকলের কণ্ঠেই এই বুলি।

প্রথমে গঙ্গাতীরে গিয়ে নিজের ঘাটে গিয়ে কিছুক্ষণ নৃত্য করল নিমাই। পরে নাচতে-নাচতে মাধাইয়ের ঘাটে গেল। সেখান থেকে বারকোণা ঘাট হয়ে চলল নগরপ্রান্তে সিমুলিয়ায়, কাজীর বাড়ির উদ্দেশে।

এত আলো কিসের? দিন না রাত নিশ্চয় করা যাচ্ছে না, ব্যাপার কী? এত বাদ্যোকোলাহলই বা কেন? কাজী অন্তঃপুরে চমকে উঠল। দেখ তো কারু বিয়ে কিনা, চলেছে কিনা শোভাযাত্রা।

'কাজী গেল কোথা? পেলে তার মাথা গুঁড়ো করে দেব।' নগরিয়ারা বলছে কেউ-কেউ। কেউ-কেউ বা কাজীর উদ্দেশে মাটিতে লাথি মারছে। আবার কেউ-কেউ বলছে, রক্তারক্তি কাণ্ড না হয়ে যায় আজ। কেউ বা টিপ্পনী কাটছে, একবার কাজীর সৈন্যরা বেরোক না, সব ভাবকালি ঘুরিয়ে দেবে। তখন কে কোথায় প্রাণ হারাবে কে কোথায় পালাবে প্রাণ নিয়ে তার ঠিকানা নেই। নিমাই পণ্ডিত বিপদ ডেকে আনল দেখছি।

কাজীর অনুচরেরা পথে নামল। 'এ যে দেখি লোকসমুদ্র! হাতে-হাতে প্রজ্বলন্ত মশাল। কী বলছে ওরা? হরি-হরি? শুধু তাই নয়। মার্ কাজী, মার্ কাজী।

শশব্যস্ত হয়ে সকলে ছুটে এল কাজীর কাছে। বললে, 'পালান। নিমাই পণ্ডিত লাখ-লাখ লোক নিয়ে আসছে। সকলে মারমুখো। আমরা যে মৃদঙ্গ ভেঙেছিলাম, প্রহার করেছিলাম, তার শোধ নেবে আজ।'

'আমার পাইক-পেয়াদা কোথায়?' কাজী হুঙ্কার ছাড়ল। 'নিমাই পণ্ডিতের জাত মারব আজ।'

কোথায় পাইক-পেয়াদা? পালাবার পথ নেই, কীর্তনিয়ারা চারদিক নিবিড় করে ঘিরেছে। কাজীর অনুচরেরা যারা বেরিয়ে পড়েছিল, কীর্তনের দলে মিশে গেল। মাথার পাগ ফেলে দিয়ে নাচতে লাগল হরি বলে। দেহজ্ঞান হারিয়ে তন্ময় হয়ে নাচতে লাগল।

'কোথায় কাজী?' ক্রুদ্ধকণ্ঠে ডাক ছাড়ল নিমাই।

অন্তঃপুরের গভীরে কাজী লুকিয়েছে। বুঝতে পারেনি এত সহজে এই বিপরীত কাণ্ড ঘটবে! প্রস্তুত হতে পারেনি। শুধু নিভৃত-কক্ষের দুয়ার রুদ্ধ করতে পেরেছে।

'ক্রোধে বোলে প্রভু, আরে কাজি বেটা কোথা?
কাট আন ধরিয়া কাটিয়া ফেলোঁ মাথা॥
নির্যবন করোঁ আজি সকল ভুবন।
পূর্বে যেন বধ কৈঁলু সে কাল যবন॥
প্রাণ লঞা কোথা কাজি গেল দিয়া দ্বার।
ঘর ভাঙ্গ ভাঙ্গ, প্রভু বোলে বার-বার॥'

তর্জ-গর্জ করে উদ্ধতেরা কেউ ঘর-দোর ভাঙতে লাগল, কেউ বা আম-কাঁটালের ডাল। ফুলের বাগান তছনছ করে দিল, কলাবন ফেলল উপড়ে। প্রভুর প্রশ্রয় আছে, আর ভয় কী! কীর্তনের শক্তির কাছে কাজীর শক্তি কতটুকু! 'কীর্তন-বিরোধী পাপী করিমু সংহার।' সঙ্কীর্তনের জন্যেই তো নিমাইয়ের অবতার। 'তপস্বী সন্ন্যাসী জ্ঞানী যোগী যে যে জন। সংহারিমু সব যদি না করে কীর্তন॥'

সকলে দেখল সঙ্কর্ষণ যেন ক্রোধে রুদ্র-অবতার হয়েছেন! যার অংশাংশের ক্রোধেই সমস্ত বিশ্বের বিলয় ঘটে সে যদি ক্রুদ্ধ হয় তাহলে আর কার পরিত্রাণ?

কাজীর বাড়িতে পৌঁছে নিমাই সমুদয় ভাব সম্বরণ করল। শান্ত

রূপ ধরল। ক'জন ভব্য লোককে পাঠাল অভ্যন্তরে, কাজীকে ডেকে আনো। তার বাড়িতে আমি অতিথি আর সে কি-না অন্তঃপুরে লুকিয়ে আছে? এ কেমন সদাচার?

মাথা নত করে কাজী কাছে এসে দাঁড়াল।

'তোমার ধর্ম কি অভ্যাগতকে সম্বর্ধনা করতে বলে না?' জিগগেস করল নিমাই।

'তা কেন?' কাজী বললে, 'তুমি তো অতিথি হয়ে আসনি, তুমি এসেছ ক্রুদ্ধরূপে। চতুর্দিকে তোমার ধ্বংসের লীলা। এখন যখন তুমি শান্ত হয়েছ, বলছ তুমি আমার অতিথি তখন এসেছি অভিনন্দন করতে। তোমার মত অতিথি পাওয়া তো ভাগ্যের কথা। তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া কী?' নিমাই হাসল।

'তা ছাড়া তুমি আমার ভাগ্নে, আমি তোমার মামা।' কাজী বললে।

'বলো কী?'

'হ্যাঁ, তোমার নানা, মাতামহ, নীলাম্বর চক্রবর্তী গ্রাম সম্পর্কে আমার চাচা হত। জানো তো কখনো কখনো দেহসম্বন্ধ হতে গ্রাম-সম্বন্ধ শ্রেষ্ঠ। সুতরাং মামার অপরাধ ভাগ্নের নিতে নেই।'

'অপরাধ করেছ নাকি?'

'করিনি মানে? তোমাদের কীর্তন বন্ধ করার হুকুম দিয়েছি, মারপিট করেছি, মৃদঙ্গ ভেঙে দিয়েছি—'

'কিন্তু কই এখন তো কিছু বাধা দিচ্ছ না। এতটা পথ নৃত্যগীত করতে করতে এলাম, কোনো সংঘর্ষই তো হল না! নিমাই অবাক মানল।

কাজী বললে, 'যদি নিভৃত হও, কারণ কী বলতে পারি।'

'এরা আমার সব অন্তরঙ্গ জন, প্রকাশ্যে বললে তোমার কোনো ভয় নেই।' নিমাই আশ্বাস দিল।

'যেদিন মৃদঙ্গ ভাঙলাম, কীর্তননিষেধের হুকুম দিলাম সেদিন রাত্রে এক ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটল।' চোখেমুখে আতঙ্ক নিয়ে বলতে লাগল কাজী: শুয়ে ছিলাম, দেখলাম এক সিংহমুখ নরদেহ বিস্তর গর্জন করে লাফ দিয়ে আমার বুকের উপর চড়ে বসল। নখ দিয়ে আমার বুকে আঘাত করে বললে, তুই মৃদঙ্গ ভেঙেছিস, আমি তোর বুক বিদীর্ণ করব। কী তোর স্পর্ধা যে আমার কীর্তন তুই বারণ করিস। ভয়ে চোখ বুজে কাঁপতে লাগলাম। আমাকে ভীত হয়ে চোখ বুজে কাঁপতে দেখে সিংহ ছেড়ে দিল। বললে, তুই যখন ত্রস্ত, পরাজিত, তখন আর তোকে প্রাণাঘাত করব না, কিন্তু বলে যাচ্ছি যদি ফের উৎপাত করিস, তোকে সবংশে নিধন করব। বলে সিংহ ছেড়ে দিল আমাকে—'

'সত্যি?'

'বিশ্বাস না হয়, দেখ আমার বুকে সেই নখচিহ্ন।' কাজী বুক খুলে দেখাল!

সকলে আশ্চর্য মানল।

'এ কথা আমি কাউকে বলিনি।' বলে চলল কাজী: 'সেদিন আমার এক পেয়াদা এসে বললে, যেই কীর্তন বন্ধ করতে গেলাম, আমার মুখে হঠাৎ এক ঝলক আগুন এসে পড়ল। দাড়ি পুড়ে গেল, মুখে ব্রণ উঠল। যে পেয়াদা যায় তারই এই কথা। আমার তখন ভীষণ ভয় হল। বললাম কীর্ত্তন আর নিষেধ কোরো না, ঘরের মধ্যে বন্ধ হয়ে থাকো। সে কী কথা। স্বধর্মীরা আসতে লাগল দলে-দলে। তা হলে যে নগরে হিন্দুদের স্বচ্ছন্দ কীর্তন হবে। হিন্দুদের হরি-হরি কৃষ্ণ-কৃষ্ণ রাম-রাম নাম আর সহ্য করতে পারি না, ও-ছাড়া আর ধ্বনি নেই পথে-ঘাটে। বাদশা শুনতে পেলে আর রক্ষে রাখবে না। আমি বললাম, তোমরাও তো দেখি কেউ হরিদাস কেউ কৃষ্ণদাস কেউ রামদাস হয়েছ। হিন্দুদের দেখাদেখি তোমরাও তো দেখি লাফঝাঁপ দিচ্ছ আর চেঁচাচ্ছ হরি-হরি কৃষ্ণ-কৃষ্ণ রাম-রাম

বলে। আর এমনি মজা, সেই থেকে আমার জিহ্বাও নিরন্তর হরি-হরি বলছে।' 'সেই হইতে জিহ্বা মোর বোলে হরি-হরি। ইচ্ছা নাঞ্চি, তবু বোলে, কি উপায় করি ॥'

'হরিনাম যে স্বপ্রকাশ বস্তু।' বললে নিমাই।

'আর আমার অনুচরদের কী দশা যদি শোনো। তারা হিন্দুদের পরিহাস করে বলতে গেল কৃষ্ণনাম আর কী সে মহৌষধ, তাদের জিহ্বায় তা সংলগ্ন হয়ে রইল। এ-দিকে তোমার পাষণ্ডী হিন্দুদের কোথা শোনো—' কাজী তাকাল জনতার দিকে।

'তারা কী করল?' জিগগেস করল জনতা।

'তারা নালিশ করল সেরেস্তায়। নিমাই ভেঙে ফেলল হিন্দুধর্ম, রসাতলে দিল। যে কীর্তন সুরু করেছে তার কথা শুনিনি কোথাও। মঙ্গলচণ্ডী বিষহরির পূজো ছিল, বেশ, ছিল তাতে নৃত্যগীত করে রাত্রি জাগরণ করো, কেউ কিছু বলতে আসবে না। কিন্তু এ কী উন্মত্ততা। মৃদঙ্গ-করতাল বাজিয়ে লাফালাফি চেঁচামেচি ধুলোয় লুটোনো। গয়া থেকে এসে অবধি এ পাগলামি শুরু করেছে। এ-দিকে আমাদের রাত্রে ঘুম নেই, বায়ুর প্রকোপ বৃদ্ধি হয়ে সকলের পাগল হবার জোগাড়। কাজী সাহেব, এর একটা বিহিত করো। নিমাই নাম ছেড়ে এবার গৌরহরি নাম নিয়েছে! হিন্দুধর্ম নষ্ট হল, নবদ্বীপ উজাড় হয়ে গেল। যতদূর জানি হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বরনাম অতি গোপনে মনে মনে জপ করতে হয়, উচ্চস্বরে কীর্তন করলে মন্ত্রের বীর্যহানির সম্ভাবনা। কাজী সাহেব, তুমি গ্রামের ঠাকুর, নবদ্বীপের শাসনকর্তা, আর আমরা তোমার আশ্রিত প্রজা, আমাদের মান বাঁচাও। নিমাইকে ডাকিয়ে কীর্তন বর্জন করবার হুকুম দাও।'

'তুমি তখন কী বললে?'

'আমি বললাম, তোমরা ঘরে যাও, আমি নিমাইকে বারণ করে দেব। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে,' কাজী বলল গদ্গদ স্বরে, 'হিন্দুর শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর যে নারায়ণ তুমি সেই পরমেশ্বর।'

নিমাই হাসতে হাসতে কাজীকে স্পর্শ করল। বললে, 'তুমি হরি কৃষ্ণ নারায়ণ তিন নামই উচ্চারণ করেছ, তোমার পাপক্ষয় হয়ে গেল, তুমি পরম পবিত্র হয়ে গেলে। তুমিই ভাগ্যবান, তুমিই পুণ্যবান।'

অর্জুনকে বলছে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রদ্ধা বা হেলা করেও আমার নাম যে উচ্চারণ করে তার নাম আমার হৃদয়ে গাঁথা থাকে। 'শ্রদ্ধয়া হেলয়া নাম রটন্তি মম জন্তবঃ। তেষাং নাম সদা পার্থ বর্ততে মম হৃদয়ে॥' চিদাত্মক হরিনাম একবার মাত্র উচ্চারণ করলে যে ফল হয় তা সহস্র-বদন অনন্তও বর্ণনা করতে পারে না।

কাজীর দু'চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল। প্রভুর চরণ ছুঁয়ে সকাতরে যাচঞা করল। 'তোমার প্রসাদে মোর ঘুচিল কুমতি। এই কৃপা কর যে—তোমাতে রহু ভক্তি।'

'একটি মাত্র ভিক্ষা তোমার কাছে আছে।' বললে গৌরহরি।

'বলুন।'

'বলো নদীয়ায় কীর্তনে আর বাধা দেবে না?'

'কদাচ না। আমার বংশধরদেরও দিব্যি দিয়ে যাব তারাও যেন কোনো দিন বাধা না দেয়।'

কথা শুনে প্রভু হরি বলে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন। সঙ্গে-সঙ্গে সকলে প্রতিধ্বনি করে উঠল।

চলল আবার কীর্তনের মিছিল। কাজীও খানিক পথ এল পিছে-পিছে।

'কাজিরে করিয়া দণ্ড সর্বলোকরায়।
সঙ্কীর্তন-রসে সর্বগণে নাচি যায়॥
মৃদঙ্গ-মন্দিরা বাজে শঙ্খ করতাল।
রামকৃষ্ণ জয়ধ্বনি গোবিন্দ-গোপাল॥
পাষণ্ডীর হইল চরম চিত্তভঙ্গ।
পাষণ্ডী বিষাদ ভাবে, বৈষ্ণবের রঙ্গ॥

জয় কৃষ্ণ মুকুন্দ মুরারি বনমালী।
গায় সব নগরিয়া দিয়া হাতে তালি ॥'

প্রজা-সংযমকারী যম বললে, 'আমি ছাড়া আরেক জন চরাচরের সর্বপ্রধান অধীশ্বর আছেন। বস্ত্রে সূত্রের ন্যায় তাঁতেই বিশ্ব ওতপ্রোত। সকলে তাঁর বশবর্তী, তাঁরই শাসনরজ্জুবদ্ধ। একমাত্র নামোচ্চারণ দ্বারাই সেই পাশ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। মহাপাপী অজামিল অশুচি ও মুমূর্ষু অবস্থায় অসুস্থচিত্ত হয়েও 'নারায়ণ' বলে আহ্বান করতেই মুক্তি লাভ করতে পারল। তোমাদের বলছি নামসঙ্কীর্তনই পবিত্র গুহ্য ও দুর্বোধ ভাগবতধর্ম। যার জিহ্বা ভগবানের গুণবর্ণন বা নামোচ্চারণ না করে, যার মাথা কখনো শ্রীকৃষ্ণের পায়ে প্রণত না হয় সেই অসাধুদের আমার কাছে আসতেই হবে। হে পুরাণপুরুষ নারায়ণ, এই অঞ্জলিবন্ধন করছি, অজামিলকে আমরা ধরেছিলুম বলে আমাদের অপরাধ মার্জনা করুন। আপনি যখন সর্বাপেক্ষা মহৎ তখন আপনাতে ক্ষমাগুণ নিশ্চয়ই আছে। আমরা বুঝেছি ভগবান বিষ্ণুর নামসঙ্কীর্তনই জগতের মঙ্গলস্বরূপ, তাতেই সমস্ত পাপের ঐকান্তিকী নিষ্কৃতি।'

'নামেতে নিখিল পাপ হয় উন্মূলন।
ভস্ম হয় তুলারাশি অগ্নিতে যেমন ॥'

নামমাহাত্ম্য না জেনে নাম করলেও অঘৌঘনাশ ভগবান হৃদয়ে অধিষ্ঠান করেন। সিংহকে দেখে বৃক পলায়ন করলে বৃকরুদ্ধ মৃগ যেমন মুক্ত হয় তেমনি হরিনাম দেখে পাপ ত্রস্ত হয়ে পলায়ন করে। দীপ্ত পাপবহ্নি দেখে ভয় পেয়ো না, গোবিন্দ নামরূপ মেঘপুঞ্জের বারিবিন্দু বর্ষণ করো, অগ্নি নিভে যাবে। পতিত স্খলিত ভগ্ন দষ্ট তপ্ত আহত যে কোনো ব্যক্তি যদি হরিনাম করে তা হলে তাকে আর যন্ত্রণাভোগ করতে হয় না।

৩৭

কত ভাব ধরল নিমাই। কখনো ভগবান, কখনো ভক্ত। 'ক্ষণে বোলে, মুঞি সেই মদনগোপাল। ক্ষণে বোলে, মুঞি কৃষ্ণদাস সর্বকাল॥' কখনো শ্রীবিগ্রহ দূরে ফেলে বিষ্ণুখট্টায় বসছে, গঙ্গাজল ও তুলসীচন্দনে পূজা নিচ্ছে, বৃদ্ধ মায়ের মাথায় পা দিয়ে বলছে, আমাতে তোমার প্রেম হোক, আবার কখনো বলরাম হয়ে 'ভাইরে কানাই' বলে ডাকছে, গোপী হয়ে কাঁদছে কৃষ্ণবিরহে, গলবস্ত্র হয়ে দন্তে তৃণ ধরে প্রত্যেক ভক্তের কাছে কৃষ্ণভক্তি প্রার্থনা করছে, আর বাবা কৃষ্ণ আমাকে উদ্ধার করো বলে ধুলোয় গড়াগড়ি দিচ্ছে। নিজেই নিজের যজনা করে শেখাচ্ছে জীবদের।

বলরাম মধুপ্রিয়। একদিন প্রত্যূষে আবেশচিত্ত হয়ে নিমাই বলতে লাগল, মধু দাও, মধু দাও। বলতে বলতে পথে বেরুল, যেতে যেতে উঠল এসে মুরারি গুপ্তের বাড়ি। অঙ্গের বর্ণ আর তেজ শাদা হয়ে গিয়েছে। ভক্তরা গঙ্গাজল এনে দিল, তাই খেয়ে নাচতে লাগল নিমাই।

'এ তোমার কী ভাব?' জিগগেস করল আচার্যরত্ন।

'আমি তোমাদের কৃষ্ণ নই। আমি রৌপ্যপর্বত বলরাম।' বললে নিমাই, 'আমাকে স্বচ্ছন্দে মধু দিতে পারো। বলরাম আমার অঙ্গে প্রবেশ করেছে।'

তখন ভক্তদের সোনার লাঙল হাতে বলরামদর্শন হল। দেখল যমুনাকর্ষণলীলা।

বহুদিন পরে নন্দগোকুলে এসেছে বলরাম, গোপীরা জিগগেস করল, পুরস্ত্রীজনবল্লভ কৃষ্ণ সুখে আছে তো? আর কি আমাদের কথা তার মনে পড়ে?

আবার কেউ বলছে, আমরা না হয় সরল গ্রামবালা, সহজবঞ্চনীয়া, কিন্তু নগরস্ত্রীরা তো চতুর। তারা কি করে সেই অব্যবস্থিতচিত্ত কৃতঘ্নের বাক্যে শ্রদ্ধা করে ?

অভিমানিনী কেউ বলছে, আর তার কথায় কী প্রয়োজন ? অন্য কথা বলো। যদি আমাদের ছাড়া তার দিন কাটে, তাকে ছাড়াও আমাদের দিন কাটবে। বলছে বটে এই কথা, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে কাঁদছে অঝোরে।

বলরাম মনোহর কৃষ্ণকথায় তাদের শান্ত করল। দুই মাস গোকুলে বাস করে তার অনুরাগিণী অন্যান্য গোপীদের সঙ্গে বিহার করতে লাগল। সুগন্ধে সমস্ত বন আমোদ করল বারুণী। একদিন হলধর মদবিহ্বল হয়ে জলক্রীড়া করতে চাইল, ডাকল যমুনাকে। যমুনা এল না। আমি মত্ত, তারই জন্য আমাকে অগ্রাহ্য করল যমুনা। বলদেব ক্রুদ্ধ হয়ে হলাগ্র দিয়ে তরঙ্গিণীকে আকর্ষণ করল, বললে, তোমাকে শতখণ্ড করব। ভয়চকিতা যমুনা বলরামের পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইল। বললে, হে মহাবাহো, আমি আপনার বিক্রম জানতাম না, এখন দেখছি আপনার এক অংশ পৃথিবী ধারণ করে আছে। আমি আপনার শরণাগতা, আমাকে পরিত্যাগ করুন।

বলরাম তাকে ছেড়ে দিল। বলরামের আকর্ষণ পথ ধরেই প্রবাহিত হল যমুনা।

একদিন শ্রীবাসের বাড়িতে গোপীভাবে নাচছে অদ্বৈত আর বাণবিদ্ধের মত আর্তনাদ করছে। নিমাই কার্যান্তরে নিজগৃহে ছিল, শুনতে পেল সে কাতরতা। 'কেহো মাত্র কোনরূপে যদি বোলে হরি। শুনিলেই পড়ে প্রভু আপনা পাসরি॥' আর্তি শুনে ভক্ত-আর্তি-পূর্ণকারী চলল শ্রীবাসের ঘরে। অদ্বৈতকে তুলল ধুলো থেকে। বিষ্ণু-ঘরে নিয়ে গিয়ে দোর বন্ধ করল। বললে, 'এই তো আমি। বলো তোমার কী ইচ্ছে, আর কী তুমি চাও আমার কাছে ?'

'প্রভু, কিছু বৈভব দেখাও।' বললে অদ্বৈত।

'কী দেখবে ?'

'অর্জুনকে যা দেখিয়েছিলে।'

বলতে বলতেই অদ্বৈত দেখল, জড়জগৎ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। এক দিব্য রথ এসে দাঁড়িয়েছে, চতুর্দিকে সৈন্যের সমাবেশ। রথের উপর শ্যামলসুন্দর দাঁড়িয়ে, চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মে শোভমান। ক্রমে ক্রমে সে মূর্তি অনন্তরূপ হয়ে উঠল। বহু বক্র-নেত্র, বহু বাহু-পদ, বহু উরু-উদর। আদি-অন্ত-মধ্য কিছু নেই। দেখল সামনে বসে অর্জুন স্তব করছে। যেমন আগুনে পতঙ্গ এসে পড়ে তেমনি পাষণ্ডেরা বিস্ফারিত মুখের মধ্যে প্রবেশ করছে। 'যে পাপিষ্ঠ পরনিন্দে পরদ্রোহ করে। চৈতন্যের মুখাগ্নিতে সেই পুড়ে মরে॥' কার এত সৌভাগ্য এমন বিশ্বরূপ দেখে। প্রভুর কৃপায় দেখতে পেল অদ্বৈত।

এদিকে নিতাই খুঁজছে নিমাইকে। বাড়িতে না পেয়ে এসেছে শ্রীবাসসকাশে। এ কি, দ্বার বন্ধ। ঘরের মধ্যে শোনা যাচ্ছে গৌরাঙ্গের হুঙ্কার।

'দরজা খোলো।'

নিত্যানন্দ এসেছে জেনে বিশ্বম্ভর দরজা খুলে দিল। বলে, 'দেখ দেখ বিশ্বমূর্তি দেখ।'

ভক্ত ছাড়া কে দেখবে ? আর নবদ্বীপ ছাড়া সেই প্রকাশের স্থান কোথায় ? 'ভক্তচিত্তে ভক্তগৃহে সদা অবস্থান। কভু গুপ্ত কভু ব্যক্ত স্বতন্ত্র ভগবান॥' প্রভু সর্বত্রব্যাপক, সদা-সর্বত্রবাস তাঁর, শুধু তাঁরই কৃপাবলে ভক্ত তাঁকে দেখতে পায়। অণুত্ব আর বিভুত্ব যুগপৎ বর্তমান প্রভুতে, কৃপা করে কাকে দর্শন দেবেন কে জানে।

'ভক্তিযোগ ভক্তিযোগ ভক্তিযোগ ধন।
ভক্তি এই—কৃষ্ণনাম স্মরণ ক্রন্দন॥
কৃষ্ণ বলি কান্দিলে সে কৃষ্ণনাথ মিলে।
ধনে কুলে কিছু নহে কৃষ্ণ না ভজিলে॥'

রূপসম্বরণ করল গৌরহরি। ফিরে চলল নিজগৃহে।

এদিকে অদ্বৈতে আর নিত্যানন্দে ঝগড়া সুরু হয়ে গেল। এও বুঝি বিভবদর্শনের সুখমত্ততা।

'অবধূত, মাতাল, তোকে এখানে ডাকল কে?' অদ্বৈত বললে, 'তুই কেন ঘরে ঢুকলি?'

'আমি ঢুকব না?' বললে নিতাই, 'আমি ঠাকুরের দাদা।'

'দাদা না আর কিছু! যার-তার ঘরে ভাত খেয়ে জাত খুইয়েছিস. এসেছিস বৈষ্ণবসভায়?'

'কেন আসব না? আমি সন্ন্যাসী।' নিতাই বললে, 'আমি পরমহংসের পথে একমাত্র অধিকারী।'

'সন্ন্যাসী না হাতি! দিনে তিনবার খাস, মাছ-মাংস খাস, কেমন সন্ন্যাসী তুই?' অদ্বৈত গর্জন করল।

'তোর চেয়ে ভালো। স্ত্রী-পুত্রে তুই তো ঘোর সংসারী। তুই সন্ন্যাসের কী বুঝবি?' হুঙ্কার করল নিতাই।

যারা উপস্থিত ছিল, তারা কেউ নিতাইয়ের কেউ বা অদ্বৈতের পক্ষ নিল। তারা ভুল করল, সকল বৈষ্ণবে তারা অভেদ দেখল না। বুঝল না এ একরকম কৃষ্ণপ্রেমসুধারসের মত্ততা। এও গৌরলীলা।

> 'সকল বৈষ্ণব প্রতি অভয় দেখিয়া।
> যে কৃষ্ণচরণ ভজে, সে যায় তরিয়া॥
> ভক্তগোষ্ঠী সহিতে গৌরাঙ্গ জয়জয়।
> বিষ্ণু আর বৈষ্ণব সমান দুই হয়॥'

শ্রীবাস অঙ্গনে নিমাই নাচছে, হঠাৎ গৃহমধ্যে কান্নার রোল উঠল। কীর্তনসভা ছেড়ে শ্রীবাস তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকল। কী ব্যাপার? শ্রীবাসের শিশুপুত্র যে এতদিন রোগে ভুগছিল তার মৃত্যু হয়েছে।

স্ত্রী ও অন্যান্য আত্মীয়দের সান্ত্বনা দিতে লাগল শ্রীবাস: 'এ কী, কাঁদছ কেন? কাঁদবার কী হয়েছে? অন্তকালে যার নাম শুনে

মহাপাতকীও যায় নিত্যধামে সেই শ্রীভগবান স্বয়ং আমার আঙিনায় নাচছেন। তাঁর সমক্ষে আবার শোক কী! যদি পুত্রের প্রতি স্নেহ থাকে, আনন্দ করো, উৎসব করো, নিজেকে কৃতার্থ বলে জানো।'

তবু কি সংসারধর্মীদের মন মানে?

শ্রীবাস বললে, 'দয়া করে অন্তত কিছুকাল কান্না স্থগিত রাখো। আমার প্রভুর নৃত্যসুখে যেন ভঙ্গ না হয়। যদি কলরব শুনে প্রভুর বাহ্যদশা ফিরে আসে, আনন্দরসের ব্যাঘাত ঘটে, তা হলে আমি গঙ্গায় ডুবব।'

শোকার্তরা স্তব্ধ হল। শ্রীবাস সঙ্কীর্তনে এসে যোগ দিল। নৃত্যরত ভক্তরা পরস্পর জানল এই দুর্ঘটনার কথা। কিন্তু মুখে কেউ কিছু ব্যক্ত করল না।

সর্বজ্ঞের চূড়ামণি গৌরসুন্দর জিগগেস করলে, 'আমার চিত্ত এমন করছে কেন? পণ্ডিতের ঘরে কোন দুঃখ উপস্থিত হল?'

শ্রীবাস বললে, 'প্রভু, যার ঘরে তোমার সুপ্রসন্ন শ্রীমুখ তার আবার দুঃখ কি!'

সকলে তখন বললে শ্রীবাসের পুত্রবিয়োগের কথা।

'কতক্ষণ হয়েছে?'

'যখন মোটে চারিদণ্ড রজনী। আর এখন তা প্রায় আড়াই প্রহর হল।' বললে এক ভক্ত, 'তোমার আনন্দভঙ্গতায় এতক্ষণ প্রকাশ করে নি শ্রীবাস। এবার অনুমতি করো, ছেলেটার শেষকৃত্য সমাপ্ত করি।'

গৌরহরি কাঁদতে লাগল: 'যে আমার প্রেমে পুত্রশোক অগ্রাহ্য করে তাকে আমি ত্যাগ করব কি করে?'

এ কি, প্রভু ত্যাগের কথা বলছেন কেন? ত্যাগের কথা ওঠে কি করে?

সৎকার করতে শিশুকে নিয়ে যাচ্ছে শ্মশানে, গৌরহরি তাকে উদ্দেশ করে জিগগেস করলে, 'শ্রীবাসের ঘর ছেড়ে চলেছ কেন?'

হঠাৎ মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার হল। শিশু বললে, 'প্রভু, এ তোমার বিধান। কার শক্তি আছে এর অন্যথা করে?'

মৃতশিশু কথা কইছে সকলে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে রইল।

শিশু বললে, 'যতদিন নির্বন্ধ ছিল, এ দেহ ভোগ করলাম। এখন আরেক পুরীতে চলেছি, সেও তোমারই বিধানে। কে বা কার বাপ, কে বা কার ছেলে, যে যার কর্ম করে চলেছে। আমার অপরাধ নিও না। তোমাকে প্রণাম।'

আর কারু শোক নেই। কৃষ্ণপ্রেমানন্দে সকলে অস্থির হয়ে উঠল।

'তুমি তো সংসারচরিত জানো।' শ্রীবাসকে উদ্দেশ করে বললে গৌরহরি, 'এ সব দুঃখে তোমার দায় কী! আমি আর নিত্যানন্দই তোমার দুই নন্দন।'

শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণীকে নিজের মুখের চর্বিত তাম্বুল দিয়ে সম্মানিত করেছিল, এবার সম্মানিত করল শ্রীবাসের মুসলমান দরজিকে। তাকে কৃপা করল নিমাই, নিজের রূপ প্রকাশ করে দেখাল। প্রেমে উন্মত্ত হল দরজি, শেষে বৈষ্ণবদের অগ্রগণ্য হয়ে গেল।

একদিন আবেশে শ্রীবাসের কাছে বাঁশি চেয়ে বসল নিমাই। শ্রীবাস বললে, 'বাঁশি গোপীরা চুরি করে পালিয়েছে।'

'বলো, বলো সেই কথা।'

রসময় বৃন্দাবনলীলা বর্ণনা করল শ্রীবাস। সেই বনবিহরণ, সেই জলকেলি, সেই যুগপৎ ছয় ঋতুর আবির্ভাব। বলতে বলতে রাত প্রভাত হয়ে গেল।

কেশবভারতী এসেছে নদীয়ায়। আর একেবারে নিমাইয়ের বাড়িতে।

'কে এল? কে এল?' নিমাই চঞ্চল হয়ে উঠল।

কেশবসন্ন্যাসী কাটোয়ায় গঙ্গাতীরে এক বটবৃক্ষের নিচে বাস

করে। ব্রাহ্মণ, পরমভক্ত, শুদ্ধসত্ত্ব। গৌরকে দেখে পুলকে রোমাঞ্চিত হল। জিগগেস করল, 'তুমি কি শুক, না প্রহ্লাদ?' পরে নিজেই আবার বলল, 'না, বলছি। তুমি সর্বজনপ্রাণ ভগবান।'

নিমাই বললে, 'তুমি কৃষ্ণঅনুরাগী, তাই জগৎসংসার কৃষ্ণময় দেখছ। আমাকে দেবে সেই অনুরাগ? আমাকে সন্ন্যাসী করবে?'

'বল বল ন্যাসীবর করুণা করিয়া।
কবে কৃষ্ণ অন্বেষিব সন্ন্যাসী হইয়া॥
কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে কবে দেশে দেশে যাব।
কোথা গেলে মুই কৃষ্ণ প্রাণনাথে পাব॥'

স্বগৃহে ভিক্ষা করিয়ে কেশবের কাছে সন্ন্যাস প্রার্থনা করল নিমাই।

কেশব বললে, 'তুমি অন্তর্যামী ঈশ্বর, যা করাও তাই করব। আমি তো স্বতন্ত্র নই।'

আরেকদিন ভক্তসকাশে নিমাই এক অদ্ভুত কথা বলে বসল। বলল, 'কফ নিবারণের জন্যে পিপ্পলখণ্ড ব্যবহার করল, কিন্তু উলটো ফল হল, কফ না কমে আরো বেড়ে চলল।'

এ কথার তাৎপর্য কী? ওষুধে না সেরে পীড়া বাড়ে এ কী রহস্য!

নিত্যানন্দ বুঝল। বুঝল প্রভু ঘর ছাড়বেন। হৃদয় হাহাকার করে উঠল। হায়, অমন সুন্দর কেশের অন্তর্ধান হবে!

গৌরাঙ্গ নিতাইয়ের সঙ্গে বসল নিভৃতে।

'তোমাকে আজ প্রাণের কথা খুলে বলি।' বললে গৌরহরি, 'ধর্মী কর্মী অধ্যাপক শিষ্য সকলে নৃত্যকীর্তনের নিন্দা করছে। আমাকে মারতে পর্যন্ত চেয়েছে। যদি ওদের ক্ষমা করে ভক্তিপথে মতি না ফেরাই তা হলে ওদের নিস্তার হবে কী করে?'

নিতাই গৌরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

'আর আমারও জগৎত্রাণ বলিহারি। ত্রাণ করতে এসে আমিও কিনা সংহারলীলায় উদ্যত হলাম।'

'তাহলে কী করবে ?'

'সন্ন্যাস নেব। শিখাসূত্র মোচন করে সন্ন্যাসী হয়ে বেড়াব দ্বারে দ্বারে। আমাকে সন্ন্যাসী দেখলেই লোকে আমাকে প্রণাম করবে। কি, করবে না ?'

'করবে।'

'আর আমাকে প্রণাম করলেই জীবের পাপক্ষয়। কী বলো ?' বললে নিমাই, 'সন্ন্যাসীকে কেউ মারে না, বরং সকলে মানে, প্রণাম করে। যারা আমাকে মারতে চেয়েছে, তাদের দুয়ারে ভিক্ষুক হয়ে দাঁড়াব আমি, তখন তারাই আমার পায়ে প্রণত হবে। প্রণামেই নির্মল হবে চিত্ত, ভক্তির উদয় হবে। তবেই জগতের উদ্ধার।'

'মোরে না মানিলে সর্বলোক হবে নাশ।
এই লাগি কৃপার্ত প্রভু করিলা সন্ন্যাস॥
সন্ন্যাসী বুদ্ধ্যে মোরে করিবে নমস্কার।
তথাপি খণ্ডিবে দুঃখ, পাইবে নিস্তার॥'

নিতাই বললে, 'তুমি যা বলবে তাই হবে। তোমার কাছে কার কী বিধি নিষেধ! কিন্তু তুমি চলে গেলে তোমার মা কি করে বাঁচবেন ?'

'মাকে আমি বুঝিয়ে যাব। নেব মায়ের অনুমতি।'

ভক্তদের বাড়ি বাড়ি গৃহত্যাগের সঙ্কল্পের কথা বলে বেড়াতে লাগল। সকলে কাঁদতে লাগল। কিন্তু খেপে উঠল গদাধর। বললে, 'আগেই তো জননীবধের ভাগী হবে। কেন, ঘরে থাকায় কি ভগবানের প্রীতি নেই, সমর্থন নেই ? কিন্তু ক্ষুদ্র আমি, তোমাকে কী বোঝাব ?'

কাঁদতে লাগল সকলে। সে কেশবন্ধন আর দেখব না। আর মালা গেঁথে দেব না সেই চাঁচর চিকুরে। সে কেশের দিব্য গন্ধ আর ঘ্রাণে লাগবে না। কোথায় যাবে, নিমাই আর এ গাঁয়ে আসবে না। বাঁচব কী করে ? এই পাপিষ্ঠ জীবন দিয়ে কী হবে ?

ভক্তদের দিকে করুণনেত্রে তাকাল নিমাই। আশ্বস্ত করল।

বললে, 'আমাকে হারাবে না, যখনই সঙ্কীর্তন করবে, তখন তার মধ্যস্থলে আমি নাচব।' শ্রীবাসকে লক্ষ্য করল : 'তোমার মন্দিরে আমি সর্বদা বিরাজ করব। আরো এক কথা বলি, যেই কৃষ্ণভজন করবে, আমার মা কি স্ত্রী কি ভক্ত, সেই দেখতে পাবে আমাকে। তোমরা শান্ত হও। শোকের কিছু নেই।' জনে জনে সকলকে আলিঙ্গন দিতে লাগল নিমাই। কিন্তু শচীমাতা আর বিষ্ণুপ্রিয়াকে বলবে কী করে? তারা কী করে সইবে এ বজ্রাঘাত?

মায়ের বয়স সাতষট্টি আর বিষ্ণুপ্রিয়া চৌদ্দ বছরের। কী করে ফেলে যাবে তাদের? বিদীর্ণ বক্ষে কত না জানি তারা কাঁদবে। নিমাইয়ের এ নিষ্ঠুরতাকে সমস্ত দেশ বলবে কী!

শচীমাতা আর বিষ্ণুপ্রিয়ার কান্না তো নিমাইয়েরই কান্না। না কাঁদলে লোকে যে হরিনাম নেয় না, জীবোদ্ধার হয় না। মা আর স্ত্রী কাঁদলেই তো তাদের দেখে লোকে কাঁদবে, মানবে নিমাইকে। নইলে মার মৃত্যুর পর যদি নিমাই সন্ন্যাস নিত, কিংবা আদৌ যদি সে বিয়ে না করত, তাহলে তার সন্ন্যাসে কেউ কাঁদত না, কেউ অমন প্রাণঢালা ভক্তিতে নিত না হরিনাম।

তাই নিমাইয়ের সন্ন্যাস নিঠুরালি নয়, মধুরালি।

প্রেমের বন্যায় ভেসে গেল দিক-দেশ, মুছে গেল ভেদাভেদ, ভেঙে গেল লৌকিকতা। 'আমি চার বর্ণের বা চার আশ্রমের কেউ নই, আমি সেই অখিলরসামৃতসিন্ধু গোপীভর্তার দাসানুদাস।' দেশে এল নবীন সাম্যবাদ। দেখা দিল সেবাস্পৃহা। 'জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণের অধিষ্ঠান।' ভক্তির অর্থই সেবা। 'ভক্তিরস্য ভজনম।' 'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ।' শুধু ভক্তির দ্বারাই পাওয়া যাবে। ভক্তিই ভূয়সী, গরীয়সী। আর এই শুদ্ধা ভক্তি থেকেই প্রেম। ভক্তিই তাই সর্বোত্তম অভিধেয়।

নিমাই ছাড়া কে শেখাবে ভক্তি? অনাসঙ্গ ভজন?

কে শেখাবে অহিংসা, সহিষ্ণুতা, স্বাবলম্বিতা? কে শেখাবে

কৃষ্ণধর্ম? যে বৃক্ষের ডাল কাটে, তাকেও বৃক্ষ ছায়া দেয়, ফুলফল দেয়, নিজের অঙ্গ ডালটিও নিয়ে যেতে দেয়। আর সমস্ত পীড়ন সহ্য করে অম্লানে। জীবনে যে সব অত্যাচার আসছে, সবই আমার স্বোপার্জিত কর্মফল, আত্মকৃত বিপাক। তাই সব সহ্য করো। অত্যাচারী বরং আমার উপকার করছে, কর্মফলের দুর্বহ বোঝা লঘু করে দিচ্ছে। আর অপরের গলগ্রহ না হয়ে নিজের পায়ে নিজেই উঠে দাঁড়াও। যে পরের অপেক্ষা রাখে, তার ইহ-পর দু-কালই নষ্ট হয়, কৃষ্ণও তাকে উপেক্ষা করেন। 'বৈরাগী হইয়া যে বা করে পরাপেক্ষা। কার্যসিদ্ধি নহে কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা ॥'

আর কে শেখাবে প্রীতি-মৈত্রী? কে দস্যুকে ভক্ত করবে? উদ্ধতকে বদান্য করবে? কে হবে নির্দ্বৈধ স্পর্শমণি? কে বিলাবে করুণানির্ঝর? কে বোঝাবে কৃষ্ণমাধুর্যের আস্বাদনের আনন্দ?

'এত ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়।
অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনে নদীয়ায় ॥'

৩৮

'লোকরক্ষা নিমিত্ত সে আমার সন্ন্যাস।'

কথাটা শচীর কানে উঠল। বিষ্ণুপ্রিয়া বাপের বাড়ি ছিল সেও শুনতে পেল। দুজনকে নিয়ে তার সংসার, জননী আর ঘরনী, সে দুজনকেই সে ছেড়ে যাবে।

তবু যেন শচী পারে না বিশ্বাস করতে। একে ওকে জিগগেস করে। শুনেছ নিমাই নাকি কী করবে?

'কী করবে?'

'আমাকে নাকি অকূলে ভাসিয়ে পালিয়ে যাবে বিদেশে?'

'তা ছেলেকে ডেকেই জিগগেস করো।' আর্ত মুখ ফিরিয়ে নেয় সকলে।

মাকে না বলে কিছুই তো সে করে না। যায়না কোথাও। তবে নিজে থেকে কিছু সে বলছে না কেন? কখন বলবে?

ছেলেকে বিরলে পেয়ে নিজেই এগুলো শচী: 'এ সব কী শুনছি? তুই নাকি—'

'তোমাকে বলতেই যাচ্ছিলাম।' মাথা নত করল নিমাই: 'তোমাকে না বলে তোমার অনুমতি না নিয়ে কিছু করব না। মা, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি সন্নেসী হয়ে কৃষ্ণ-অন্বেষণে বৃন্দাবনে যাব।'

শচী মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

নিমাই সেবা করে সুস্থ করল মাকে। বললে, 'তোমার মত আমার আর হিতার্থী কে হবে। জগতের হিতেই আমার সর্বোচ্চ হিত। যাতে আমার হিত হবে, জগতের হিত হবে, তাতে তুমি স্বচ্ছন্দে অনুমতি দাও।'

'কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া?' অস্ফুটে উচ্চারণ করল শচী।

'তার জন্যে তুমি চিন্তা কোরো না। তার দুঃখে জগৎ উপকৃত হবে, আর সে যখন তা বুঝবে তার দুঃখ থাকবে না। মা, পতিপ্রাণা সাধ্বী স্ত্রী কখনো নিজের সুখ চায় না, চায় পতির তৃপ্তি। আমি ঘরের বাইরে গিয়ে প্রেমভক্তি ছড়াব আর বিষ্ণুপ্রিয়া ঘরে বসে সাক্ষাৎ প্রেম-ভক্তিরূপিণী হয়ে বিরাজ করবে। তার সাধনায় দূর হয়ে যাবে সমস্ত বিরুদ্ধতা। আমার সংসারত্যাগের মহনীয়তা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।'

কাঁদতে লাগল শচী। শোক করতে লাগল। 'তোকে কে রেঁধে দেবে? ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কার দুয়ারে তুই অন্ন মাগবি? তোর ননীর তনু রোদে পুড়ে যাবে। কোমল পায়ে পাথর-কাঁকর সইবি কি করে? তোর সর্বজীবে দয়া, আর তুই তোর মায়ের প্রতি অকরুণ?'

'মা, তুমি কাতর হয়ো না।' নিমাই বললে সান্ত্বনার সুরে। 'বৈরাগ্যই আমার স্বধন। আমার পক্ষে সন্ন্যাসও যা, সংসারও তাই।

তবু আমার সন্ন্যাসবৈরাগ্যেই জীবের হৃদয় দ্রব হবে, ভগবদভাবে বিহ্বল হবে, ভগবানের পায়ে আত্মসমর্পণ করবে। তুমি মনসুখে আমাকে অনুমতি দাও।'

তবু কি মায়ের প্রাণ প্রবোধ মানে? বললে, 'বিশ্বরূপ আমাকে ছেড়ে গেল আর ফিরল না। তুইও আমাকে ছেড়ে যাবি? ভুলে যাবি?'

'কে বললে ছেড়ে যাব? তোমাকে কি ভোলা যায় কখনো?' নিমাই আশ্বাস দিল: 'আমি আবার আসব, দেখে যাব তোমাকে।'

'তবু, বাবা, কেন, একেবারে না গেলেই কি নয়?' আবার আকুল হয়ে উঠল শচী: 'অদ্বৈত শ্রীবাস আছে, তোর প্রাণের দোসর নিত্যানন্দ আছে, গদাধর আছে, তাদের সঙ্গে ঘরে বসে কীর্তন করা যায় না? মাঝে মাঝে দেখা পেয়ে আমার কী হবে? কেন তুই আমার অঞ্চলের অচঞ্চল নিধি হয়ে থাকবি না?'

'শোনো, মাঝে মাঝে দেখা পেয়ে তোমার যে সুখ হবে তোমার চোখের সামনে অচঞ্চল হয়ে থাকলে তোমার তত সুখ হবে না। শোনো, অযোধ্যায় তুমি কৌশল্যা ছিলে আর আমি তোমার রাম ছিলাম।' মায়ের মুখের দিকে তাকাল নিমাই: 'আর মথুরায় কংসকারাগারে দেবকী ছিলে আর আমিই ছিলাম তোমার কৃষ্ণ। তোমার-আমার কোনো জন্মবিচ্ছেদ নেই, আমি তোমার পুত্র হয়েও পুত্রাধিক—'

'এ কী, শচী হঠাৎ স্থির হল। তার বাৎসল্য হরণ করে নিল নিমাই। সহসা তার মনে হল, নিমাই তার পুত্র নয়, নিমাই স্বয়ং ভগবান। তখন শচী অনুমতি দিল মনসুখে। ভুবন উদ্ধার হবে এ আনন্দই সকলের চেয়ে বড় হয়ে উঠল।

কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া কী করবে?

ব্যস্ত হয়ে বাপের বাড়ি থেকে চলে এসেছে বিষ্ণুপ্রিয়া। রাত্রে পতিমিলনক্ষণে অধোমুখে কাঁদতে বসেছে।

নিমাই বললে, 'তুমি কাঁদছ কেন? তোমার কিসের দুঃখ?'

অনেক পর বিষ্ণুপ্রিয়া মুখ খুলল। বললে, 'তুমি নাকি চলে যাবে?'

'আমি কোথায় চলে যাব? তুমি যেখানে থাকবে আমিও সেখানে।' নিমাই বললে, 'শোনো, আমার ইচ্ছা তোমার মঙ্গল হোক তোমার ইচ্ছা আমার মঙ্গল হোক। সর্বমঙ্গল কিসে? সর্বমঙ্গল কৃষ্ণভজনে। তুমি যদি বিষ্ণুপ্রিয়া, তোমার নাম সার্থক করো।'

স্পষ্ট হল বিষ্ণুপ্রিয়া: 'তুমি নাকি সন্ন্যাসী হবে?'

'হ্যাঁ, তাই হব। এ সমস্তই কৃষ্ণসেবার আয়োজন। জগৎহিতের জন্যে তুমিও তোমার সর্বস্ব উৎসর্গ করো।'

প্রবল কান্নায় ভেঙে পড়ল বিষ্ণুপ্রিয়া।

'তোমার এ দুঃখের অমেয় মূল্য। তোমার এই দুঃখের মধ্য দিয়েই কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণানন্দ, জগৎনিস্তার।'

'তা হলে আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে চলো।' উদ্বেল কণ্ঠে বললে বিষ্ণুপ্রিয়া, 'রঘুনাথ জানকীকে নিয়ে গিয়েছিল, যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে। নলদময়ন্তীর কথাও তোমার মুখেই শুনেছি। শ্রীবৎস-চিন্তার কথা।'

নিমাই বললে, 'না, তোমাকে নিয়ে গেলে বৈরাগ্য হয় না। বৈরাগ্য ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য। বৈরাগ্য দেখলেই লোকে ঈশ্বরে আকৃষ্ট হবে, আবিষ্ট হবে, তার নামকীর্তন করবে। আর ভাগবত যতিধর্ম সস্ত্রীক আচরণীয় নয়। আমি একা যাই, তুমি নবদ্বীপে থাকো।'

'নবদ্বীপে থাকব?'

'বলেছি তো, তুমিও যেখানে আমিও সেখানে। সন্ন্যাস গ্রহণ করবার পর আমি আর নবদ্বীপে আসতে পারব না। কিন্তু নবদ্বীপ নিত্যলীলাস্থায়ী পরমধাম। সুতরাং তুমি নবদ্বীপে থাকলেই আমার থাকা হবে।'

'আমি কী করব ?'

'গৃহে বসে কঠোর বৈরাগ্যের সাধন করবে।'

'কী ভাবে ?'

'অরুণ উদয়ে নিত্য গঙ্গাস্নান করবে, মন্দিরে এসে পরবে ধৌত বস্ত্র। তারপর একমুঠ আতপ চাল রাখবে মাটিতে। একটি পাত্র ভরে গঙ্গাজল নেবে। বত্রিশ অক্ষর হরেকৃষ্ণ হরিনাম বলা হলে একটি তণ্ডুল তুলে নিয়ে ফেলবে সেই জলপাত্রে। এই রকম প্রহর দুই যত পারো নাম করবে। তারপরে জলপাত্র থেকে, যতবার নাম করেছ তারই স্মরণচিহ্ন, তণ্ডুলকণা কটি রন্ধন করবে।' বলতে লাগল নিমাই, 'তারপর সেই অন্ন কৃষ্ণে নিবেদন করে ভোজন করবে। আর সঙ্কীর্তন করবে, অন্ন দেবে বৈষ্ণবদের। এক মুহূর্তের জন্যেও কৃষ্ণকে ভুলবে না।'

'শুন সতি বিষ্ণুপ্রিয়া বৈষ্ণবজননী।
নবদ্বীপ রক্ষা কর চিন্ত মনে গুণি॥
কলিকাল সর্পে দংশিবে সর্বজীবে।
সংকীর্তন বিনা কিছু না করহ সবে॥
তুমি না থাকিলে হবে সংকীর্তন বাদ।
নবদ্বীপ লৈঞা হবে বড়ই প্রমাদ।
মহান্ত বৈষ্ণব উদাসীনে হবে দ্বন্দ্ব।
তুমি সভার মা-পুত্রে করাবে আনন্দ॥
বাপ শূন্য পুত্র জীয়ে মায় শূন্য মরে।
ইহা জানি থাক সতি নবদ্বীপ পুরে॥'

বিষ্ণুপ্রিয়া শুধু বৈষ্ণবজননী নয়, সঙ্কীর্তনজননী। যে পতিব্রতা সে পতিধর্ম রক্ষা করে, পতি-আজ্ঞাপালনই তার ব্রতানুষ্ঠান। মৌনে সম্মতি দিল বিষ্ণুপ্রিয়া।

গৃহত্যাগের আগের দিন। কোত্থেকে কে জানে ভক্তরা এসে ঘিরে ধরল নিমাইকে। কেউ কেউ তার গলায় মালা দিল। সে সব

মালা ফিরিয়ে দিল ভক্তদের। বললে, 'আমাকে যদি তোমরা সত্যি ভালোবাসো, কৃষ্ণভজন করো।'

'আপন গলার মালা সভাকারে দিয়া।
আজ্ঞা করে প্রভু সভে, কৃষ্ণ গাও গিয়া॥
বোল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ বিনু কেহ কিছু না ভাবিহ আন॥
কি শয়নে কি ভোজনে কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বোলহ বদনে॥'

এরা ভালোবাসেনা নিমাইকে? দরিদ্র শ্রীধর একটি লাউ এনে উপহার দিয়েছিল নিমাইকে। নিমাই ভাবল, কাল চলে যাব, এই লাউ আর খাওয়া হল না। না, ভক্তবাৎসল্য রাখতে হবে, আজই খেয়ে যাব। মাকে বললে, রান্না করো লাউ। এমন সময় আরেক ভক্ত দুধ নিয়ে এল। নিমাই উল্লসিত হয়ে বললে, লাউ দিয়ে পায়েস রান্না করো। মার অনুরোধে খেল সমস্তটা। মনে মনে ভাবল, এই তো আমার নবদ্বীপে শেষ খাওয়া।

চব্বিশ বছর বয়সে ১৪৩১এর মাঘের শেষভাগে শেষরাত্রে নিমাই গৃহত্যাগ করল। 'চলিলেন বৈকুণ্ঠনায়ক গৃহ হৈতে। সন্ন্যাস করিয়া সর্বজীব উদ্ধারিতে॥' গৃহের বাইরে এসে নিজ ভবনকে, নবদ্বীপ-ধামকে ও জননীকে উদ্দেশ করে প্রণাম করল। দ্রুতপদে চলল গঙ্গার দিকে। দাদা বিশ্বরূপকে স্মরণ করে শীতের শিশিররাত্রে গঙ্গায় ঝাঁপ দিল। ও-পারে পৌঁছে আর্দ্রবস্ত্রেই চলল কাটোয়ার দিকে।

প্রভাতে কান্নার রোল উঠল। শুধু শচীর ঘরে নয়, সারা নদীয়ায়। 'জীব লাগি করিল সন্ন্যাস।' পরম নিন্দক পাষণ্ডও শোকাভিভূত হল। নিন্দা দ্বেষ উড়ে গেল, চলে এল অনুগতি। 'নিন্দা দ্বেষ যাহার মনেতে যা ছিল। প্রভুর বিরহে সর্বজীবের খণ্ডিল॥'

নিতাই চলে এল শচীগৃহে। শোকাকুলা বিষ্ণুপ্রিয়াকে শুনিয়ে শচীকে বললে, 'মা, তোমার পুত্র চিরদিন স্বেচ্ছাময়। সে কী বস্তু তা স্মরণ করে তোমরা শান্ত হও। তার কী উদ্দেশ্য তা স্মরণ করে শক্তি ধরো। যাকে যা বলে গেছে তাই করো। সে যে ঘর ছেড়েছে তাতে আর সন্দেহ নেই। দেখি কোথায় সে পালিয়েছে। ভারতে যেখানে থাক তাকে খুঁজে বার করবই করব। মিলন করাব তোমার সঙ্গে।'

সঙ্গে গদাধর, মুকুন্দ, ব্রহ্মানন্দ আর চন্দ্রশেখর আচার্যকে নিয়ে এগুলো নিতাই। চলো নিরদয়ের ঘাটে যাই।

নিরদয়ের ঘাট ?

'হ্যাঁ, আমাকে একবার বলেছিল কাটোয়ায় কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস নেবে।' বললে নিতাই, 'যে ঘাট থেকে গঙ্গা পেরিয়েছে সে নদীয়ায় নিরদয়ের ঘাট ছাড়া আর কী ?'

নিমাই কাটোয়ায় গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষের নিচে কেশবভারতীর আশ্রমে এসে দাঁড়াল। কেশবকে প্রণাম করল নত হয়ে। বললে, 'প্রভু আমি এসেছি। তুমি কৃপাময়, আমাকে সন্ন্যাসমন্ত্র দাও। আমাকে কৃষ্ণদাস করে তোলো।'

কেশব বিভোর হয়ে দেখতে লাগল নিমাইকে। অসম্ভব ! এমন তরুণ সুন্দর নবীন যুবককে কী করে সন্ন্যাস দেব ?

'তুমি আগে বোস, বিশ্রাম করো। বিধিব্যবস্থা সম্পূর্ণ হোক।'

নিতাই ও চারসঙ্গী এসে উপস্থিত।

উল্লসিত গৌরহরি। বললে, 'তোমরা এসেছ, কী আনন্দ। শোনো, আমি সন্ন্যাস নিয়ে বৃন্দাবন যাবার জন্যে এখানে এসেছি। বলো বৃন্দাবন, বলো হরি হরি।'

সকলে হরিধ্বনি করে উঠল। নাচতে লাগল নিমাই। কাতরে কাঁদতে লাগল ভক্তির জন্যে।

তবু কি কুণ্ঠা যায় না কেশবের ?

নিমাই কঠিন হয়ে বললে, 'গোঁসাই, তুমি আমাকে সন্ন্যাসমন্ত্র দিতে প্রতিশ্রুত। জানো না আমি কে?'

'তুমি সর্বজীবের প্রাণ। তুমিই সর্বজগতের গুরু।' বললে কেশব, 'আমি তোমার গুরু হই কি করে?'

'শুধু লোকশিক্ষার জন্যে।' পরে লক্ষ্য করল চন্দ্রশেখরকে: 'যাও, বিধিযোগ্য উপহার সংগ্রহ করো। আয়োজনে ত্রুটি রেখো না।'

কেশব যদি বা রাজি হল, মধু রাজি হয় না মাথা কামাতে।

নিমাই বললে, 'মধু, এই কেশ আমাকে বন্ধন করে রেখেছে, আমাকে খালাস করে দাও। আমি বৃন্দাবনে যাই।'

'ও আমি পারব না কিছুতে।' বললে মধু, 'কাটোয়ায় ঢের নাপিত আছে, আর কাউকে ডাকো।'

'তোমার ভালো হবে, সুখসৌভাগ্য বাড়বে, অন্তিমে বৈকুণ্ঠ পাবে, কথা শোনো, আমাকে খালাস করে দাও।' নিমাই অনুনয় করতে লাগল।

মধু কাঁদতে লাগল। কাঁদতে লাগল ভক্তদল। বলাবলি করতে লাগল, 'কোন বিধি সৃজিল সন্ন্যাস।'

মধু বললে, 'আমি সৌভাগ্য চাই না, বৈকুণ্ঠ চাই না, তোমার চুলে পারব না ক্ষুর দিতে। তোমার মাথায় হাত রেখে আবার সে হাত নখ কাটতে অন্যের পায়ে রাখব এ অসহ্য।'

'তোমাকে আর নিজবৃত্তি করতে হবে না।' আশ্বাস দিল নিমাই: 'কৃষ্ণের প্রসাদে তোমার বাকি জীবন সুখে যাবে।'

তবুও হাত ওঠে না মধুর।

ও কি, হরিদাস এসে পড়েছে নাকি?

'হরিদাস, তুমিই তাহলে আমাকে খালাস করে দাও।'

মধুর কী হল, মধুই এগিয়ে গেল। ক্ষুর হাতে নিয়ে কাঁপতে লাগল। তার গায়ে পদ্মহাত বুলোতে লাগল নিমাই।

প্রেমরসে ক্ষৌরকর্ম নির্বাহ করল মধু। কর্তিত কেশ দেখবার জন্যে ভিড় করল সকলে। কিন্তু কারু সাহস হলো না সে কেশ স্পর্শ করে।

আর মধু করল কী ?

ক্ষুর-কাঁচির ঝাঁপি নিয়ে নামল গঙ্গায়। গঙ্গায় বিসর্জন দিল।

নিমাই এল গঙ্গাস্নান করে।

কেশব তিনখণ্ড অরুণ বস্ত্র হাতে করে দাঁড়িয়েছে। একখানি কৌপীন, দুখানি বহির্বাস। দুহাতে অঞ্জলি করে বস্ত্র নিল নিমাই। ভক্তিভরে মাথায় ধরল। সকলে হরিধ্বনি করে উঠল। সকলকে উদ্দেশ করে বললে, 'আমাকে সকলে আশীর্বাদ করো। আমি যেন ব্রজে কৃষ্ণ পাই। আমি যেন ভবসাগর পার হই।'

কৌপীন পরে মুণ্ডিতমস্তক নিমাই বসল কেশবের পাশে। বললে, 'গোঁসাই, এবার মন্ত্র দাও।'

কী মন্ত্র দেব ? কেশব কি একমুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল ?

'সেদিন স্বপ্নে কে এক মহাজন, আমাকে মন্ত্র দিয়ে গেছে। দেখুন তো এ সেই মন্ত্র কিনা।' বলে কেশবের কানে মন্ত্রোচ্চারণ করল নিমাই।

কী আশ্চর্য, গোপন সন্ন্যাসমন্ত্রও নিমাইয়ের অগোচর নেই।

গৌরলীলা কেশব বুঝল এতক্ষণে। তার কানে মন্ত্র দিয়ে নিমাইই তাকে ছলে শিষ্য করে নিয়েছে।

মন্ত্র পেয়ে কেশব প্রেমোন্মত্ত হল। আর দ্বিধা কী! নিমাইয়ের কানে তখন দিল সন্ন্যাসমন্ত্র। বুকে হাত রেখে বললে, 'তুমি জীবমাত্রকেই শ্রীকৃষ্ণে চেতন করালে, অতএব নবজন্মে তোমার নতুন নাম হল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।'

কর্তিত কেশের সমাধি দেওয়া হল।

ডান হাতে দণ্ড, বাঁ হাতে কমণ্ডলু, মুণ্ডিতশির, কৌপীনধারী সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য উঠে দাঁড়ালেন। উজ্জ্বলতম, মধুরতম,

পুরুষোত্তম। হেমাভ দিব্যচ্ছবিস্মুন্দর চৈতন্যচন্দ্র। 'সন্ন্যাসকৃৎ শমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ।'

'যত জগতের তুমি কৃষ্ণ বোলাইয়া।
করাইলা চৈতন্য—কীর্তন প্রকাশিয়া॥
এতেক তোমার নাম—'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'।
সর্বলোকে তোমা হৈতে যাতে হৈল ধন্য॥'

মহাপ্রভু জীবতত্ত্ব নন, স্বয়ং শ্রীভগবান। সাধনোদ্দেশ্যে তাঁর সন্ন্যাসগ্রহণের প্রয়োজন ছিল না। তবে তিনি কেন সন্ন্যাসী হলেন? কলিহত জীবকে হরিভক্তি দেখাবার জন্যে। দুর্জনহিতের জন্যে। ঈশ্বরভাবেই তার সন্ন্যাস। ভক্তভাবে প্রভু বললেন, 'কি কার্য সন্ন্যাসে মোর প্রেম নিজ ধন।' ভক্তিমার্গে সন্ন্যাস নয়, ভক্তিমার্গে শুধু কৃষ্ণভজন, শুধু নামকীর্তন।

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু স্বয়ং ভগবান।
তাঁহার পদারবিন্দে অনন্ত প্রণাম॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
যাঁহার প্রকাশে সর্বজগত-আনন্দ॥
দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার।
দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার॥
এক ভাগবত হয়—ভাগবত শাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্তিরস পাত্র॥
দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাহার হৃদয় তার প্রেমে হয় বশ॥

ভগবান বলেছেন, 'আমি ভক্তজনপ্রিয়, ভক্তপরাধীন, অস্বতন্ত্র। সাধু ভক্তগণ আমার হৃদয় গ্রাস করে রয়েছে। সাধু ভক্তদের ছাড়া আমি অন্য কোন শ্রী স্পৃহা করি না। যারা আমার শরণাপন্ন তারা অপরিত্যাজ্য। যেমন সাধ্বী স্ত্রী সৎপতিকে বশীভূত করে তেমনি ভক্তিপ্রভাবে সাধুরা আমাকে আবদ্ধ করে রেখেছে। সাধুরা

আমার হৃদয় আমিও সাধুদের হৃদয়। আমাকে ছাড়া তারা যেমন অন্য কিছু জানে না আমিও তেমনি তাদের ছাড়া অন্য কিছুই জানি না।'

আর এই ভক্তির জন্মদাতাই কৃষ্ণনাম, গৌরনাম। "গৌরনাম অমিয়ধাম পীরিতি মুরতি গাঁথা॥"

॥ প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥

প্রথম খণ্ড লিখতে প্রধানত নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলীর উপর নির্ভর করেছি :
শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মূল গ্রন্থ ও শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ-কৃত তার টীকা
শ্রীচৈতন্যভাগবত
মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ-প্রণীত অমিয়-নিমাই-চরিত